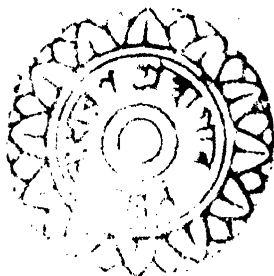
[illegible]

[illegible]

৯/১৮৫৮

আধুনিক চীনা গল্প

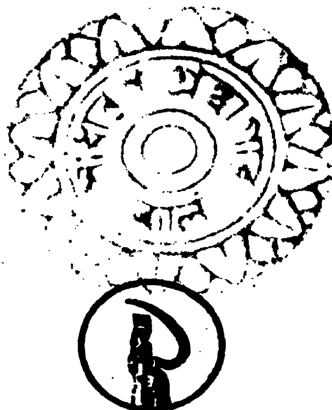


১—২০

আধুনিক চীনা গল্প

লু স্যুন্, লাও চাঅ, তিঙ লিঙ
ও অন্যান্য

অনুবাদ করেছেন
অমল দাশগুপ্ত



ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৮৭. চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৩

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

সুধাংশুরঞ্জন সেন

ট্রুথ প্রেস

৩ নন্দন রোড, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট

মতি দত্তগুপ্ত

বর্ণলিপি

খালেদ চৌধুরী

ব্লকনির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ স্ট্রীট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১ হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

দাম ২৲

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

চীনা সাহিত্য-আন্দোলনকে মোটামুটি কয়েকটি স্পষ্ট যুগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব চীনা সাহিত্যের ওপর এত বেশী যে এই যুগ-বিভাগটা রীতিমত প্রত্যক্ষ।

প্রথমে সাহিত্য-জাগৃতির যুগ, ১৯১৭ থেকে ১৯২৭। ১৯১৯ সালের ৪ঠা-মে আন্দোলন এই যুগের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রধানত ঝোঁক ছিল অনুবাদের ওপর, স্বদেশ-প্রত্যাগত ছাত্ররা এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। বিদেশী সাহিত্যের রসে পুষ্ট হয়ে চীনা সাহিত্যের বিপ্লব-প্রচেষ্টা বিপ্লবী সাহিত্যের জন্মলাভে সার্থক হয়ে ওঠে। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুর্জোয়া সমাজের সংগ্রামের প্রতীক এই যুগের সাহিত্য। কিন্তু চীনের বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাপ্ত, ১৯২৭ সালে কৃষক ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ-সমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায়। তার পরের যুগ কমিউনিস্ট নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকের অভ্যুত্থানের যুগ। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-আন্দোলনের গতি বামপন্থী হয়ে ওঠে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা সাহিত্যিককে গণ-আন্দোলনের প্রতি সচেতন করে তোলে, বামপন্থী বিপ্লবী সাহিত্যের জন্ম হয় এবং ১৯২৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সাহিত্যই গতিশীল।

কিন্তু ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সাহিত্যে যে জাগৃতি এসেছে, তার বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয়, একটা মূলগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে। এই যুগে চিন্তায় ও ভাষায় যে বিপ্লব এসেছে তার তাৎপর্য বুঝতে হলে চীনা ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিন রকম ভাষায় সাহিত্য রচিত হত। (১) প্রাচীন ক্লাশিকাল ভাষা 'ওয়েন-ইয়েন', (২) চলিত ভাষা 'পাই-হুয়া', (৩) গ্রাম্য কথ্য ভাষা। 'ওয়েন-ইয়েন', ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই এ ভাষা বোঝে।

সাহিত্য-জাগৃতি যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'পাই-হুয়া' ভাষাকে সাহিত্যের রাজ-সিংহাসনে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। 'ওয়েন-ইয়েন' ভাষায় রচিত বহু প্রাচীন সাহিত্যকে নতুনভাবে ভাষান্তরিত করা হয়। ক্রমে 'ওয়েন-ইয়েন' ভাষা ঐতিহাসিকের গবেষণার বস্তু হয়ে ওঠে। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন আসে, ১৯১৯ সালের ৪ঠা-মে আন্দোলনের পর বিদেশী রূপরীতি ও ভাবধারায় চীনা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়।

কিন্তু তবুও সাহিত্য ব্যাপক রূপ নিতে পারেনি। অশিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্য-গণ্ডীর বাইরেই রয়ে গেল। সাহিত্য সীমাবদ্ধ হয়ে রইল ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে। এবং চীনের বুর্জোয়া সমাজের মত এই বুর্জোয়া সাহিত্যের রূপও হল কৃত্রিম ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন। চীনে গণ-সাহিত্যের জন্ম হয়েছে অনেক পরে, লাল চীনের প্রাণকেন্দ্র ইয়েনানে। এই গণ-সাহিত্যের পথ রচনা করেছে বহু বিরাট বিরাট গণ-অভ্যুত্থান, কৃষক ও শ্রমিকের অপরাজেয় প্রাণশক্তি।

১৯১৯ সালের ৪ঠা-মে আন্দোলনের পূর্বে সামান্য কিছু পরীক্ষামূলক কবিতা ও সাংবাদিকতা ছাড়া 'পাই-হুয়া' ভাষায় নতুন সাহিত্য-সৃষ্টি বিশেষ কিছু হয়নি। লু স্থন এই হিসেবে পথ-প্রদর্শক। ১৯১৮ সালে তাঁর 'পাগলের রোজনামচা' প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গল্প-গ্রন্থ 'না হান' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বইখানির সমাদর আজ পর্যন্ত এতটুকু কমেনি। রুশ সাহিত্যে গোর্কী ও শেকভের যে স্থান, চীনা সাহিত্যে লু স্থনেরও তাই।

ওঠা যে আন্দোলনটা আসলে ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের' বিরুদ্ধে জাতীয়-বিপ্লবী আন্দোলন। আন্দোলন শুরু করেন পিকিঙ-এর ছাত্ররা এবং এই আন্দোলনের একটা বড় রকম ধাক্কা পড়ে সাহিত্যের ওপর।

এই যুগের সাহিত্য-আন্দোলনে দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় এবং সাহিত্যিকরাও দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

প্রথম দলকে বলা যায় রোমান্টিকবাদী। এই মতাবলম্বী সাহিত্যিকরা 'সৃজনী সংঘ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের 'সৃজন' নিজস্ব উপভোগের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। যৌনসমস্যা ও প্রেম এঁদের সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মতে এঁরা বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও এই দলের একটি অংশ ছিল প্রকৃতই বিপ্লবী, কুও মো-জো এই অংশের নেতা।

দ্বিতীয় দল বাস্তববাদী। এঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম 'সাহিত্য অনুসন্ধানী সমিতি।' ১৯২০ সালের নভেম্বরে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন লু সুন, মাও তুন, ওয়াঙ তুঙ-চাও, চেঙ চেন-তো, লো হুয়া-শেঙ, চিয়েন সুয়ান-তুঙ, উ পিঙ-পো ও শ্রীমতী লু ঈন্। এঁদের মুখপত্র হিসেবে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হত: 'ছোট গল্প মাসিক' ও 'সাহিত্য।' এঁরা বিশ্বাস করতেন, 'সাহিত্য হবে সমাজ-জীবনের প্রতিবিম্ব, জীবনের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিফলিত হবে সাহিত্যে।'

দুই দলই অনুবাদের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 'সাহিত্য অনুসন্ধানকারীরা' অনুবাদ করতেন জাপানী, রুশ ও ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে। 'সৃজনী'দের মধ্যে কুও মো-জো সব চেয়ে বেশী অনুবাদ করেছেন। শেলী, গল্স্ওয়ার্দি, আপটন সিনক্লেয়ার, শেক্স্পীয়র, মেটারলিঙ্ক, অস্কার ওয়াইল্ড্ এবং অন্যান্য দেশের প্রচুর সাহিত্যিকের লেখা এইভাবে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এই দুটি ছাড়াও আর একটি দল ছিল। 'সমসাময়িক সমালোচনা' নামে

একটি সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই দলটির সৃষ্টি। এই দলে ছিলেন হু শি, হু ইয়ে-পিঙ, সু চি-মো। সু চি-মো প্রচুর বিদেশী সাহিত্য (স্টিভেনসন, ভলটেয়ার প্রভৃতি) চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, ৪ঠা-মে যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে মাত্র দুজন স্থায়ী আসন লাভ করতে পেরেছেন। একজন লু সুন, অপরজন কুও মো-জো। এই দুজন ছাড়া সেই যুগের অন্য সমস্ত সাহিত্যিকদের নাম আজ বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে মাত্র একজন আজও বেঁচে আছেন। তিনি হচ্ছেন 'বাঁকা চাঁদ' মতাবলম্বী দলের নেতা কবি সু চি-মো।

১৯২৫ সালের ৩০শে-মের বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের পর বামপন্থী সাহিত্য অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রুশ বিপ্লবের আদর্শ আগে থেকেই শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল, মার্কসীয় পুস্তকাদিও জাপানী ভাষা থেকে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সুতরাং গণ-আন্দোলনের রূপ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলে। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭— এই দুই বছরে বহু লেখক বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। তারপর ১৯২৭ সালে কমিউনিস্ট উচ্ছেদকার্য শুরু হবার পর হাজার হাজার ছাত্র-সম্পাদক ও লেখককে প্রাণ দিতে হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর এই 'বিশ্বাস-ঘাতকতা' প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য লেখকরাও বামপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯২৭ সালের পর সাহিত্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র পিকিং থেকে সাংহাইয়ে স্থানান্তরিত হয়। বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করে বামপন্থী সাহিত্যিকরা দলমত নির্বিশেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে: 'সৃজনী' (প্রথম প্রকাশ ১৯২২ সাল, ১৯২৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী দমননীতির প্রয়োগে প্রকাশ বন্ধ), 'সংস্কৃতি-সমালোচনা' (প্রথম

প্রকাশ ১৯২৯, দমননীতির প্রয়োগে ১৯২৯ সালেই প্রকাশ বন্ধ), 'সূর্য মাসিক' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৮, ১৯৩২ সালে প্রকাশ স্থগিত)। এই তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়, থিয়োরীগত প্রশ্নে পরস্পরের ভেতর আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলতে থাকে। এই বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার ভেতরেই বিপ্লবী গণ-সাহিত্যের জন্ম। এই বিপ্লবী গণ-সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ ছিল প্রচুর, উচ্ছ্বাস ছিল তীব্র—কিন্তু এমন একটা বলিষ্ঠ জীবনবোধও ছিল যা এর আগে চীনা সাহিত্যে এত স্পষ্টভাবে কখনো ফুটে ওঠেনি।

চীনা সাহিত্যে আধুনিক নাটকেরও আবির্ভাব হয় এই সময়ে, ১৯২৯ সালে। তিয়েন্ হান এবং হুঙ-সেন নামক দুজন বামপন্থী নাট্যকার এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ইবসেন ও রোমা রলাঁর বহু নাটক তিয়েন হান অনুবাদ করেছেন।

১৯২৭ থেকে ১৯৩২—এই পাঁচ বছরে বামপন্থী সাহিত্য দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। বুর্জোয়া সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সময়ে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি প্রায় কিছুই হয়নি। মুখ্যত সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রচারকার্য, নীতিগত বিচারবিশ্লেষণ ও সাংবাদিকতা। তার কারণ বোধ হয় এই যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভেতর যে ব্যর্থতা সৃষ্টি করেছিল তা স্বাভাবিকভাবেই প্রচারমূলক সাহিত্যের ভেতর তিক্ততা ও ক্রোধের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

১৯৩০ সালের ২রা মার্চ সাংহাইয়ে বামপন্থী লেখক সম্মেলন গঠিত হয়। এই প্রথম বিভিন্ন সাহিত্যিক দল একটিমাত্র সংগঠনে একত্রিত হলেন। পঞ্চাশজন প্রাথমিক সভ্য নিয়ে গঠিত এই সম্মেলনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন লু সুন। ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত লু সুন এত

সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী হয়ে ওঠেননি, ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার অকাট্য যুক্তি তাঁকে ধীরে ধীরে এই পথে এনেছে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এই সক্রিয় যোগদান বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে একটা বিরাট জয়লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে বামপন্থীদের আধিপত্য শুরু হয়। দলাদলি ভুলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যিক এই সংগঠনে যোগ দেন এবং বিরাট এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যেমন, লু স্যুনের সম্পাদনায় 'অঙ্কুর', তিঙ লিঙের সম্পাদনায় 'ডুবুরী' ইত্যাদি। দমননীতির প্রয়োগে এই সমস্ত পত্রিকার প্রকাশ বারবার স্থগিত রাখতে হয়েছে, লেখকদের বাধ্য হয়ে একাধিক ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হয়েছে—কিন্তু সাহিত্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি।

১৯৩১-৩২ সালে—যখন বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছে—কুয়োমিঙটাঙ সরকার হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে সমস্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বামপন্থী লেখক সম্মেলনের ছয়জন উদীয়মান সাহিত্যিকের প্রাণদণ্ড তো একটা সতর্কীকরণ মাত্র। চীনের এই প্রথম শহীদ সাহিত্যিক-দলের নাম : হু ইয়ে-পিঙ (বয়স ২৬, তিঙ লিঙের স্বামী), ফেঙ কেঙ (মেয়ে-ঔপন্যাসিক, বয়স ২৪), স্যুঙ হুই (২১) ঈন্ ফু (২২), লি ওয়েই-শেঙ (২৮), জউ শি (৩১)। ১৯৩২ সালে পুলিশবাহিনী ও নীলকোর্তা গোয়েন্দা দলকে ফ্যাশিস্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা হয় 'সাংস্কৃতিক দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান'কে সুসংবদ্ধ করবার জন্যে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর এই ধরনের বর্বর আক্রমণের দৃষ্টান্ত হয়ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে, কিন্তু এই আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের

বিপ্লবী সাহিত্যিকরা যে দুঃসাহসিক সংগ্রাম করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। বামপন্থী আন্দোলনের এই দুর্বার প্রাণশক্তি সত্যিই একটা বিস্ময়। গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ড একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কত সাহিত্যিক যে নিখোঁজ হয়েছেন তার সংখ্যা নেই, লু সুনের মত সাহিত্যিককেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, শ্রীমতী তিঙ লিঙ প্রায় চার বছর বন্দীজীবন কাটিয়েছেন—তবুও আন্দোলন সমান গতিতে অগ্রসর হয়েছে। হাজার হাজার বই বাজেয়াপ্ত করেও সাহিত্যকে টুঁটি টিপে মারা যায়নি।

এই কঠোর দমননীতির প্রয়োগে রীতিমত পরিবর্তন এসেছে বামপন্থীদের লেখায়। লেখা অনেক বেশী বিষয়মুখ হয়েছে, সমাজ ও জীবনকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা দেখা গিয়েছে—অর্থাৎ একটা 'নতুন বাস্তবতা' আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে বামপন্থী সাহিত্যে। সমালোচকরা মনে করেন, আধুনিক চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রূপান্তর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ। এই আন্দোলনের ভেতর যে দুজন সাহিত্যিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত প্রতিভাত হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন মাও তুন ও শ্রীমতী তিঙ লিঙ। চ্যাঙ তিয়েন-ঈ, লাও চাঅ ইত্যাদির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের নাম বাদ দিলেও বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাবও এই সময়েই।

কিন্তু এই ১৯৩২ সালের সংকটকালে এমন একদল সাহিত্যিকেরও আবির্ভাব হয় যাঁরা 'সাহিত্যেকের স্বাধীনতা' দাবী করেন। এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তু হেঙ ও শি চে-সুন। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এঁদের সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। এঁরা ছাড়া, ফ্যাশিস্ট কুয়োমিঙটাঙ সরকারের অনুগত দু-একজন ফ্যাশিস্ট লেখকেরও যে আবির্ভাব হয়নি তা নয়। অর্থাৎ এই সময়ে চীনা সাহিত্যে বহু বিচিত্র

ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু চীনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান এঁদের কারও নেই। 'আর্ট'এর আর্টস্ সেক্' মতে বিশ্বাসী বিশুদ্ধ সাহিত্যিকদের কোন অস্তিত্ব আজ আর চীনা সাহিত্যে নেই। বামপন্থী দলের বাইরে একজন মাত্র সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য, তিনি হচ্ছেন শেন সুঙ-ওয়েন। শেন সুঙ-ওয়েন এত প্রচুর লিখেছেন যে ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই তাঁর চল্লিশটি বই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি দল-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক এবং সাধারণভাবে গল্পলেখক, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং চ্যাঙ তিয়েন-ঈ প্রভৃতি লেখকের সমগোত্রীয়। আঙ্গিকগত উৎকর্ষতা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় একটা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আধুনিক চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি স্বীকৃত।

১৯৩৫ সালে বামপন্থী লেখকরা গণশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। যদিও 'পাই-হুয়া' ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হচ্ছে, কিন্তু এই ভাষাও জনসাধারণের কাছে 'ওয়েন-ইয়েন' ভাষার মতই দুর্বোধ্য। বামপন্থী সাহিত্যিকরা বুঝেছিলেন, সর্বসাধারণের ভেতর সাহিত্যের প্রসার না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের বিপ্লবী গণসাহিত্য সৃষ্টি হবে না, কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে লিখতে হলে তাদের সঙ্গে সাহিত্যিকের একটা যোগাযোগ থাকা দরকার।

১৯৩৭ সালে জাপানী যুদ্ধ শুরু হবার পর যখন কুয়োমিণ্টাঙ-কমিউনিস্ট মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয়, তখন কিছুকালের জন্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের ওপর ফ্যাশিস্ট দমননীতি বন্ধ হয়। এই সময়টুকুই চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে সমৃদ্ধতম যুগ। ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে লেখা হয়েছে। সব চেয়ে ব্যাপক প্রসার হয় নাটকের। গণশিক্ষা অভিযানের একটা প্রধান অঙ্গ হয় নাটক-অভিনয়।

শহরে-গ্রামে পথে-ঘাটে-মাঠে মঞ্চ খাড়া করে নাটকের অভিনয় চলতে থাকে।

কিন্তু কুয়োমিঙটাঙ সরকার বেশী দিন নিষ্ক্রিয় থাকেনি। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই মিলিত সাহিত্য-প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়, কুয়োমিঙটাঙ সরকারের ফৌজ জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে কমিউনিস্ট ঘাটিগুলো অবরোধ করে।

তারপর যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়োমিঙটাঙ সরকারের সমস্ত সামরিক শক্তি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে। কুয়োমিঙটাঙ শাসিত অঞ্চলে সাহিত্য বা সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, বর্তমান চীনের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র ইয়েনান। সমগ্র চীনের সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-অনুরাগীরা আজ ইয়েনানে উপস্থিত, নতুন গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের জীবন রুদ্ধ সংস্কৃতির দ্বার খুলে দিয়েছে, প্রকৃত গণ-সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে লাল চীনে।

আটজন নামকরা চীনা সাহিত্যিকের এগারোটি গল্প এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চীনা গল্পের এই ধরনের সংকলন ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। লু সুন ছাড়া আর কারও গল্প ইতিপূর্বে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কিনা সন্দেহ।

আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক লু সুন। তিনি যে শুধু শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক তাই নয়, শ্রেষ্ঠ নেতাও। তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব 'পাই-হুয়া' ভাষায় সর্বপ্রথম সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা। এই হিসেবে তিনি আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। 'আশীর্বাদ' গল্পটি লু সুনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

লু সুনের পরেই যদি উল্লেখ করতে হয় তবে অন্তত পাঁচজনের নাম

একসঙ্গে বলতে হবে। তাঁরা হচ্ছেন : তিঙ লিঙ, চ্যাঙ তিয়েন-ঈ, মাও তুন, শেন সুঙ-ওয়েন, লাও চাঅ। মাও তুন ছাড়া বাকী চারজনের সাতটা গল্প এই বইয়ে পাওয়া যাবে। তিঙ লিঙের 'রাত্রি' গল্পটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে পুনর্মুক্ত চীনের গণতান্ত্রিক জীবনের খানিকটা আভাস গল্পটিতে আছে। তেমনি 'স্তন' গল্পটিতে সামন্ততান্ত্রিক যুগের একজন জমিদার ও গোষ্ঠীপতির চিত্রের পাশাপাশি এই ঘুণ-ধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষী-বৌয়ের অনমনীয় প্রতিরোধ অত্যন্ত বলিষ্ঠ রেখায় ফুটে উঠেছে।

আরও যে তিনজনের গল্প এই বইটিতে আছে, তাঁদের মধ্যে তুয়ান-মু হুঙ-লিয়াঙ নবীনতম লেখক। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে এমন একটা গভীর আবেগ থাকে যা অনেক সময় কবিতার মত মনে হয়। 'চোর' গল্পটিতে তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

পিয়েন চি-লিন প্রধানত কবি। যুদ্ধের সময় তিনি চীনের অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত গ্যেরিলা দলে যোগ দিয়েছিলেন, সেই সময়েই 'লাল পায়জামা' গল্পটি লেখা।

'আধখেঁচড়া' গল্পের লেখক ইয়াও সে-ইন্ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু গল্পটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সার্থক ও বলিষ্ঠ।

লু সুন্

চান্দ্রমাস হিসেবে যে সময়টায় বছর শেষ হয়, সেটা আর যাই হোক বছর শেষ হবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। একটা আশ্চর্য নতুন বছর নতুন বছর আবহাওয়া নেমে আসে, পাতলা ধূসর মেঘ জমে সন্ধ্যার আকাশে। আর সেই মেঘের তলায় ঝলসে ওঠে ছোট ছোট হাউইবাজী, বজ্রনির্ঘোষে অভিনন্দন জানায় রান্নাঘরের দেবতার স্বর্গারোহণকে১। তারপর দিন যত এগিয়ে আসে, কলরব ততো বাড়ে, বারুদের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে।

এই রকম একটা রাত্রিতে আমি লো চিঙ-এ ফিরি। লো চিঙ আমার দেশ। 'দেশ' বললাম বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সেখানে আমার কোন ঘরবাড়ী নেই। আমি থাকি লো শি লাও-ইয়ের বাড়ীতে, তিনি আমার আত্মীয়, আমার চেয়ে এক পুরুষের বড়, চীনের পারিবারিক হিসেব মত তাঁকে আমার 'নকাকা' বলে ডাকা উচিত। তিনি চিয়েন-শেঙ২, পুরনো ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির কথা সব সময়েই তাঁর মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

এবার গিয়ে তাঁর ভেতর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখতে পাই না, অবশ্যই একটু বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু এখনো গালপাট্টা রাখেননি। নমস্কার বিনিময়ের

১ দেবরাজের কাছে গত বৎসরের পারিবারিক বিবরণ পেশ করবার জন্যে এই সময়ে রান্নাঘরের দেবতাকে স্বর্গে যেতে হয়। সাত দিন পরে তিনি ফিরে আসেন।

২ চিয়েন-শেঙ একটা উপাধি। টাকা খরচ করে কিনতে হয়।

আশীর্বাদ

পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছ ?' তারপর জানান যে আমি মোটা হয়ে গেছি। এটুকু করার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'নতুন পার্টি'কে গালি-গালাজ শুরু করেন। কিন্তু আমি জানি 'নতুন পার্টি' বলতে তিনি এখনো বেচারা কঙ য়ু-ওয়েইকেই[১] বোঝেন, চীনের জাগৃতিকে নয়—এই জাগৃতির কথা হয়ত এখনো শুনতেই পাননি তিনি। কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে যে কোথাও এতটুকু মিল নেই, তা না বললেও চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়বার ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না।

পরদিন অনেক দেরীতে আমার ঘুম ভাঙে, খাওয়াদাওয়া করে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার পরের দিনটা এভাবেই কাটে, তার পরের দিনও তাই। একটু বয়স বাড়া ছাড়া কারও কোন পরিবর্তন হয়নি, সবাই ব্যস্ত নব বৎসরের আশীর্বাদ-প্রার্থনার আয়োজনে। লো চিঙ-এ এই উৎসবটার খুব জাঁকজমক, প্রত্যেকেই যথাসাধ্য ভক্তিশ্রদ্ধা দেখায়, যথাসম্ভব আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে, এবং দেবতার সামনে শুয়ে পড়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আগামী বৎসরের জন্যে। অনেক মুরগী-মারা, হাঁস-হত্যা, শূকরমাংস-কেনা চলে। গরম জলে মাংস রান্না করতে গিয়ে মেয়েদের হাতের ছাল উঠে লাল হয়ে যায়। খুব ভালভাবে মাংস রান্না হবার পর তা রাখা হয় বেদীর ওপর, কাঠি গুঁজে দেওয়া হয় চারদিক থেকে, এবং ষষ্ঠ প্রহরে উৎসর্গ করা হয় দেবতার উদ্দেশ্যে। ধূপকাঠি ও লালবাতি জ্বালানো হয়, এবং পুরুষরা (মেয়েদের ঢুকতে দেওয়া হয় না) ভক্তিভরে প্রণাম করে স্বর্গের আত্মাদের আমন্ত্রণ করে পূজা-অর্ঘ গ্রহণ করবার জন্যে। তারপর অবশ্যই বাজী ছোঁড়া হয়।

১ কঙ য়ু-ওয়েই একজন পণ্ডিত লোক। মাঞ্চু বংশের শেষ দিকে মহারাজ কুয়াঙ সু-র সময়ে তিনি একটি আইনসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তৎকালীন রাজমাতা এই আন্দোলন দমন করেন।

প্রতিটি বছর এই রকম, প্রতিটি বাড়ীতে একই অনুষ্ঠান—অবশ্য যারা গরীব, পূজার অর্ঘ্য বা মোমবাতি বা বাজী কিনবার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের বাড়ী ছাড়া—এবং এই বছরটিও অন্য যে কোন বছরের মত। আকাশ অন্ধকার ও বিষণ্ণ, বিকেলবেলা বরফ পড়তে দেখা যায়—ফুলের মত গুচ্ছ গুচ্ছ বরফ, চারদিকের ধোঁয়া ও কলরবের ওপর দ্রুত চঞ্চল আবর্ত তুলে আরো বেশি বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। আমি যখন বাড়ী ফিরি তার আগেই বাড়ীর ছাদগুলো বরফে শাদা হয়ে যায়, আমার ঘরের ভেতরটা মনে হয় আরো বেশি উজ্জ্বল। আলো ঠিকরে আসে বরফ থেকে আর স্পর্শ করে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বোর্ডের ওপর গোটা গোটা লাল অক্ষরে লেখা 'দীর্ঘায়ু' শব্দটাকে। শোনা যায় এই শিল্পকর্মটি স্বনামখ্যাত চেন তুয়ান লাও-সোর। একটা কাগজের লেখা মাটিতে পড়ে গেছে এবং তাকে আলগাভাবে পাকিয়ে তুলে রাখা হয়েছে লম্বা টেবিলটার ওপর। কিন্তু অপর লেখাটি পড়ে আমি এখনো আশ্চর্য হই: 'বস্তুর যুক্তিকে গভীরভাবে অনুধাবন কর, বিনয়ী হও, হৃদয়ে ও ব্যবহারে ভদ্র হও।' জানলার নীচে ডেস্কের ওপর 'কিয়াঙ সি অভিধান'-এর অসমাপ্ত খণ্ড, সংগৃহীত মন্তব্য সমেত এক সেট 'আধুনিক চিন্তা' এবং 'চতুঃপুস্তক'। কী বিশ্রী পরিবেশ!

শহরে ফিরে যাওয়া স্থির করে ফেলি, খুব যদি দেরী হয় তো কাল, তারপর আর একদিনও এখানে নয়

সিয়াঙ-লিন সাওর ব্যাপারটা আমাকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তুলেছে। আজ বিকেলে আমি শহরের পূর্বাঞ্চলে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে খালের ধারে ওর সঙ্গে দেখা। ওর বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ও আমার কাছেই আসছে,

সুতরাং আমি অপেক্ষা করলাম। লো চিঙ-এ আমার অন্য সব পরিচিতদের দেখে মনে হয়েছে বটে যে তারা যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু সিয়াঙ-লিন সাও সম্পর্কে এ কথা খাটে না। ও আর আগেকার মত নেই, চুলগুলো শাদা, মুখটা ভয়ংকর রকমের রোগা আর গর্তে ঢোকানো, গায়ের রঙ পুড়ে গাঢ় হলদেতে দাঁড়িয়েছে। দেখে মনে হয় যেন শরীরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই, ওর বয়স যে এখনো চল্লিশ পার হয়নি তার কোন চিহ্নই নেই—যেন একটা কাঠের মূর্তির ওপর গভীর বিষাদের ছাপ এঁকে দেওয়া হয়েছে। শুধু নিষ্প্রভ চোখ দুটোর পলক এখনো প্রমাণ দিচ্ছে যে ও জীবিত। একহাতে একটা বেতের ঝুড়ি, ঝুড়িটার ভেতর একটা শূন্য ভাঙা পাত্র। একটা বাঁশের লাঠির ওপর ভর দিয়ে ও দাঁড়াল। দেখে মনে হয় যে ও এখন ভিখিরী হয়ে গেছে।

আমার কাছে পয়সা চাইবে মনে করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'তাহলে—তুমি ফিরে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল—ঠিক সময়েই এসেছ। আচ্ছা তুমি তো পণ্ডিত লোক, অনেক কিছু দেখেছ শুনেছ, অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে'—ওর নিষ্প্রভ চোখ দুটোতে একটা চাপা দ্যুতি ফুটে উঠল—'আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বলবে?'

ও আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে তা আমি হাজারবার চেষ্টা করেও কল্পনা করতে পারতাম না। বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ও আরো কাছে সরে এল, তারপর অত্যন্ত একাগ্র স্বরে অত্যন্ত চুপিচুপি ফিসফিস করে বলল—

'কথাটা এই: মৃত্যুর পর আত্মা নামে সত্যিই কি কিছু আছে?'

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি কেঁপে উঠলাম। ওর চোখ দুটো কাঁটার মত আমাকে বিদ্ধ করে রইল। বেশ ব্যাপার যা হোক! আমি এত বিব্রত হয়ে উঠেছিলাম যে কোন স্কুলের ছেলেকে হঠাৎ যদি মাস্টারমশাই সামনে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেন তবে তার অবস্থাও আমার মত হয় না। 'আত্মা' বলে সত্যিই কোন জিনিস আছে কিনা তা নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি, এ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। কি উত্তর দেব আমি? সেই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তটুকুর ভেতরেই আমার মনে পড়ল যে লো চিঙ-এর অধিকাংশ লোকেই একটা কিছু আত্মাতে বিশ্বাস করে এবং সম্ভবত এই বিশ্বাস ওরও আছে। হয়ত আমার পক্ষে একথাই বলা ঠিক যে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে—কিন্তু না, ওকে আশাভঙ্গ হতে দেওয়া উচিত নয়। যে লোকটিকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে জীবনের 'শেষ প্রান্তে' উপস্থিত, তাকে আরো ব্যথা দিয়ে লাভ কি? অন্তত ওর দিকে তাকিয়েও হ্যাঁ বলা উচিত।

'হয়ত আছে', বাধ-বাধভাবে বললাম আমি, 'আমার মনে হয় আছে।'

'তার মানে নরকও আছে?'

'এ্যাঁ—নরক?' ও আমাকে ফাঁদে ফেলেছে, আমার কথার জের টেনে চলা ছাড়া উপায় ছিল না, 'নরক? তা সহজ বুদ্ধিতে বিচার করলে মনে হয় বৈকি যে নরকও আছে। অবশ্য নাও থাকতে পারে। তা এই নিয়ে এত ভেবে লাভ কি?'

'তাহলে এই নরকে পরিবারের সমস্ত মৃত লোকেরা আবার মুখোমুখি মিলিত হয়?'

'হুম্? মুখোমুখি মিলিত হয়, এ্যাঁ?' নিজেকে বোকার মত মনে হল। আমার যা কিছু জ্ঞান, যা কিছু বিচক্ষণতা—তা কোন কাজেই এল না; তিনটে সহজ প্রশ্ন আমাকে একেবারে বিভ্রান্ত করে ফেলল। মনে মনে

স্থির করলাম যে এই জটিল জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলব একেবারে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি সমস্ত অস্বীকার করব সোজাসুজি। কিন্তু কেন জানি ওর তীক্ষ্ণ একাগ্র ও বিষণ্ণ দৃষ্টির সামনে তা করতে পারলাম না।

'তার মানে···সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক বলতে পারছি না। মৃত্যুর পর আত্মা আছে কি নেই তা আমি অস্বীকারও করতে পারব না, স্বীকারও করতে পারব না।'

এই কথা নিয়ে ও আর জেদ করল না, এবং ওর এই নিঃশব্দতার সুযোগ নিয়ে আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে নকাকার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। আমার সমস্ত উৎসাহ উদ্যম ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা চিন্তা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না যে হয়ত আমার কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হবে ওর ওপর। অবশ্য ওর নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ ওর পক্ষে আরও অসহ্য, বিশেষ করে এই সময়ে—যখন অন্য সবাই আশীর্বাদের জন্যে প্রার্থনা করছে। কিংবা হয়ত ওর মনে অন্য কোন চিন্তা এসেছে। হয়ত সম্প্রতি একটা কিছু ঘটেছে ওর জীবনে। তাই যদি হয় তো আমার কথাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে···কিসের জন্যে? কিছুক্ষণ পর সমস্ত ঘটনাকে মনে করে এবং একটা সামান্য ঘটনাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে প্রকাণ্ড করে তুলবার অসঙ্গত স্বভাবের জন্যে হাসি পেল আমার। জ্ঞানী লোকেরা একবাক্যে বলবে যে আমার মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি কি ওকে স্পষ্টই বলিনি যে আমার পক্ষে যতটুকু বলা সম্ভব তা হচ্ছে 'ঠিক বলতে পারছি না?' যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আমার কথাগুলো সত্য বলে প্রমাণিত নাও হয়, এবং যদি এই স্ত্রীলোকটির জীবনে কিছু একটা ঘটেও যায়—তবে তার জন্যে আমি কোন দিক দিয়েই দায়ী নই।

'ঠিক বলতে পারছি না' কথাটার অনেক সুবিধা আছে। বেপরোয়া ও দুঃসাহসী যুবকরা অবশ্য মাঝে মাঝে গুরুতর বিষয়ের ওপরেও একটা স্পষ্ট মতামত দিতে ভয় পায় না; কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের—যেমন সরকারী কর্মচারী বা ডাক্তার—অত্যন্ত সাবধানে কথা বলতে হয়, কারণ ঘটনার গতিতে যদি তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে ব্যাপারটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। 'ঠিক বলতে পারছি না'—এই কথাটা বলা অনেক বেশি সুবুদ্ধির পরিচয়, কারণ এই কথাটা বলার পর আর কোন সমস্যা থাকে না। ভিখিরী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের পর এই পদ্ধতিতে কথা বলার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি কারণ এই ক্ষেত্রেও অস্পষ্টভাবে কথা বলাটাই গভীরতম জ্ঞানের পরিচয়।

তবুও আমার মনের অস্থিরতা কাটে না এবং রাত্রিশেষে ঘুম ভাঙবার পরেও মনের ওপর ঘটনাটার একটা স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। মনে হয় যেন ভাগ্যের গতি একটা ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করছে। বাইরে আবহাওয়া এখনো বিষণ্ণ, দমকা বরফপাত এখনো শেষ হয়নি—আর এই নিরানন্দ ঘরের ভেতর বসে বসে আমার অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। না, কালই আমি শহরে ফিরে যাব। অবশ্য ফু শিঙ লাউ-এর সুরক্ষিত ও সুবিখ্যাত মাছের তরকারী এখনো অতুলনীয়—আর সস্তাও, এমন চমৎকার যার স্বাদ তাই কিনা মাত্র এক ডলারে পুরো এক ডিশ পাওয়া যায়। এখন কি ওর দাম বেড়েছে? আমার বাল্যবন্ধুদের অনেকেই মেঘের মত নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু লো চিঙ-এর এই অতুলনীয় মাছের তরকারীর অস্তিত্বটা অন্তত থাকুক। এর স্বাদটা আমাকে পেতেই হবে, হোক নিঃসঙ্গ—ক্ষতি নেই···তবুও কালই আমি ফিরে যাচ্ছি···

বহুবার আমি দেখেছি এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছি কিন্তু যা আমার কাছে অনভিপ্রেত ও অসম্ভাবিত ছিল। এবারেও

এর ব্যতিক্রম না হতেও পারে এবং এই জন্যে আমি যে একেবারে প্রস্তুত নই তা নয়। সন্ধ্যার সময় ভেতর দিককার ঘরে একটা পারিবারিক জটলা শুনতে পাই এবং কথাবার্তার টুকরো শুনে আমি বুঝতে পারি যে বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে তারা একটা ঘটনা আলোচনা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য সমস্ত গলা থেমে যায় শুধু নকাকার ভারী গলা তাঁর পাইচারিরত পায়ের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে:

'একটা দিন আগে নয় বা একটা দিন পরে নয়। ঠিক এই বৎসরকার দিনে এই কাণ্ডটা ও করে বসল। এর থেকেই বোঝা যায় ও সেই জাতের জীব যাদের মানুষের মত জ্ঞানবুদ্ধি এতটুকু নেই।'

প্রথমে আমার কৌতূহল হয় তারপর কেমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জাগে, যেন আমার পক্ষে এই কথাগুলোর বিশেষ একটা অর্থ আছে। বাইরে এসে ভেতরকার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে সবাই চলে গেছে। নিজের ক্রমবর্ধমান ধৈর্যহীনতাকে চেপে রেখে আমি অপেক্ষা করতে থাকি যে পর্যন্ত না আমার চায়ের পাত্রে গরম জল দেবার জন্যে চাকরটা ঘরে ঢোকে। তার আগে পর্যন্ত আমি নিজের সন্দেহ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারিনি।

'আচ্ছা একটু আগে নকাকা এত চটে উঠেছিলেন কার ওপর?'

'সিয়াঙ-লিন্ সাও ছাড়া আর কে হতে পারে?' আমাদের ভাষাগত সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা চাকরটির কথার ভেতর ফুটে ওঠে।

'কেন ওর কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে আমি জানতে চাই।

'ও বুড়ো[১] হয়ে গেছে।'

'মারা গেছে?' মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ডটা দুমড়ে মুচড়ে লাফিয়ে

১ বছরের এই সময়টায় চীনেরা 'মৃত্যু' বা তার কোন প্রতিশব্দ উচ্চারণ করে না। কেউ মারা গেছে বোঝাতে হলে বলে, বুড়ো হয়ে গেছে।

উঠেছে, মুখটা পুড়তে থাকে। কিন্তু চাকরটা আমার এই উত্তেজনা লক্ষ্য করে না, এমন কি মাথা তুলে তাকায়ও না একবার। নিজেকে সংযত করে আরও প্রশ্ন করবার মত অবস্থায় ফিরিয়ে আনি।

'কখন মারা গেছে?'

'কখন? গত রাতে—কিংবা হয়ত আজ। ঠিক বলতে পারছি না।'

'ওর কি হয়েছিল?'

'ওর কি হয়েছিল? দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করতে না পেরে ও মারা গেছে—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?' তার কথার ভেতর এতটুকু উত্তেজনা বা আবেগ ছিল না, আমার দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে সে বাইরে চলে যায়।

প্রথমে দারুণ একটা আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসে, কিন্তু নিজেকে আমি এই যুক্তি দিয়ে বোঝাই যে এই ঘটনা ঘটতই এবং আমি যে এটা জানতে পেরেছি তা নেহাতই একটা আকস্মিক ব্যাপার। আমার সেই ভাসা-ভাসা জবাব—'ঠিক বলতে পারছি না', আর চাকরের উক্তি—'দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করতে না পেরে ও মারা গেছে' মনে করে আমি নিজেকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি। তবুও কেন যে মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে থাকে তা ঠিক বুঝতে পারি না। পরে পূজনীয় নকাকার পাশে বসে বার বার আমার সিয়াঙ-লিন সাও সম্পর্কে একটা আলোচনা শুরু করবার ইচ্ছা হতে থাকে। কিন্তু কি করে তা করা যায়? তিনি যে জগতে বাস করেন সেখানে নানা ধর্মগত বাধা নিষেধ এবং বছরের এই সময়ে তা একটা দুর্ভেদ্য বনের মত হয়ে ওঠে। মৃত্যু, রোগ, পাপ বা এই ধরনের বিষয়-সম্পর্কিত কোন কথা এই সময়ে উল্লেখ করা চলবে না যদি না তা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে, এবং নিতান্তই যদি বলতে হয় তবে একটা অদ্ভুত হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে এমনভাবে ইঙ্গিত দিতে হবে

যেন সঞ্চারমান পিতৃপুরুষের আত্মা অপরাধ গ্রহণ না করেন। কিন্তু অনেক মাথা খুঁড়েও ঠিক ঠিক শব্দগুলো কিছুতেই আমার মনে পড়ে না এবং বাধ্য হয়ে আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

খাবার সময়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নকাকার মুখটা থমথমে হয়ে থাকে। অবশেষে আমার কেমন সন্দেহ হয় যে ওর কাছে আমিও 'সেই জাতের জীব যাদের মানুষের মত জ্ঞানবুদ্ধি এতটুকু নেই,' কারণ 'একটা দিন আগে নয় বা একটা দিন পরে নয়, ঠিক এই বৎসরকার দিনে' আমি হাজির হয়েছি। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্যে আমি জানাই যে আগামী কাল আমাকে চলে যেতেই হবে। তিনি বিশেষ কোন আপত্তি করেন না এবং আমি সিদ্ধান্ত করি যে আমার ধারণাটা ভুল নয়। কোন-রকমে খাওয়া শেষ করে আমি উঠে পড়ি।

ছোট দিনটা শেষ হয়। এই মাসেও স্বাভাবিক সময়ের আগেই বরফ পড়তে শুরু করেছে, সমস্ত শহরের ওপর কালো রাত্রি নেমেছে শবাচ্ছাদনের মত। বাতি জ্বালিয়ে লোকজন এখনো নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার জানলাটার ঠিক ওপাশেই মৃত্যুর নিস্তব্ধতা থমথম করছে। মাটির ওপর জমে ওঠা বরফের স্তরটা একটা পুরু মাদুরের মত। বাতাস কেটে কেটে টুকরো টুকরো বরফ নামবার সময় একটা অস্পষ্ট স্-স্ শব্দ উঠছে, সেই শব্দ আরো বাড়িয়ে তুলছে চারদিকের থমথমে নিস্তব্ধতাকে ও অসহ্য বিষণ্ণতাকে। তিলের তেলের হলদে আলোয় চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে নির্বাপিত-শিখা সিয়াঙ-লিন সাও-র কথা।

একদিন এই স্ত্রীলোকটির স্থান ছিল এই বাড়ীতেই। কিন্তু এখন, শিশুর পরিত্যক্ত পুরনো খেলনার মত তাকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই জগৎটা যাদের কাছে কৌতুককর, যাদের জন্যে ওর সৃষ্টি—

তারা যদি কোনদিন ওর কথা ভাবে তবে শুধু এই ভেবেই আশ্চর্য হবে যে ওর এতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবার ধৃষ্টতাটা এল কোন্ চুলো থেকে? তাই যদি হয় তো এখন আর তাদের ক্ষোভ করবার কিছু নেই—অবশেষে উ চাঙ১ ওকে নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। মৃত্যুর পর 'আত্মা' বলে কোন কিছু বেঁচে থাকে কিনা জানি না, কিন্তু একথাটা ঠিক যে সিয়াঙ-লিন সাও-এর মত লোকেরা যদি পৃথিবীতে না জন্মায় তবে অনেক কিছু মঙ্গল হতে পারে। পারে না কি? তখন কারও কোন কষ্ট থাকবে না—যারা লাঞ্ছিত হয় তাদেরও নয়, যারা লাঞ্ছনা দেয় তাদেরও নয়।

ঝরাপাতার মত এই শরৎকালীন বরফপাতের স্-স্ শব্দ শুনতে শুনতে আমি গভীর চিন্তায় ডুবে যাই এবং ক্রমে নিজের চিন্তার ভেতরে খানিকটা সান্ত্বনাও খুঁজে পাই। একটা জটিল ধাঁধা যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ওর জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একটা অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে আমার কাছে।

২

সিয়াঙ-লিন সাও-এর দেশ লো চিঙ নয়। এক বছর শীতের সময় যোগান-দার বুড়ী ওয়েইর সঙ্গে ও এখানে এসেছিল। পুরনো চাকরটার জায়গায় নতুন একটা লোক নকাকা খুঁজছিলেন, এবং এই কাজের জন্যে ও ছিল বুড়ী ওয়েইর মনোনীত প্রার্থী।

১ উ চাঙ আমাদের যমরাজের মত। মৃত্যুর পর আত্মাকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি আসেন।

মাথায় শাদা স্কার্ফ জড়ানো, পরনে নীল কাঁচুলি, ফিকে সবুজ জামা, কালো স্কার্ট—এই ছিল ওর পোষাক। তখন ওর বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ —একেবারে ছেলেমানুষের মত চেহারা, মুখখানা সুন্দরই বলা চলে, রক্তাভ গাল, দৃঢ়তাব্যঞ্জক চোখমুখ। বুড়ী ওয়েই বলল যে ও তার মা-র প্রতিবেশিনী এবং ওর স্বামী মারা গেছে বলেই ওকে কাজের সন্ধানে বাইরে বেরোতে হয়েছে।

নকাকা ভুরু কোঁচকালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে নকাকীমা বুঝতে পারলেন তিনি কি বলতে চাইছেন: একজন বিধবাকে এই কাজে নেওয়ার ইচ্ছা নকাকার নেই। কিন্তু নকাকীমা ওকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। ওর শক্ত ও সমর্থ হাত-পা এবং সহজ ও স্পষ্ট চোখের দৃষ্টি দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ও সেই জাতের স্ত্রীলোক যারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং বেশি পরিশ্রম করতে হলেও অনুযোগ করে না। সুতরাং স্বামীর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও নকাকীমা স্থির করলেন যে ওকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখবেন। তারপর তিন দিন ওর খাটুনি দেখে মনে হল যেন যে কোন রকমের বিশ্রাম ওর কাছে অসহ্য এবং নিঃসন্দেহে প্রমানিত হল যে, ও অত্যন্ত উৎসাহী এবং পুরুষের মতই শক্তিশালী। তখন নকাকীমা ওকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করলেন এবং ওর মাইনে মাসে পাঁচশো কাশ[১] স্থির হল।

সবাই ওকে শুধু সিয়াঙ-লিন সাও বলেই ডাকত, ওর বংশগত উপাধি যে কি তা কেউ ওকে জিজ্ঞাসা করেনি। বুড়ী ওয়েই ছিল ওয়েই চিয়া শান দেশের লোক (ওয়েই পার্বত্য বংশ), এবং যেহেতু সে বলেছিল যে সিয়াঙ-লিন সাও তার দেশের লোক সুতরাং সবাই ধরে নিয়েছিল যে ওর

১ আমাদের হিসেবে এক টাকারও কিছু কম।

উপাধিও ওয়েই১। পার্বত্য লোকদের মতই ও খুব কম কথা বলত এবং অপরের প্রশ্নের জবাবে হাঁ-না ছাড়া বিশেষ কিছু বলত না। দশ দিন কাটল ওর কাছ থেকে শুধু এইটুকু জানতে যে ওর দেশের বাড়ীতে ওর উগ্রচণ্ডী শাশুড়ী এখনো জীবিত, ওর দেওর কাঠ কেটে দিন চালায়, ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট ওর স্বামী গত বছর বসন্তকালে মারা গেছে এবং ওর স্বামী জ্বালানি কাঠ কেটে জিবীকানির্বাহ করত। ওর সম্পর্কে এর বেশী আর কেউ কিছু জানতে পারল না।

দিন কাটতে লাগল। সিয়াঙ-লিন সাও প্রত্যেকটি কাজে ঠিক তেমনি নিয়মিত। এতটুকু গাফিলতি নেই, খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে এতটুকু অভিযোগ নেই, এতটুকু ক্লান্তি নেই। সকলেই স্বীকার করল যে জমিদারবাবুরা এতদিনে একটা ভাল লোক পেয়েছেন। যেমন চটপটে তেমনি চালাকচতুর,—সত্যি কথা বলতে কি পুরুষ চাকরও এমনটি হয় না। এমন কি নতুন বছরের সময়েও সমস্ত কাজ ও একা করল। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ধুলো ঝাড়া, ধোয়ামোছা করা এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও হাঁস-মুরগী রান্না করা, পূজার অর্ঘ তৈরী করা—কোন কাজে কারও সাহায্য ওর দরকার হল না। মনে হল যেন এই সব কাজের ভেতর ওর প্রাণশক্তি প্রাচুর্যলাভ করেছে। ওর গায়ের চামড়া শুভ্রতর এবং ওর শরীর আর একটু মোটা হল।

নতুন বছর সবেমাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় একদিন খালের ধারে চাল ধুতে গিয়ে ও হঠাৎ রীতিমত উত্তেজিত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরে এল। শোনা গেল, খালের অন্য ধারে ওর দেওরের মত একটি লোককে

১ 'সাও' কথাটার অর্থ ননদ বা শ্যালিকা। চীনদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে সাধারণত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের শেষে 'সাও' জুড়ে দিয়ে ডাকা হয়। এই নিয়মে সম্ভবত ওর স্বামীর নাম ছিল ওয়েই সিয়াঙ-লিন।

ও দেখেছে এবং ওর ভয় হয়েছে যে ওর দেওর এসেছে ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। নকাকীমা সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। ওর দেওর কেন ওকে নিয়ে যাবে? খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেও ওর কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। গল্পটা শুনে নকাকা ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন:

'না এ তো ভাল কথা নয়। মনে হচ্ছে ও বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে, বাড়ীর অনুমতি নিয়ে আসেনি।'

এবং ঘটনাচক্রে তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। ও ছিল বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা বিধবা।

প্রায় দশ দিন পরে, যখন ক্রমে সকলেই ঘটনাটা ভুলে যাচ্ছে, বুড়ী ওয়েই হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে হাজির হল। স্ত্রীলোকটি নাকি সিয়াঙ-লিন সাওর শ্বাশুড়ী। কিন্তু তাকে দেখে একবারও মনে হল না যে স্বল্পবাক্ পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গে তার কোথাও মিল আছে। কি ভাবে কথা বলতে হয় তা সে ভাল করেই জানে এবং সামান্য ভদ্রতা বিনিময়ের পরেই সে সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল। সে বলল যে সে তার পুত্রবধূকে বাড়ী ফিরিয়ে নিতে এসেছে। তখন বসন্তকাল। বাড়ীতে অনেক কিছু করবার আছে কিন্তু বুড়ো আর কচিরা ছাড়া আর কেউ বাড়ীতে নেই, সুতরাং সিয়াঙ-লিন সাওকে দরকার।

'যেহেতু ওর নিজের শ্বাশুড়ী এই অনুরোধ জানাচ্ছেন সুতরাং এর যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।' নকাকা বললেন।

তখন সিয়াঙ-লিন সাওর মাইনে হিসেব করা হল। দেখা গেল, সবশুদ্ধ এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ কাশ মাইনে বাবদ ওর পাওনা হয়েছে। মাইনেটা ও মনিবের কাছেই জমতে দিয়েছিল, নিজের খরচের জন্যে একটি কাশও চেয়ে নেয়নি। বাক্যব্যয় না করে এই অর্থ শ্বাশুড়ীকে দিয়ে দেওয়া

হল যদিও সিয়াঙ-লিন সাও সেখানে উপস্থিত ছিল না। স্ত্রীলোকটি সিয়াঙ-লিন সাওর জামাকাপড়ও নিতে ভুলল না এবং নকাকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে ···

'আই-ইয়া! ভাত কোথায় গেল? সিয়াঙ-লিন সাও চাল ধুতে বাইরে গিয়েছিল না?'

কিছুক্ষণ পরে নকাকীমা এই বলে আচমকা চিৎকার করে উঠলেন। সিয়াঙ-লিন সাওর কথা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। এতক্ষণ পর, যখন তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করছেন, ভাতের কথা মনে পড়েছে তাঁরা আর চালের খোঁজ পড়তেই পুরনো ঝিয়ের কথাও মনে পড়ে গেছে।

প্রত্যেকে সর্বত্র চালের চুবড়িটার খোঁজ করতে লাগল। নকাকীমা নিজে প্রথমে গেলেন রান্নাঘরে, তারপর সামনের হলঘরে, তারপর শোবার ঘরে, কিন্তু যে বস্তুটিকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোথাও তার ছায়াও দেখতে পেলেন না। নকাকা বাড়ীর বাইরের দিকটা ঘুরে দেখলেন কিন্তু খালের ধারে আসার আগে পর্যন্ত তিনিও খুঁজে পেলেন না কিছু। খালের ধারে এসে তাঁর চোখে পড়ল, জলের ঠিক ধারটিতে একটা ফুলকপির পাশে হারানো চুবড়িটা পড়ে আছে।

বোঝা গেল, এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ একবারও খোঁজ করেনি কি ভাবে সিয়াঙ-লিন সাও তার শাশুড়ীর সঙ্গে যাত্রা করেছে। এবার প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণ পাওয়া গেল। সকাল থেকেই নাকি একটা শাদা ছই-ঢাকা নৌকো খালের ধারে নোঙর ফেলে অলসভাবে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সিয়াঙ-লিন সাও খালের ধারে আসে। জল তুলবার জন্যে ও সবেমাত্র একটু নীচু হয়েছে এমন সময় দুজন পুরুষ নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে ওকে জাপ্‌টিয়ে ধরে এবং জোর করে নৌকোর ওপর তুলে নিয়ে যায়। দেখে মনে হয়েছে যে ওরা পার্বত্যদেশের লোক। কিন্তু

সিয়াঙ-লিন সাওকে যে ওরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ও সমানে কেঁদেছে, সাহায্যের জন্যে চিৎকারও করেছে কয়েকবার। কিন্তু পরে ওর গলার আওয়াজ আর শোনা যায়নি, সম্ভবত একটা কিছু মুখে গুঁজে দিয়ে ওকে চুপ করানো হয়েছিল। তারপর দুজন স্ত্রীলোক না আসা পর্যন্ত আর কিছু ঘটেনি, স্ত্রীলোক দুজনের মধ্যে একজন বুড়ী ওয়েই। সিয়াঙ-লিন সাওর অবস্থাটা অবশ্য কেউ স্পষ্টভাবে দেখেনি কিন্তু যারা দু-একবার উঁকিঝুঁকি দিয়েছে তারা বলে যে ওকে হাত-পা বেঁধে নৌকোর পাটাতনের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল।

'কী ভয়ংকর!' নকাকা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে চিন্তা করার পর তিনি শুধু অসহায়ের মত বললেন, 'কিন্তু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত...'

সেদিন নকাকীমাকে নিজেই রান্না করতে হয়েছিল আর উনুনে আগুন দিয়েছিল তাঁর ছেলে আ নিউ।

বিকেলবেলা বুড়ী ওয়েই আবার হাজির।

'কী ভয়ংকর!' নকাকা এই বলে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

'ব্যাপার কি? চমৎকার! আবার হুজুরের আবির্ভাব কি মনে করে!' বাসন ধুতে ধুতে ক্রুদ্ধ চিৎকারে নকাকীমা বুড়ী যোগানদারকে বললেন, 'তুমি নিজেই ওকে পাঠিয়েছিলে আবার নিজেই ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে। ব্যাপারটা একেবারেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত। বাইরের লোক কি মনে করবে বলো তো? তুমি কি আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করেছ নাকি? তা যদি না হয় তো এসব কি?'

'আই-ইয়া! আই-ইয়া! আমি যে বোকা বনেছি তাতে আর সন্দেহ নেই। সেজন্যেই আমি আপনাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে

এসেছি। আমি কি করে জানব যে ও একটা অবাধ্য মেয়ে? একদিন ও এসে এই বলে আমার পা জড়িয়ে ধরল যে ওকে একটা কাজ যোগাড় করে দিতেই হবে। ওর কথা শুনে ওকে খাঁটি লোক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ও যে শাশুড়ীকে না জানিয়ে এসেছে, এমন কি শাশুড়ীর অনুমতিও নেয়নি, তা কে জানে? হুজুর, মা-ঠাকরুণ, আপনাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবার ক্ষমতা আর আমার নেই। সবই আমার দোষ, এই অসাবধানী বুড়ো হাঁদার। আপনাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছি না······সৌভাগ্যবশত, আপনারা উদারমনোভাবাপন্ন মহদাশয় ব্যক্তি, আমার মত ক্ষুদ্র লোককে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতে আপনাদের বাধবে নিশ্চয়ই? এর পরের বার আমি আপনাদের যে লোকটিকে দেব সে ওর চেয়ে দ্বিগুণ ভাল হবে, তাহলে এই পাপের প্রতিকার······'

'কিন্তু—' বাধা দিয়ে নকাকা আরম্ভ করলেন কিন্তু আর কিছু বলতে পারলেন না।

এইভাবে সিয়াঙ-লিন সাওর ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটল এবং ওর কথা হয়ত সবাই একেবারেই ভুলে যেত যদি না নকাকীমা তাঁর পরবর্তী চাকরদের নিয়ে এত মুশকিলে পড়তেন। তারা হয় কুঁড়ে, নয়তো পেটুক,—কোন কোন চূড়ান্ত ক্ষেত্রে কুঁড়ে আর পেটুক দুই-ই। 'কোন দিক দিয়েই' তারা এতটুকু মনের মত নয়। নিজের এই দুর্ভোগের ভেতর আদর্শস্থানীয় সিয়াঙ-লিন সাওর কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন নকাকীমা। তাঁর মনের ভেতর একটা গোপন ইচ্ছা ছিল যে, একটা কিছু দুর্ঘটনার ফলে ও আবার ফিরে আসতে বাধ্য হোক। অবশ্য, নতুন বছর আবার ফিরে আসতে যে দিনগুলো কাটল—ততদিনে ওকে ফিরে পাবার আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ছুটির শেষ দিকে বুড়ী ওয়েই একদিন এল কাউ-তাউ১ করতে ও অভিনন্দন জানাতে। এত মদ সে খেয়েছিল যে ইতিমধ্যেই তার অর্ধ-মাতাল অবস্থা। অনর্গল কথা বলছে সে। কৈফিয়তের সুরে সে বলল যে সে তার মা-কে দেখতে গিয়ে ওয়েই গাঁয়ে কয়েকদিন থেকেছিল বলে এবার নতুন বছরের প্রণাম জানাতে দেরী হয়ে গেছে। কথাবার্তা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সিয়াঙ-লিন সাওর প্রসঙ্গ উঠল।

'সিয়াঙ-লিন সাও?' নেশার ঝোঁকে প্রবল উৎসাহে সরু গলায় বুড়ী চিৎকার করতে লাগল, 'ও সত্যিই ভাগ্যবতী! কি জানেন, ওর শাশুড়ী ওকে নেবার জন্যে এখানে আসবার আগেই হু গাঁয়ের হু লাও-লিউ নামে একজন লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে এসেছিল। বাড়ীতে কয়েকদিন থাকবার পরেই ওকে আবার পাল্‌কিতে চাপিয়ে বরের বাড়ীতে পাঠানো হয়েছে!'

'আই-ইয়া, কী চমৎকার শাশুড়ী!' নকাকীমা বিস্ময়সূচক মন্তব্য করলেন।

'আই-ইয়া, মা-ঠাকরুণ! আপনার কথাবার্তা উঁচু দরজার২ ওপাশ থেকে। আমরা পাহাড়ে লোক, নীচু-দরজাওলা পরিবার। আমাদের কাছে কি আসে যায়? আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, ওর এক দেওর আছে; তার বিয়ে দেওয়া দরকার। যদি সিয়াঙ-লিন সাওকে প্রথমে বিয়ে দেওয়া না হয় তবে পরিবারের এত টাকা নেই যে ওর দেওর তার বৌকে যৌতুক দিতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ওর শাশুড়ী

১ আমাদের ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণামের মত চীনেরাও নতুন বছরের সময়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ও অভিনন্দন জানায়।

২ অর্থাৎ, সম্ভ্রান্তবংশ। নকাকীমার প্রতিবাদ শাশুড়ীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, পুত্রবধূর পুনর্বিবাহের অধার্মিকতার বিরুদ্ধে।

তেমন বোকা মেয়েলোক নয়, বেশ হিসেবী ও বিচক্ষণ। তার ওপর পুত্রবধূর বিয়ে সে ঠিক করেছে পাহাড়ের ভেতরকার দেশের লোকের সঙ্গে। কেন? বুঝতে পারছেন না? যদি কোন স্থানীয় লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া হয় তবে সামান্যই যৌতুক পাওয়া যাবে এবং যেহেতু পাহাড়ের ভেতরকার দেশের লোককে খুব কম মেয়েই বিয়ে করতে চায়, সুতরাং সেই বিয়েতে যৌতুকও আরো বেশি। এই ক্ষেত্রে সিয়াঙ-লিন সাও-এর জন্যে বরকে সত্যি সত্যিই আশি হাজার কাশ দিতে হয়েছে! এখন বাড়ীর ছেলেরও বিয়ে হয়ে গেছে এবং সে তার বৌকে পাঁচ হাজার কাশ যৌতুক দিয়েছে। বিয়ের খরচ বাদ দিয়েও দশ হাজার কাশ এখনো শাশুড়ীর হাতে আছে। বেশ চালাক মেয়েলোক, না? হিসেবটা জানে খুব ভাল, নয় কি?'

'আর সিয়াঙ-লিন সাও—ও কোন বাধা দিল না?'

'কথাটা হচ্ছে এই, ওর বাধা দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। এই অবস্থায় যে কেউ পড়ুক না কেন, তাকে প্রতিবাদ করতেই হবে। কিন্তু কে তা শোনে, বাড়ীর লোকজন মেয়েকে ধরে বেঁধে পাল্‌কিতে তুলে বরের বাড়ী নিয়ে যায়, জোর করে তার মাথায় ফুলের মুকুট পরায়, জোর করে ঠাকুর ঘরে কাউ-তাউ করায়, জোর করে একই ঘরে বরের সঙ্গে 'তালাবন্ধ' করে রাখে—ব্যস্, বিয়ে হয়ে গেল।'

'আই-ইয়া!'

'কিন্তু সিয়াঙ-লিন সাও যতটা বিদ্রোহ করেছিল, এমন আর কেউ করে না। লোকের মুখে শুনেছি যে ও ভয়ংকর রকমের বাধা দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য কোন মেয়ে এতটা করে না। তার কারণ হয়ত এই যে ও আপনাদের মত পণ্ডিত লোকের বাড়ীতে কাজ করেছে। মা-ঠাকরুণ, জীবনে আমি অনেক কিছু দেখেছি। বিধবাদের বিয়ে দেবার

সময় একদলকে দেখেছি যারা শুধু কাঁদে আর চিৎকার করে, একদল আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখায়, আরো একদল আছে যারা ঠাকুরঘরে কাউ-তাউ করতে অস্বীকার করে, এমন কি বাসরঘরের প্রদীপটাকে পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে! কিন্তু সিয়াঙ-লিন সাওর প্রতিবাদ এদের কারও মত নয়।

'গোড়া থেকেই ও একেবারে বাঘিনীর মত যুদ্ধ করেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে ও গালাগালি দিয়েছে। ওকে হু গাঁয়ে নিয়ে যেতে যেতে ওর গলা ভেঙে এমন অবস্থা হয়েছিল যে কথা বলতে পারছিল না। পাল্‌কির ভেতর থেকে ওকে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনতে হয়েছিল। দুজন লোক দরকার হয়েছিল ওকে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাবার জন্যে কিন্তু সেখানে কিছুতেই ও কাউ-তাউ করবে না। বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্যে লোকজনের অসতর্কতার ফলে ও একটু আলগা পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে—আই-ইয়া! বুদ্ধের নামে বলছি!—ধূপদানীর বেদীর ওপর ও এমনভাবে ঠাস্‌-ঠাস্‌ করে মাথা কুটতে শুরু করল যে গভীরভাবে কেটে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল! দু মুঠো ধূপের ছাই দিয়ে দু ভাঁজ লাল কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছিল কিন্তু তবুও রক্ত বন্ধ হয়নি। সত্যি সত্যিই ও শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছে। যখন ওকে বরের সঙ্গে বাসরঘরে বন্ধ করে রাখা হল, তখনো ও অভিসম্পাত দিচ্ছিল! খাঁটি প্রতিবাদ না হলে এমন হয় না। আই-ইয়া, সত্যিই খাঁটি।'

পাকা মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'তার পরে অবস্থাটা কি রকম?'

'লোকে বলে প্রথম দিন ও ওঠেনি, দ্বিতীয় দিনও নয়।'

'পরে?'

'তারপরে? হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ও উঠেছে। বছরের শেষে একটি ছেলেও

হয়েছে ওর। মা-র কাছে থাকবার সময় দু গাঁয়ের কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারা ওর কথা বলল। মা ও ছেলে—দুজনেই মোটাসোটা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত মাথার ওপর কোন শাশুড়ী নেই। মনে হয়, ওর স্বামী বেশ শক্তিমান পুরুষ ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। তার নিজের বাড়ী আছে। আই-ইয়া, ও সত্যিই ভাগ্যবতী।' তারপর থেকে সিয়াঙ-লিন সাওর চমৎকার কাজের কথা নকাকীমা আর ভাবতেন না কিংবা ভাবুন আর না ভাবুন মুখে আনতেন না একবারও।

৩

বুড়ী ওয়েই যে সময়ে সিয়াঙ-লিন সাওর আশ্চর্য সৌভাগ্যের সংবাদ এনেছিল তার দু বছর পরে শরৎকালে আমাদের সেই পুরনো ঝি আর একবার নকাকার বাড়ীর হলঘরের সামনে সশরীরে এসে দাঁড়াল। বাদামের মত দেখতে গোল একটা চুবড়ি আর গোল করে পাকানো ছোট্ট একটা বিছানা ও রেখেছে টেবিলের ওপর। এবারেও একটা শাদা স্কার্ফ জড়ানো ওর মাথায়, পরনে কালো স্কার্ট, নীল জামা এবং 'জ্যোৎস্না-শুভ্র' কাঁচুলি। ওর গায়ের রঙ আগের মতই আছে, শুধু ওর দুই গালের সেই সজীবতা আর নেই, অশ্রুলাঞ্ছিত দুই চোখের পুরনো ঔজ্জ্বল্য ও প্রভা ধুয়ে মুছে গেছে বলে মনে হয়। তার ওপর বুড়ী ওয়েই আবার এসেছে ওর সঙ্গে, চোখে মুখে সমবেদনার ছাপ। অসংলগ্নভাবে সে নকাকীমাকে বলল :

'একটা কথা আছে, ভগবানের মার কেউ জানতে পারে না—কথাটা একেবারে খাঁটি। ওর স্বামী ছিল শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান। কে ভাবতে

পেরেছিল যে এই কাঁচা বয়সে জ্বর হয়ে সে মারা যাবে? প্রথমবার তার জ্বর সত্যিই সেরে গেল কিন্তু এক থালা পান্তা-ভাত খেয়ে আবার জ্বর হল তার। সৌভাগ্যবশত ওর ছেলে ছিল। কাঠ কেটে, চায়ের পাতা তুলে, গুটিপোকার চাষ করে—এর প্রত্যেকটি কাজে ও দক্ষ—কোনরকমে ওর দিন চলছিল। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল ওর সেই ছেলেকেও নেকড়ে-বাঘ টেনে নিয়ে যাবে? তাই হয়েছে! নেকড়ে-বাঘ!

'তখন বসন্তকালের শেষ দিক, যে সময়ে নেকড়ে-বাঘের ভয় থাকে, তার অনেক দিন পরের কথা। কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল যে ওই একটা নেকড়ে-বাঘের অত সাহস হবে? আই-ইয়া! এখন নিজের দেহটুকু ছাড়া আর কিছু ওর নেই। জিনিসপত্র সমেত বাড়ীটা ওর ভাশুর দখল করে বসেছে এবং ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে নিঃস্ব অবস্থায়। এখন ওর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সহায়হীন, সম্বলহীন,' এবং আপনার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়ানো ছাড়া ওর আর উপায় নেই। এবার আর ওর কোথাও কোন সম্পর্ক নেই (যেমন শাশুড়ী)। আপনি নতুন চাকর খুঁজছেন তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আর এ বাড়ীর চালচালন ও ভাল করেই জানে সুতরাং নতুন লোকের চেয়ে ও যে ভাল কাজ করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'সত্যিই আমি বোকার মত কাজ করেছি, একেবারেই বোকার মত,' নিষ্প্রভ চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্যে তুলে কাতর স্বরে সিয়াঙ-লিন সাও বলল, 'আমি শুধু জানতাম যে যখন পাহাড়ের ওপর বরফ পড়ে তখন মাঝে মাঝে বুনো জানোয়াররা সাহস করে উপত্যকায় নেমে আসে, এমন কি, খাবারের সন্ধানে গাঁয়ের ভেতরেও ঢোকে দু-একবার। কিন্তু আমি জানতাম না যে বসন্ত আসবার এতদিন পরেও জানোয়ারগুলো

এত হিংস্র হতে পারে। একদিন সকালে এক ঝুড়ি মটরশাক নিয়ে আমি বাচ্চা আ মাওকে বললাম দরজার সামনে বসে বসে সেই শাক বাছতে। ছেলেটা ছিল খুবই চালাক আর বাধ্য। প্রত্যেকটি কথা সে শুনত, এবং সেদিন সকালেও সে আমার কথামত কাজ করল। ওকে সেখানে রেখে আমি গেলাম বাড়ীর পেছনে জ্বালানি কাঠ কাটতে ও চাল ধুতে। হাঁড়ির জলে চাল ঢেলে আমি আ মাওকে ডাকলাম, কারণ ভাত নামিয়েই আমি মটরশাক চড়াব। আ মাও কোন উত্তর দিল না। ঘুরে দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম আ মাও নেই; মাটির ওপর মটরশাক ছড়ানো। এদিক ওদিক খেলে বেড়ানো ওর স্বভাব ছিল না, তবুও আমি প্রত্যেকটি বাড়ীতে গিয়ে ওর খোঁজ করলাম। কেউ কোথাও ওকে দেখেনি। আমার ভীষণ ভয় হল! ওর সন্ধান করবার জন্যে আমি সকলের সাহায্য প্রার্থনা করলাম। সারাটা সকাল এবং সারাটা বিকেল আমরা আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ওর খোঁজ করা হল। অবশেষে ওর এক পাটি জুতো পাওয়া গেল একটা কাঁটাঝোপের ওপর। তখন সবাই বলল যে ওকে নেকড়ে-বাঘ ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা আমার বিশ্বাস হল না। একটু পরেই পাহাড়ের আরো ভেতরে ঢুকে আমরা... দেখতে পেলাম...ওকে। একটা ঘাসে-ঢাকা গুহার ভেতরে ও পড়ে আছে, পাঁচটি অঙ্গ নেই[১]। কিন্তু মটরশাকের চুবড়িটা তখনো ওর হাতে শক্ত করে ধরা আছে।' এই পর্যন্ত বলে ও একেবারে ভেঙে পড়ল, কতকগুলো ভাঙা ভাঙা অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে।

নকাকীমা প্রথমে ইতস্তত করছিলেন কিন্তু এই গল্প শুনে তার চোখে

১ অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষিত অবস্থায়।

জল এল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিধবাটিকে তার জিনিসপত্র ঝি-চাকরদের নির্দিষ্ট আবাসে নিয়ে যেতে বললেন। বুড়ী ওয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যেন একটা ভারী বোঝা ঘাড় থেকে নেমেছে। সিয়াঙ-লিন সাও খানিকটা শান্ত হল এবং দ্বিরুক্তি না করে বিছানার বাণ্ডিলটা রেখে এল পরিচিত ঘরটার ভেতর।

এইভাবে আর একবার লো চিঙ-এর বাড়ীতে পরিচারিকা হল ও। সবাই ওকে ওর প্রথম স্বামীর নাম অনুসারে সিয়াঙ-লিন সাও বলেই ডাকতে লাগল।

কিন্তু ও আর আগের মত ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তা দেখলেন যে আজকাল ওর হাত-পা সহজে নড়তে চায় না, কাজে আর তেমন উৎসাহ নেই, স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে গেছে আর ওর মড়ার মত মুখের ওপর সারাদিনে এতটুকু হাসির আভাসও দেখা যায় না। নকাকীমার গলার স্বর শুনেই বোঝা যেত যে তিনি ইতিমধ্যেই ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন। নকাকার অবস্থাও তাই। ও যেদিন প্রথম এল, সেদিনই তিনি অসম্মতিসূচক ভ্রূকুটি করেছিলেন—কিন্তু বাড়ীতে চাকরবাকরকে নিয়ে অশান্তির সীমা নেই দেখে তিনি সিয়াঙ-লিন সাওর পুনর্নিয়োগে বিশেষ কিছু আপত্তি করেননি। এখন, সব দেখেশুনে নকাকীমাকে তিনি বললেন যে যদিও স্ত্রীলোকটির অবস্থা অত্যন্ত শোকাবহ এবং সে জন্যে ওকে কাজ দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু ওকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্বর্গমর্তের সঙ্গে ও এক সুরে বাঁধা নয়। সুতরাং ওকে ওর কলঙ্কিত হাতের স্পর্শে পূজার বাসনপত্র অপবিত্র করতে যেন কিছুতেই না দেওয়া হয়, এবং বিশেষ করে পূজাআর্চার দিনে নকাকীমা নিজেই যেন সমস্ত রান্নাবান্না করেন। নইলে পূর্বপুরুষের আত্মা অসন্তুষ্ট হবেন এবং হয়ত বা এক কণা খাদ্যও স্পর্শ করবেন না।

আর সত্যি কথা বলতে কি, পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ দেওয়া নকাকার বাড়ীতে একটি প্রধানতম অনুষ্ঠান, কারণ তিনি এখনো অত্যন্ত কঠোরভাবে পুরনো রীতিনীতি মেনে চলেন। আগে আগে এই সময়ে ওর ভীষণ খাটুনি পড়ত। সুতরাং পরের বার এই উপলক্ষে যখন হলের মাঝখানে বেদী বসিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকা হল, তখন ঠিক আগের মতই মদের কাপ, পাত্র ও খাবারের কাঠি গোছগাছ করতে শুরু করল ও।

'সিয়াঙ-লিন সাও,' নকাকীমা ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা তোমার না করলেও চলবে। আমি ঠিক করে নেব।'

হতচকিত হয়ে ও সরে এল এবং তারপরে গেল মোমবাতি বার করতে।

'ওটাও তোমার না করলে চলবে। মোমবাতি আমি বার করে নেব।' নকাকীমা বললেন।

খানিকটা হতভম্ব অবস্থায় কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত ও দেখল যে কিছুই করবার নেই ওর, প্রত্যেকটি কাজ ওর আগেই নকাকীমা করে ফেলছেন। সন্দিগ্ধ মনে ও চলে গেল। সারাদিন রান্নাঘরে বসে উনুনের আঁচটা ঠিক রাখা ছাড়া আর কিছু করতে হল না ওকে, এই বিশেষ দিনে বাড়ীর লোকের কাছে এইটেই যেন ওর একমাত্র কাজ।

লো চিঙ-এর লোকেরা ওকে সিয়াঙ-লিন সাও বলেই ডাকতে লাগল বটে কিন্তু তাদের গলার সুরটা বদলে গেছে। অবশ্য তারা ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেনি, কিন্তু ওকে আর বিশেষ আমল দিত না, একটু অবজ্ঞাও করত যেন। ওর চোখে এসব ধরা পড়ত না বোধ হয়, পড়লেও হয়ত গ্রাহ্য করত না। লোকজনের মুখের দিকে ও তাকাত না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দূরের দিকে এবং সব

সময়ই বলত সেই এক কথা যা দিন ও রাত্রির সব সময়ে ওর মন জুড়ে থাকত।

'সত্যিই আমি বোকার মত কাজ করেছি, একেবারে বোকার মত, বারবার ও বলত, 'আমি শুধু জানতাম যে যখন পাহাড়ের ওপর বরফ পড়ে তখন মাঝে মাঝে বুনো জানোয়াররা সাহস করে উপত্যকায় নেমে আসে, এমন কি, খাবারের সন্ধানে গাঁয়ের ভেতরেও ঢোকে দু-একবার। কিন্তু আমি জানতাম না যে বসন্ত আসবার এতদিন পরেও জানোয়ারগুলো এত হিংস্র হতে পারে......'

একই গল্প একই কথায় বারবার বলত ও এবং বলার শেষ দিকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত আর বুক চাপড়াত।

এই গল্প শুনে প্রত্যেকেই বিচলিত হয়েছিল, এমন কি উন্নাসিক লোক-গুলোর মুখের ওপর থেকেও তাচ্ছিল্যের হাসি মুছে গিয়ে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। ওর ওপর সমস্ত ঘৃণা ভুলে গিয়েছিল স্ত্রীলোকেরা, অন্তত সেই মুহূর্তের জন্যেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছিল ওর নিদারুণ পাপ-কাজগুলোকে—আবার বিয়ে করা এবং শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্বামী নয় পুত্রেরও মৃত্যুর কারণ হওয়া—এবং অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত গলা মিলিয়ে কেঁদেও ছিল ওর সঙ্গে। অন্য কোন কথা ও বলত না—শুধু এই একটিমাত্র ঘটনা, যা ওর জীবনের কেন্দ্রস্থলে আঘাত করেছে, তার কথাই বারবার বলত ও। কিছুদিনের মধ্যেই লো চিঙ-এর প্রত্যেকটি লোক ওর এই গল্প, শুধু একবার নয়, কয়েকবার করে শুনল এবং শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বুদ্ধ-পূজারী উদারমনা বৃদ্ধারাও ওর এই গল্প শুনে চেষ্টা করেও এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারতেন না। শহরের প্রায় প্রত্যেকেই এই গল্পটা আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারত সুতরাং নতুন করে শুনতে হলে অত্যন্ত বিরক্ত হত প্রত্যেকে।

সত্যিই আমি বোকার মত কাজ করেছি, একেবারে বোকার মত,'
ও হয়ত শুরু করত।

'হ্যাঁ, তুমি শুধু জানতে যে যখন পাহাড়ের ওপর বরফ পড়ে তখন মাঝে মাঝে বুনো জানোয়াররা সাহস করে উপত্যকায় নেমে আসে, এমন কি, খাবারের সন্ধানে গাঁয়ের ভেতরেও ঢোকে দু-একবার……' নিষ্ঠুরভাবে ওকে থামিয়ে দিয়ে বাকি কথাগুলো ওর শ্রোতারা মুখস্থ বলে যেত, এবং চলে যেত সেখান থেকে।

হতভম্ব অবস্থায় হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত সিয়ান-লিঙ সাও, এমনভাবে তাকাত যেন এই প্রথম কোন লোককে ও দেখছে, তারপর এমনভাবে পা টেনে টেনে চলতে শুরু করত যেন এতদিন বেঁচে আছে বলে ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওর মনের এই দৃঢ়বদ্ধ চিন্তা ওকে স্থির থাকতে দিত না। পরোক্ষ উপায়ে অকপটভাবেই ও চেষ্টা করত অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে। মটরশাক বা চুবড়ি বা অপরের ছেলে-মেয়েদের দেখলে সরলভাবেই ওর মনে পড়ত আ মাও-র অপমৃত্যুর কথা। যেমন, তিন-চার বছরের কোন শিশুকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠত :

'আ মাও বেঁচে থাকলে এখন ঠিক এই রকমটি হত।'

সিয়াঙ-লিন সাওর চোখের বন্য দৃষ্টি দেখে ভয় পেত শিশুরা এবং পালিয়ে যাবার জন্যে মা-র স্কার্ট ধরে টানাটানি শুরু করে দিত। সুতরাং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একা পড়ে থাকত ও, এবং দ্বিতীয় কোন শিশু না দেখা পর্যন্ত বিড়বিড় করত আপন মনে। ওর এই কায়দা জেনে ফেলতে লোকের বেশি দেরী লাগল না, তখন এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা শুরু হল। যখনই ওকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কোন শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যেত, সবাই বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তাকাত ওর দিকে।

'সিয়াঙ-লিন সাও, যদি আমাদের আ মাও বেঁচে থাকত তবে ও ঠিক এত বড়টি হত, না ?'

হয়ত ও বুঝতে পারত না যে ওর দুঃখ অপরের মনে আর সহানুভূতির উদ্রেক করে না এবং এককালে যারা ওর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ইতিমধ্যে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ধরনের ঠাট্টাবিদ্রূপ অবশেষে ওর অবচেতনার বর্ম ভেদ করল এবং ক্রমে সবই বুঝতে পারল ও। বিদ্রূপ শুনে তখন ও শুধু তাকিয়ে থাকত। একটি কথাও বলত না।

৪

নববর্ষ উপলক্ষে লো চিঙ-এর উৎসবে কখনো ভাঁটা পড়ে না। দ্বাদশ চান্দ্রমাসের বিশ তারিখ পার হলেই উৎসব শুরু হয়।

পরের বছর এই সময়ে নকাকা একজন অতিরিক্ত চাকর রাখেন, তা ছাড়াও লিউ মা নামে একজন স্ত্রীলোককে ঠিক করেন যে হাঁস-মুরগী রেঁধে দেবে। এই লিউ মা একজন 'ধার্মিক স্ত্রীলোক'—বুদ্ধভক্ত, নিরামিশাষী, জীবনে প্রাণীহত্যা না করার প্রতিজ্ঞা সত্যি সত্যিই পালন করেছে। সিয়াঙ-লিন সাওর হাত অপবিত্র, সুতরাং ও শুধু উনুনের আঁচ ঠিক রাখল আর বসে বসে লিউ মা-র পূজার বাসনকোসন নিয়ে কাজ করা দেখল। বাইরে পৃথিবীটাকে মাদুরের মত ঢেকে দিয়ে চমৎকার একটা বরফের স্তর পড়েছিল।

'আই-ইয়া, সত্যিই আমি বোকার মত কাজ করেছি,' বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সিয়াঙ-লিন সাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'সিয়াঙ-লিন সাও, তুমি আবার সেই পুরনো রাস্তায় ফিরে চলেছ!'

একটু ক্রুদ্ধ গলায় ওকে বাধা দিয়ে লিউ মা বলল, 'আচ্ছা, আমার একটা কথার উত্তর দাও তো—একথা কি সত্যি যে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে বেদীর ওপর মাথা ঠুকেছিলে বলে তোমার কপালে ওই রকম দাগ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—তোমার যদি এতই ঘৃণা ছিল তবে কেন তুমি পরে আত্মসমর্পণ করলে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি! মনে হচ্ছে তোমার খানিকটা ইচ্ছা ছিল, নইলে—'

'হায়, হায়! আপনি জানেন না যে ওর কী ভীষণ জোর ছিল।'

'না, জানি না। আমি বিশ্বাস করি না যে তোমার নিজের যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে ওকে বাধা দেওয়া যেত না। তুমি যে নিজেই এজন্যে প্রস্তুত ছিলে তাতে আমার আর সন্দেহ নেই।'

'উঁ—তাই নাকি! আপনি হলে ক-দিন বাধা দিতে পারতেন আমি দেখতাম।'

লিউ মা-র প্রাচীন মুখের ভাঁজে ভাঁজে একটা হাসি ফুটে উঠল, মুখটাকে মনে হল যেন একটা পালিশ-করা আখরোট। তার শুকনো চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে স্থাপিত হল সিয়াঙ-লিন সাওর কপালের কাটা দাগের ওপর তারপর কি যেন খুঁজল ওর চোখের ভেতর। লিউ মা বলল:

'তুমি সত্যিই খুব চালাক নও। সে সময় যদি আর একবার জোরবার চেষ্টা করতে তবে তা-ই তোমার পক্ষে ভাল ছিল। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, প্রায় দু বছর তুমি তোমার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বাস

করেছ এবং এই ভীষণ পাপকাজের শাস্তি পেয়েছ মাত্র ওইটুকু। একবার ভাবো তো দেখি, পরলোকে যাবার পর তোমার দুই স্বামীর আত্মাই যখন তোমাকে দাবী করবে তখন ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কি করে? একটি-মাত্র উপায় আছে। নরক-সম্রাট ইয়েন-লু করবেন কি তোমাকে করাত দিয়ে দু'ভাগে কেটে দুই স্বামীর ভেতর ভাগ করে দেবেন—এ ছাড়া আর কিছু তিনি করতে পারেন না। আমি ঠিক কথাই বলছি।'

ভয় ও বিস্ময় মেশানো একটা ছায়া পড়ল সিয়াঙ-লিন সাওর মুখে এ কথা ও আগে ভেবে দেখেনি, পাহাড়ের ভেতর ওর গাঁয়ে একথা ও কখনো শোনেওনি এর আগে।

'আমার উপদেশ যদি শোন তো বলি। সময় থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করো। তু-তি মন্দিরে গিয়ে দ্বারদক্ষিণা দাও। এই দ্বারের ওপর যখন এক হাজার পায়ের ছাপ পড়বে এবং দশ হাজার পা১ এই দ্বার ডিঙিয়ে যাবে তখন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। এইভাবেই মৃত্যুর পর শাস্তির হাত থেকে হয়ত তুমি রেহাই পাবে।'

সিয়াঙ-লিন সাও একটি কথাও বলল না কিন্তু ওর মনে হল যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা ওকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একদিনেই ওর চোখের চারপাশে কালো কালো রেখা ফুটে উঠল। পরদিন প্রাতরাশ খাবার পর ও গেল তু-তি মন্দিরে এবং পুরোহিতের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করল যেন ওকে দ্বারদক্ষিণা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। পুরোহিত প্রথমে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর উচ্ছ্বসিত কান্না দেখে এই প্রার্থনা বিবেচনা করতে রাজী হল। তারপর অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পুরোহিত জানাল যে হাজার কাশ দিলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা হতে পারে।

১ অর্থাৎ দরজার চৌকাঠটা ওর মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে ওর প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে। চৌকাঠের ওপর যত বেশী পায়ের ছাপ পড়বে, ততো ওর পাপ কমবে।

বহুদিন হল ও গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ের লোকরাও ওকে এবং ওর মুখে আ মাও-র মৃত্যুর বিরক্তিকর গল্পকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু শীঘ্রই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ওর জীবনে একটা নতুন পরিণতি এসেছে। তখন বহু লোক আসতে শুরু করল এবং প্রত্যেকেই ওর কপালের কাটা দাগটা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল।

'সিয়াঙ-লিন সাও, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি: আচ্ছা ঐ লোকটির কাছে তুমি আত্মসমর্পণ করলে কেন?'

'খুবই দুঃখের বিষয়, খুবই দুঃখের বিষয়,' অন্য একজন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, 'ক্ষতটা খুব গভীর হয়নি।'

এই সব কথার বিদ্রূপ ও আঘাতটুকু ও ভাল করেই বুঝত। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নিজের কর্তব্য পালন করত ও। পরের বছর শেষদিকে ও নিজের প্রাপ্য সমস্ত মাইনে নকাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বারোটা রৌপ্য-ডলারে ভাঙিয়ে নিল এবং এক বেলার ছুটি নিয়ে গেল শহরের পশ্চিম দিকে। পরের বেলার খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই ও সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এল। মুখের ওপর এখন আর কোন কষ্টের ছাপ নেই, চোখ দুটোতে গত কয়েক মাসের ভেতর এই প্রথম একটু জীবনের ছাপ পড়েছে, মানসিক অবস্থাও বেশ উৎফুল্ল। নকাকীমাকে ও বলল যে ও মন্দিরে দ্বারদক্ষিণা দিয়ে এসেছে।

শীত উৎসবের আগমনী উপলক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করল ও এবং পুজোর দিন ওকে দেখে মনে হল যেন প্রচণ্ড উৎসাহে ও একেবারে ফেটে পড়ছে। নকাকীমা পুজোর বাসনকোসন বার করলেন এবং আ নিউ পুজোর বেদিটা নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে সিয়াঙ-লিন সাও গেল মদের কাপ ও খাবারের কাঠি বার করতে।

'থাক, থাক,' নকাকীমা চিৎকার করে উঠলেন, 'ওগুলো ছুঁয়ো না।'

যেন আগুনে পুড়ে গেছে এমনভাবে হাতটা সরিয়ে নিল ও, ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল মুখটা। সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও যেন ওর নড়বার ক্ষমতা আর নেই। পুজার ধূপ জ্বালাবার জন্যে ঘরে ঢুকে নকাকীমা ওকে যে পর্যন্ত না বেরিয়ে যেতে বললেন ততক্ষণ ও দাঁড়িয়ে রইল।

সেই দিন থেকে ওর শরীর দ্রুত শুকিয়ে গিয়েছে। এটা যে শুধু একটা শারীরিক অবনতি তা নয়, ওর জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে যেন। একটা ভীরু সন্ত্রস্তভাব এসেছে ওর মধ্যে, একটা অসুস্থ আতঙ্ক অধিকার করেছে ওকে—অন্ধকার বা কোন লোক বা প্রভু কি প্রভুপত্নীকে দেখলেও ভয় পায় ও। সমস্ত দিক থেকে ও এত ভীরু ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল যেন ছোট একটা ইঁদুর গর্তের থেকে মুখ বাড়িয়ে চোখ-ঝলসানো দিনের আলোর দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখছে। ছ-মাসের মধ্যেই ওর চুলগুলো একেবারে শাদা হয়ে গেল, স্মৃতিশক্তি এত অস্পষ্ট হয়ে গেল যে সময়ে সময়ে চাল ধুতেও ভুলে যেত। 'কি হয়েছে ওর? ওর এই অবস্থা হল কেন? এখানে ওকে আর না রাখাই ভাল,' প্রকাশ্যেই নকাকীমা এই ধরনের কথা বলতে শুরু করলেন।

কিন্তু ওর 'এই অবস্থা' যে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ এবং তা থেকে সেরে উঠবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কথা হল, ওকে অন্য কোথাও পাঠানো হবে বা বুড়ী ওয়েই-র বন্দোবস্তে ফেরৎ দেওয়া হবে। আমি যতদিন লো চিঙ-এ ছিলাম ততদিন কিছু হয়নি, কিন্তু তারপরেই এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়েছিল। নকাকার বাড়ী ছেড়ে আসবার পর বুড়ী ওয়েই সত্যি সত্যিই ওর ভার নিয়েছিল কিনা, না তারপর থেকেই ও ভিখিরী—তা আমি জানি না।

আতসবাজীর প্রচণ্ড শব্দে আমি জেগে উঠি এবং আগুনের হলদে শিখা দেখতে পাই। তারপরেই আমার কানে আসে বোমা ফাটার তীক্ষ্ণ 'পিপিপাপাও' আওয়াজ। পঞ্চম প্রহর পার হতে চলেছে, প্রার্থনা ও আশীর্বাদের এই সময়। কিন্তু আমার জড়তা সম্পূর্ণভাবে কাটছে না, অস্পষ্টভাবে শুনতে পাই বোমা ফাটার অবিশ্রান্ত আওয়াজ। প্রথমে একটির পর একটি, তারপর আরো দ্রুত আরো ঘন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, গোলাবর্ষণের মত বরফের বল ছিট্‌কে আসে আকাশ থেকে, পাতলা পাতলা বরফের টুকরো আবর্ত তোলে বুদ্‌বুদের মত, আচ্ছন্ন করে ফেলে চারদিক। এই শব্দ ও মৃদু ঝড়ের সংমিশ্রণের সীমারেখায় আমি কেমন একটা বিষণ্ণ বাড়ীর-জন্যে-মন-কেমন-করা গোছের আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করতে থাকি এবং এই প্রাণহীন দিনের ও রাত্রির প্রথম প্রহরের সমস্ত দুশ্চিন্তা এই পরিবেশের চাঞ্চল্যের ভেতর ডুবে যায়, হারিয়ে যায় উন্মুখ বাতাসে যা আশীর্বাদগ্রহণের পূর্ব-মুহূর্তে এই বাড়ীগুলোকে আচ্ছন্ন করেছে। এখন একথা ভাবতেও ভাল লাগে যে স্বর্গ ও মর্তের পুণ্য-আত্মারা উদারভাবে গ্রহণ করেছেন পূজার অর্ঘরূপে প্রদত্ত মদ, মাংস ও ধূপের উপাচারকে এবং মোহাচ্ছন্ন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানকার উন্মুক্ত বাতাসে। এই অবস্থায় তাঁরা নিশ্চয়ই লো চিঙ-এর সৎ লোকদের অশেষ সমৃদ্ধি দান করবেন।

চ্যাঙ তিয়েন-ঈ

গাঁয়ের লোকেরা খবরটা নিয়ে আলোচনা করছিল : জেন সানের বৌ নাকি চুয়াঙ-সি গাঁয়ে রয়েছে।

'ওর ভালবাসার লোকটিও কি ওখানে নাকি?'

'হ্যাঁ ওখানেই তো। বাচ্চা একটি মেয়েও আছে ওদের', চাপা স্বরে কে যেন বলল, যেন জোরে চিৎকার করে বললেই কুৎসা-রটনার পাপ করা হবে; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, লোকটির গলা দশ গজ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

'আমার সন্দেহ হয়, জেন সানের বৌয়ের আগের ছেলেটাও বেজন্মা।'

যে যুবকটি এই মন্তব্য করল, তার দিকে তাকাল সবাই। এই ধরনের মতামত নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখাই ভাল, এমনি একটা গুঞ্জন শোনা গেল সকলের মুখে।

'আমি একটা খবর বলতে পারি কিন্তু কাউকে বোলো না। জেন সানের বাড়ীর লোকজন ওকে ধরে নিয়ে আসবে।'

'বুড়ো চ্যাঙ ঘটনাটা কি ভাবে নেবে সে কথাই আমি ভাবছি। আমাদের গোষ্ঠীর মেয়ে এই—কি বলে—আর কি, এই ধরনের হবে তা ভাবা যায় না।'

ইতিমধ্যে গোষ্ঠী-সর্দার বুড়ো চ্যাঙ প্ল্যান আঁটতে বসে গেছেন। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে দাঁত খুঁটছেন

স্তন

তিনি। তেল চকচকে মুখ, যেন খানিকটা মোম লাগানো হয়েছে ; এক ঝলক অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পড়েছে মুখের ওপর, মুখটা জ্বলছে কাঁচের বোতলের মত। একটা গোপন আত্মসন্তুষ্টির অনুভূতি অধিকার করেছে তাঁকে, আড়াআড়িভাবে রাখা পা দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। জামার ওপর কতকগুলো শুকনো তরমুজের বিচি ছিল, কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর ছোট ছোট নৌকোর মত।

চুয়াঙ-সি গাঁয়ের ঐ লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে জেন সানের বৌয়ের যে কি লাভ হল তা তিনি সত্যি সত্যিই বুঝে উঠতে পারছেন না। লোকটাকে শাস্তি দিতে পারলে বেশ হয়, কিন্তু গোষ্ঠীর বাইরে কোন লোকের ওপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই।

এই কথা ভেবে তিনি আরো জোরে দাঁত খুঁটতে লাগলেন, যেন তিনি ওদের দেখাতে চান যে তাঁর হাতে আইন আছে। হাতের নখটা দাঁতের ওপর ঘস্ ঘস্ শব্দে আঁচড় কাটতে লাগল এবং মুখের নাল গড়িয়ে পড়ল হাতের তালু বেয়ে।

'হুঁঃ!' চিয়াঙ-সি গাঁয়ের ওই লিউ লোকটা তো একটা সামান্য চাষী মাত্র! জেন সানের বৌ কি করে যে ওর প্রেমে পড়ল সেটাই আশ্চর্য। কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি এল তাঁর মনে। আড়াআড়িভাবে রাখা পা দুটো কাঁপতে লাগল আরো জোরে জোরে, তরমুজের বিচির খোসাগুলো জামার ওপর থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ে গেল মাটির ওপর।

মেয়েটাকে যদি একবার হাতে পাওয়া যায় তবে তিনি ওকে এমন কষে চাবুক লাগাবেন যেন ওর পিঠটা চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।

তাঁর সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

না, জেন সানের বৌয়ের যা শরীর, চাবুকের মার কিছুতেই সহ্য হবে না।

আর কী নরম মাংস ওর শরীরে—না, না, মাংস বলা ভুল, ওর শরীরটা যেন জেলী দিয়ে তৈরী, মাখনের মত নরম, মৃদুতম স্পর্শেও তা গলে যাবে। বুড়ো চ্যাঙ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সত্যি, ওর শরীরের মাংসের ওপর চাবুকের মার কিছুতেই সহ্য হবে না। শুধু ওর গাল দুটোর কথাই ধরা যাক না কেন—হ্যাঁ, ওর গালের স্পর্শ যে কি রকম তা তিনি জানেন, ইতিমধ্যেই তিনি একদিন ওই গালের ওপর আঙুল দিয়ে খামচি কেটেছিলেন। রোদে-জলে-ঝড়ে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও ওর মুখটা এখনো কি কোমল, ওর দেহের অন্যান্য অঙ্গ না জানি কি হবে—এই কথাই বসে বসে ভাবতে লাগলেন তিনি।

একদিন এই জেন সানের বৌকেই অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে তোষামোদ করেছিলেন তিনি। অবশ্য খুব সহজে ও খুশি হয়নি। জলজলে কালো চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে আর চিৎকার করে বলেছিল, 'এর অর্থ কি ?'

'হয়েছে, হয়েছে, আর সতীপনা ফলাতে হবে না। আমি খুব ভাল করেই জানি যে জেন সান তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।'

এই কথা বলে লম্বা নখ সমেত তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওর স্তনের দিকে। কিন্তু ও সেই হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

'আপনার সাহস তো কম নয়—এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় !' বিস্ময়সূচক চিৎকার করে উঠেছিল ও।

'ভাল কথা, ভাল কথা, প্রকাশ্য দিনের আলোয় না হোক, রাত্রিবেলা—আমি জানি ওই জেন সানটার কোন ক্ষমতা নেই। সত্যি বলিনি ? এসো, এসো, আমাকে…'

'চলে যান ! এখুনি চলে যান এখান থেকে !'

তখন তিনি চটে উঠেছিলেন।

'কি বললে ?'

'আমি বলেছি—কর্তৃত্ব আছে বলে এইভাবে তা ব্যবহার করবার চেষ্টা কখনো করবেন না।'

'আর একবার বলে দেখ !'

তারপর তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ওর দিকে, অবশ্য তার আগে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলেন যে কেউ কোথাও নেই। শুধু জলের ধারে একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাদার ওপর কুকুরটার পায়ের ছাপগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন বিশেষ এক ধরনের ফুল। কুকুর যে কথা বলতে পারে না সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। মেয়েটিকে নিজের বাহু-বন্ধনের ভেতর টেনে আনবার প্রবল একটা ইচ্ছা ছিল তাঁর : ওর ঠোঁট দুটো কামড়িয়ে ধরতে পারলে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাবে বোধ হয়, ওকে নিঃশেষ করে ফেলবেন তিনি, আর ওর ওই গোলাপের মত গাল···তাঁর চোখ দুটোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কতগুলো রক্তবর্ণ শিরা উপশিরার জাল, আর তাঁর কপালের ওপর নীল শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে দিতে ও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। অবশ্য ঠিক কি ভাষা ও ব্যবহার করেছিল তা তিনি শুনতে পাননি।

'আরে বোন, তুমি এমন করছ কেন···তুমি যা চাও তাই দেব, শুধু আমাকে—'

'পশু ! আপনি না এই গোষ্ঠীর সর্দার ? আপনি নিজেই যদি এমন ব্যবহার করেন তবে কি করে গোষ্ঠীকে শাসন করবেন ? আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত···'

একথা শুনে তিনি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, 'ওগো মেয়ে, অত দেমাক

ভাল নয়। তোমাকে আমি নিজের স্তরে উঠিয়ে আনছি। তাই তো। সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আমি…’

‘আপনার ওই সৎ উদ্দেশ্যে কোন দরকার নেই আমার। আপনার টাকা ও প্রতিষ্ঠা আছে বলেই কি আপনি ভাবেন যে এই প্রকাশ্য দিনের আলোতেও খুশিমত যে কোন মেয়েকে আপনি পেতে পারেন?’

‘ফের!’

‘আপনাকে আমি ভয় করি না। চিরকালই আপনি পশুর মত ব্যবহার করেছেন, চিরকালই ঠকিয়ে এসেছেন জেনদের—আমাদের গোষ্ঠী-জীবনে আপনার উপস্থিতিটা চিরকালই একটা মড়কের মত।’

‘তাই নাকি!’ বিড়বিড় করে তিনি বলেছিলেন, তাঁর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছিল, ‘ছুঁড়ী কি বলছিস খেয়াল থাকে যেন!’

‘আপনাকে আমার ভয় কিসের? গোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাছে আমি বলে বেড়াব যে আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছেন!’

‘এই মাগীটা তো দেখছি ভীষণ বেয়াড়া’, বুড়ো চ্যাঙ নিজের মনে মনেই বলেছিলেন।

রেগে ওঠা খুবই সহজ, কিন্তু ওর গাল দুটোর দিকে তাকিয়ে সব কিছুই একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। ওর ওই গাল—জেলীর চেয়েও কোমল, মাখনের চেয়েও নরম; আর ওই কম্পিত চক্ষুপল্লব; স্ফুরিত রক্তাভ ঠোঁটের ফাঁকে দু সারি সুগঠিত সুসংবদ্ধ দাঁত।

তারপর কি করা যায়, তাই মনে মনে ভেবেছিলেন তিনি।—ওর ওপর জোর করা চলবে না, জোর করলে ও প্রত্যেকের কাছে বলে বেড়াবে যে সর্দার চ্যাঙ ওকে প্রলুব্ধ করেছে। না, কিছুতেই তিনি অধৈর্য হবেন না। মেয়েদের মন তো—বলে এক কথা, ভাবে অন্য কথা। ওর ওই ছোকরা প্রণয়ীর কথাই ধরা যাক না কেন—তার কাছে ও কোন

আপত্তি করেছে ? মেয়েগুলোই এই রকম। জেন সানের বৌও আর সব সময়েই তাঁর ওপর এত বিরূপ থাকবে না।

পরদিন তিনি একগাছি চুড়ি নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিলেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, চাল ধুতে এসেছিল জেন সানের বৌ।

'কে গো ওখানে !'

ও উত্তর দেয়নি।

'তুমি কি এখনো আমার ওপর রেগে আছ ?' হেসেছিলেন তিনি, 'এখনো কি সেই সতীপনা ফলানো হবে নাকি ? দেখ, দেখ, কি এনেছি !'

এই কথা শুনেও চাল ধোয়া থামিয়ে ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি।

'আচ্ছা, এদিকে ফিরে তাকাচ্ছ না কেন ?' নাটকীয় সুরে এবং নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী সহকারে তিনি বলেছিলেন, চুড়িসমেত হাতটা সন্ধ্যার রক্তাভ আলোয় চক্রাকারে ঘুরে গিয়েছিল। তবুও ও কোন উত্তর দেয়নি।

ভাবতে ভাবতে কেমন অস্বস্তি বোধ হল তাঁর। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি না করে তিনি ছাড়তে পারেন না—আর তাছাড়া, যে ডান হাত দিয়ে তিনি ওর গালে থামচি কেটেছিলেন তা এখন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ব্যথা নয়, জ্বালাযন্ত্রণা নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা অনুভূতি। সেই থামচি-কাটার ঘটনাটা এখনো তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। আঙুল সরিয়ে নেবার পর গালের সেই জায়গাটা শাদা হয়ে উঠেছিল প্রথমে, তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক রক্তাভা ফিরে পেয়েছিল।

এ সমস্তই কিছুকাল আগেকার ঘটনা। তারপর আজ পর্যন্ত একবারও ওকে পাননি তিনি, কারণ এই ঘটনার ঠিক পরেই ও ওর প্রণয়ীর কাছে পালিয়ে গিয়েছিল।

'হ্যাঁ, ঠিক! আর দয়ামায়া নয়। আর একবার যদি ওকে হাতের মুঠোয় পাই তবে চাবকিয়ে লাল করে দেব।'

তারপর একদিন ওর বুড়ী শাশুড়ী এসে খবর দিয়েছিল যে জেন সানের বৌ চুয়াঙ-সিতে পালিয়ে গেছে। খবরটা বলবার সময় বুড়ী কাঁপছিল, কারণ তার ছেলে জেন সান গোষ্ঠী-সর্দারের কাছে যে অর্থ ধার করেছে তা এখনো শোধ দিতে পারেনি।

'এখন আমি কি করবো?' বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করেছিল।

'ওকে ধরে নিয়ে এস!' বুড়ো চ্যাঙ টেবিল চাপড়িয়ে বলেছিলেন—এত জোরে টেবিল চাপড়িয়েছিলেন যে তাঁর হাতটা লাল হয়ে উঠেছিল। 'পর-পুরুষের সঙ্গে পালানো! ব্যাভিচার! শোন, তোমাকে বলে রাখছি, সমস্ত গোষ্ঠীর মুখে চুনকালি দিয়েছে ও। যে করে হোক ওকে ধরে আনা চাই—উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি।'

২

কিছু দিনের মধ্যেই মেয়েটিকে আনবার পর পৈতৃক মন্দিরের দালানে এক সভার আয়োজন করল সিয়াঙ-গিন্নী। সেই সভায় উপস্থিত রইল গোষ্ঠী-সর্দাররা, সিয়াঙ-গিন্নীর আত্মীয় স্বজন এবং জেন সানের বৌয়ের বাপ-মা। স্বভাবতই বুড়ো চ্যাঙ উপস্থিত ছিলেন সেখানে, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ভ্রূকুটি করে আপন মনেই বার বার তিনি বলছিলেন, 'ওকে তাড়িয়ে না দেওয়াই ভাল। এখানেই ও থাকুক—তাই ভাল, কিন্তু রীতিমত শাস্তি দিতে হবে ওকে, হ্যাঁ।'

গোষ্ঠী-সর্দার হিসেবে জেন সানকে ডেকে পাঠাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর।

'তুমি কি এখনো ওই স্ত্রীলোকটিকে চাও ?' জেন সানকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চললেন, 'আমার মনে হয়, ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত। ভদ্রভাবে চলতে শিখুক ও। কি বলো ? ওকে যদি আমরা তাড়িয়ে দিই, তবে যে জেনদের সুনাম চিরকালের জন্যে ডুবে যাবে তা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। হাজার হোক, ও তো এই জেন বংশেরই বৌ, নয় কি ? ওকে খানিকটা শাস্তি দিয়ে ভদ্রভাবে চলবার আদেশ দিলেই কাজ হবে।'

কি বলবে বুঝতে পারল না জেন সান, কেমন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এটুকু সে জানত যে গোষ্ঠী-সর্দারের কথা মেনে চলতেই হবে, কারণ তিনি তার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেননি, এমন কি একশো চল্লিশ ডলার ধারও দিয়েছেন তাকে।

'কি বলছ ?' বুড়ো চ্যাঙের চিৎকারে সে সজাগ হল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো চ্যাঙ বললেন, 'ওকে যদি আমরা তাড়িয়ে দিই তবে জেনদের সুনাম চিরকালের জন্যে ডুবে যাবে। তোমার হয়ত মনে হতে পারে যে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি তা মনে করি না।'

ঠিক হল, ওকে শাস্তি দেওয়া হবে। বিচারের জন্যে এই পৈতৃক মন্দিরে গোষ্ঠী-সর্দারদের সামনে উপস্থিত হতে হবে ওকে। পূর্বপুরুষরা গোষ্ঠীর এই কলঙ্ক যেন জানতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে মন্দিরের সমস্ত ছোট ছোট বাক্স খুলে রাখা হল—বাক্সের ভেতরে চৌকো চৌকো কাঠের ওপরে সোনালী অক্ষরে পূর্বপুরুষদের নাম লেখা। টেবিলের ওপর একটা রেকাবিতে এক টুকরো রক্তবর্ণ রেশমী কাপড়, মাঝে মাঝে ঘরের ভেতর যখন দমকা হাওয়া ঢুকছে কাপড়ের টুকরোটা কাঁপছে সন্ত্রস্তভাবে। প্রকাণ্ড টেবিলটার তলায় শেকল, দড়ি আর বাঁশের টুকরোর একটা বিশৃঙ্খল

দাঁত খুঁটবার একটা অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা কয়েকবার পেয়ে বসেছিল বুড়ো চ্যাঙকে, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি আত্মসম্বরণ করেছেন। উচ্চকিত ভ্রূভঙ্গী করে নিরীক্ষণ করেছেন গোষ্ঠী-জ্যেষ্ঠদের, তাকিয়ে দেখেছেন—যে সারিতে জেন সানের আত্মীয়স্বজনরা বিচিত্র মুখের ভাব নিয়ে বসে আছে—সেদিকে। আর তারপরেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর। সিয়াঙ-গিন্নীর একটু পেছনে ও দাঁড়িয়ে, দেওয়ালের গায়ে ওর ছায়াটা ভাগ হয়ে গেছে দু ভাগে।

ওর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি, তারপর আবার তাকালেন। নিজের অজান্তেই তাঁর ডান হাতের আঙুলটা দাঁতে ঠেকেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে হাতটা টেনে নিয়েছেন জামার লম্বা আস্তিনের ভেতরে। ইতিমধ্যে উপস্থিত প্রত্যেকেরই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর। বিশেষ করে জেন সানের নিকট আত্মীয়রা লুকিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। অবশ্য খুব ঘন ঘন নয়—কারণ, তাহলে বুড়ো চ্যাঙের কাছে ধরা পড়বার ভয় আছে।

ওর মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। অনবরত ঠোঁট কামড়াচ্ছে ও। আগের চেয়ে একটু ফ্যাকাশে ও একটু রোগা দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু তেমনি গোলগাল, তেমনি শক্তসমর্থ। এবার ও এমনভাবে মাটির দিকে তাকাল যেন নিজের মন স্থির করে ফেলেছে।

সিয়াঙ-গিন্নী উঠে দাঁড়াল, তারপর গোড়া থেকে শুরু করে ধরে আনবার আগে পর্যন্ত ওর সমস্ত অপরাধের তালিকা সংক্ষেপে বলে দাবী জানাল যে এখানে পূর্বপুরুষের সামনে গোষ্ঠী ওর বিচার করুক।

সকলে তাকাল বুড়ো চ্যাঙের দিকে, শুধু মেয়েটির দৃষ্টি আগের মতই স্থির হয়ে রইল।

বুড়ো চ্যাঙ বললেন, 'সিয়াঙ-গিন্নীর কথায় সমস্ত ঘটনা পরিষ্কারভাবে

জানা গেছে। দোষীর বাপ-মাও এখানে উপস্থিত। তোমরা—ঈঙ-রা—ওকে শাস্তি দেবার পক্ষে আছ কিনা তার ওপরেই অবশ্য এই বিচারের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে।' 'ঈঙ' মেয়েটির বাপ-মার নাম।

ঈঙ-গিন্নী বললেন, 'এত কাণ্ডের পর আমার মেয়েকে শাস্তি পেতেই হবে। আমি চাই যে ও শাস্তি পাক।'

'বেশ, বেশ। আমি জানতাম তোমরা বুদ্ধিমান লোক। তোমাদের মেয়েকে তোমরা সহজে ছাড়বে না···যাক্, এবার ওকে আমি প্রশ্ন করব, আমি···' তাঁর হাতের আঙুল আবার দাঁতে ঠেকল। 'এদিকে এস,' চিৎকার করে জেন সানের বৌকে ডাকলেন তিনি, 'নিজের পক্ষে তোমার কি বলবার আছে, বলো।'

ও কোন কথা বলল না।

'উত্তর দাও!'

তবুও কথা বলল না ও।

'কথা বলো! উত্তর দাও!'

কিছুক্ষণ পর আবার তিনি বললেন, 'কথা বলছ না কেন?'

'আমার কিছু বলবার নেই' পাথরের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ধীর অস্পষ্ট গলায় বলল ও। ওর কথা শুনে প্রত্যেকে আশ্চর্য না হয়ে পারল না।

'নিজের অপরাধ নিজে যদি স্বীকার নাও কর তো কিছু যাবে আসবে না! সবই জানি আমি।' বুড়ো চ্যাঙ আর্তনাদ করতে লাগলেন, 'শুধু আমি কেন, সবাই জানে। বুঝেছ? সবাই জানে। আর তোমার বাপ-মার কাছ থেকে তোমাকে শাস্তি দেবার অনুমতি আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রিয় বোন ঈঙ-গিন্নী মত দিয়েছে···আচ্ছা, এবার এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে হবে।'

একটু ঝুঁকে দ্বিতীয় গোষ্ঠী-জ্যেষ্ঠের কানে কানে কথা বলতে লাগলেন

তিনি। এই দুই বৃদ্ধের গোপন আলোচনার প্রতি উপস্থিত প্রত্যেকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল।

অবশেষে বুড়ো চ্যাঙ সোজা হয়ে বসলেন এবং আস্তিনের ভেতর থেকে হাত দুটো বের করে বলতে শুরু করলেন, 'এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই বলেই আমি মনে করি। এটা এমন একটা কলঙ্ক যা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। এই ব্যাপারে আমাদের বংশগত সুনাম ম্লান হয়েছে। গোষ্ঠী-সর্দার হিসেবে আমার কর্তব্য আধুনিক কালের এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং যারা দুর্নীতিতে বিশ্বাস রাখে বা নীতির ওপর যাদের কোন শ্রদ্ধা নেই তাদের সামনে ওকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা। বাৎসল্য, ভ্রাতৃপ্রেম, আনুগত্য, আন্তরিকতা, ন্যায়পরতা, লজ্জাবোধ—এই সব সদ্‌গুণের ওপর এখন কারও আর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। অবস্থাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। স্বৈরাচারের চেয়ে বড় পাপ আর নেই—না, নেই! অবস্থা সত্যিই সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। সমগ্র জেনবংশের সুনাম আজ কলঙ্কিত। এমন শাস্তি ওকে দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে প্রত্যেকের কাছে সেটা একটা আতঙ্কের মত হয়ে থাকে। হাঁটু গেড়ে বোসো!' কথা শেষ করে উন্মত্তভাবে টেবিল চাপড়ালেন তিনি, রেকাবির ওপর লাল রেশমী কাপড়ের টুকরোটা কাঁপতে লাগল থর থর করে। তিনি বলে চললেন, 'জেন সান, ওর জামা খুলে ফেল! একশো ঘা লাগাও!'

তারপর তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, জেন সান ওর গায়ের ওপরকার জামাটা খুলে ফেলল। দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে হল যে চুয়াঙ-সিতে ওর প্রণয়ী ওকে ঠিক এইভাবেই বিবস্ত্রা করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন তিনি, মনে মনে কামনা করতে লাগলেন যেন জেন সান ভুলে ওর অন্তর্বাসটাও খুলে না ফেলে।

এবার ওর পরনে শুধু ব্লাউজ ও কোরা ছিটের পায়জামা। স্তন দুটি

ব্লাউজ ফুঁড়ে ফুটে উঠেছে, ব্লাউজের আবরণ সত্ত্বেও দুটি স্তনাগ্র স্পষ্ট দেখা যায়। কতবারই না জানি ওর প্রণয়ী ওই স্তন দুটিকে সোহাগ করেছে! জেন সান যখন ওর জামা খুলছিল তখন রৌপ্যমুদ্রার ঝনঝনানি শুনেছেন তিনি···

বেদীর দিকে মুখ করে নতজানু হয়ে বসল ও। হাত দুটো শক্তভাবে চেপে ধরে রইল ওর মা আর শাশুড়ী।

হাতের তালুতে থুথু ঘষে নিয়ে জেন সান একটা চেরা বাঁশ তুলে নিল টেবিলের তলা থেকে।

হুইস্‌শ্‌! তার হাতের লাঠি সশব্দে দাগ কেটে বসল ওর পিঠের ওপর। তারপর আর এক ঘা। দাঁতে দাঁত ঘষছে জেন সান, ফুলে ফুলে উঠেছে দু হাতের পেশী। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ঘা পড়ল পর পর। তারপর আরো অনেক ঘা, আরো অনেক দ্রুত গতিতে।

বাঁশের চেরা অগ্রভাগ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, ক্রমে গোড়ার দিকের মোটা অংশটুকু ছাড়া আর কিছু রইল না।

তার বৌয়ের জেলীর মত নরম শরীরের কি অবস্থা হয়েছিল তা কেউ জানতে পারেনি, কারণ ব্লাউজের আবরণ ঢেকে রেখেছিল সেই দৃশ্য। বাঁশের লাঠিটার লোহার মত কাঠিন্য, জেন সানের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ, প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের আর্তনাদ—এসবের থেকে হয়ত অনুমান করা যাবে খানিকটা। ব্লাউজের সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে ওর শুভ্র দেহ ফুলে উঠবে চাকা চাকা হয়ে, বেগুনী ও নীল হয়ে যাবে। তারপর যখন আরো আঘাত পড়বে তখন রক্ত ঝরবে ফুলো জায়গাগুলো থেকে, আর শাদা ব্লাউজটা লাল হয়ে উঠবে সেই রক্তে।

একটিও শব্দ করেনি ও। ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপেছিল প্রাণপণ শক্তিতে। বাধা দেয়নি একবারও, কিন্তু প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে

সঙ্গে নিজের অজান্তেই শিউরে শিউরে উঠেছে। ওর হাত দুটো মা ও শাশুড়ীর হাতের মুঠোয় আবদ্ধ, এদিক ওদিক নড়বার ক্ষমতাও ওর নেই। যন্ত্রণা চেপে চোখ বুজে থেকেছে ও, এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে চোখের কোণ থেকে। যতবার জেন সান হাতের লাঠি উঠিয়েছে, ততবার মনে মনে প্রার্থনা করেছে। প্রার্থনাটা এই জন্যে নয় যে আঘাতটা লঘুতর হোক, এই জন্যে যেন আঘাতটা কোন ক্ষতমুখের ওপর না পড়ে। কিন্তু কোন ফল হয়নি ওর প্রার্থনার। অত্যাচারীর আঘাতে ওর মসৃণ চামড়ার ওপর প্রথমে আঁচড় পড়েছে ফুলো ফুলো হয়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরেছে তারপর।

সুতীর ব্লাউজে রক্তের দাগ পড়েছে, লাল হয়ে গেছে সবুজ বাঁশটা।

একশো।

জামার আস্তিন দিয়ে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছে নিয়ে হাঁপাচ্ছে জেন সান।

বুড়ো চ্যাঙের চোয়ালটা আকস্মিক ওঠা-নামা করছে মাঝে মাঝে।

'আচ্ছা এবার তুমি বলো, এখনো কি তুমি চুয়াঙ-সিতে যেতে চাও?' অস্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জেন সানের বৌয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। হাঁপ নিতে চেষ্টা করছে ও। চোখ দুটো বোজা।

'উত্তর দিচ্ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল ওর মা।

'শুধু একবার তুমি নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ কর।' হাসলেন বুড়ো চ্যাঙ।

'আমি ··আমি···'

কি উত্তর ও দেয় শুনবার জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে রইল প্রত্যেকে।

'আমি···আমি·· '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ?'

'তবুও আমি চুয়াঙ-সিতে যাব।'

ওর গলার স্বরটা দুর্বল শোনাল, কিন্তু ওর কথাগুলোর ফল হল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মত। মুখ হাঁ করে বড় বড় চোখে বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

বুড়ো চ্যাঙের কপালের ওপর নীল নীল শিরাগুলো ফুলে উঠল স্পষ্টভাবে, ছাইয়ের মত হয়ে গেল মুখটা। বেশ্যা! ওই ছোটলোক চাষাটার কাছেই আবার যাবে ও! নেমকহারাম মাগী! জ্ঞানশূন্য হয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে উঠলেন তিনি। মনে হল, তাঁর অন্তরের সমস্ত ক্রোধ এই একটি চিৎকারের ভেতর ফুটে উঠেছে।

'লাগাও! আবার লাগাও!'

মাথাটা ও আরো নীচু করে রইল। প্রতিটি নতুন আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওর শরীর। তারপর হঠাৎ মূর্চ্ছা গেল ও, ওর চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটোতে লাগল সবাই।

'জ্ঞান ফিরে এলেই আবার মার লাগাতে শুরু করবে।' চিৎকার করে বললেন বুড়ো চ্যাঙ।

ওর ব্লাউজ আর পায়জামা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ওর মা-র হাত দুটো কাঁপছে, টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে চোখ থেকে।

'উত্তর দাও। এখনো কি তোমার চুয়াঙ-সিতে ফিরে যাবার ইচ্ছা?'

ও কোন উত্তর দিল না।

ওর হয়ে ওর মা কাকুতি মিনতি করল, চোখের জল গড়াতে লাগল তার দুই গাল বেয়ে। 'একবার বল্ না বাছা যে যাবি না।'

অশ্রুভরা চোখে মুখ তুলে মেয়ে বলল, 'ভয় পেও না মা…আমি…তবুও আমি যাব…'

বুড়ো চ্যাঙের মনে হল যেন তাঁর ফুসফুসটা ফেটে যাবে। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'আবার লাগাও!'

আর একবার মেয়েটি সংজ্ঞাহীন হয়েছিল। কিন্তু কোন নালিশ জানায়নি ও। চোখের ওপর সমস্ত শরীর কেটে গিয়ে রক্ত ঝরেছে তবুও যে কথাটা সবাই ওকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিল তা কিছুতেই বলেনি ও। ওর আশা ছিল যে সবাই ওর সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে ওকে। কিন্তু বুড়ো চ্যাঙ ওর মনের এই সব চিন্তা খুব ভাল করে জানতেন বলেই ওকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে কোন কথাই তোলেননি। আর ওর এই পাগলামি দূর না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে তিনি এইভাবেই পিট্তে থাকবেন।

'তবুও তুমি চুয়াঙ-সিতে যাবে?' মুখ থেকে পিচকিরির মত থুথু ছিটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি, 'যতক্ষণ না ও নিজের দোষ স্বীকার করে, মার থামিও না।'

ওর শরীরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ব্লাউজ ও পায়জামা দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। ছ-বার মারা হয়েছে ওকে আর ছ-বার সংজ্ঞাহীন হয়েছে ও। উপস্থিত প্রত্যেকেই চোখ বন্ধ করে আছে শক্তভাবে, ওর দিকে তাকিয়ে দেখবার সাহস নেই কারও। গোপনে চোখের জল মুছছে কেউ কেউ। দু হাতের ভেতর মুখ লুকিয়েছে ওর বাবা; মা কাঁদছে। অশ্রুভরা চোখে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছে সিয়াঙ-গিন্নী। হাত কাঁপছে জেন সানের, বাঁশের লাঠিটা চেপে ধরবার ক্ষমতাও আর নেই বোধ হয়।

'আচ্ছা, এবার?' নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই প্রায় অচেনা মনে হল বুড়ো চ্যাঙের।

চোখ দুটো একটু খুলে তাকাল ও।

'হ্যা…হ্যা…তবুও আমি চুয়াঙ-সিতে যাব…'

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন টেবিলের ওপর। মনে হল, গোটা পৃথিবীটাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলবেন যেন।

'লাগাও, আবার মার লাগাও! জেন সান, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে—' পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলেন তিনি।

জেন সানের হাত দুটো কেঁপে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল সে।

'লাগাও—'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে গোষ্ঠী-সর্দারের পা জড়িয়ে ধরল ওর মা।

'বেচারীকে এবারকার মত মাপ করুন…'

তখন গোষ্ঠীর মেজসর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বলল যে ওর ওপর আরো মারধোর চালানো বোধ হয় একেবারেই সম্ভব হবে না।

'ওকে আটক রাখ!' বুড়ো চ্যাঙ বললেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল সকলে।

৩

মাঠের গাছগুলো নেড়া নেড়া। প্রকাণ্ড এক তাল হলদে মাটির স্তূপের মত পাহাড়। বাতাসে শীতের আভাস।

গত কয়েক মাসে বুড়ো চ্যাঙকে দেখে মনে হয়েছে যেন তিনি জেন সানের বৌয়ের জন্যে উৎকণ্ঠিত। জেন সানের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বলেন:

'তোমার বৌ কেমন আছে?'

'ও তো বাড়ীর কথাবার্তা সবই মেনে চলে, কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।'
'সাবধান। দেখো যেন পালিয়ে না যায়।'
'আজ্ঞে, দেখব—পালিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।'
'আর ওই বেজন্মা মেয়েটার খবর কি ?'
'আমার শাশুড়ী মেয়েটাকে চুয়াঙ-সিতে ওর বাবার কাছে নিয়ে গেছেন।'
আজকাল জেন সানের বৌ লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। নদীর ধারে যখন ও চাল বা তরকারী ধুতে আসে, সে সময় ওর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে বুড়ো চ্যাঙের—কিন্তু তিনি দেখেছেন যে আজকাল ওর সঙ্গে কথা বলাটাই শক্ত। তিনি ওকে ন্যায়সঙ্গত শাস্তিই দিয়েছেন কিন্তু ওকে দেখে মনে হয় যে ও মনে মনে তাঁকে ঘৃণা করে। নিজেকে তিনি এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন: 'না, এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা চলবে না। তা করা ভীষণ রকমের বিপজ্জনক। কথায় বলে—সবুর না করলে মেওয়া ফলে না। জেন সানটার তো কোন জোর নেই, শুধু চুয়াঙ-সির প্রণয়ীর কথা ও যদি ভুলে যায় তবে আর কোন গোলমাল থাকে না।'
দিন দশেক পরে একটা সংকট দেখা দিল। অবশ্য বুড়ো চ্যাঙ যা চেয়েছিলেন, তা নয়।
অবশেষে জেন সানের বৌ নাকি ওর দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করেছে। আগের মতই কথা বলছে আর হাসছে ও, বিশেষ করে সিয়াঙ-গিন্নীর প্রতি ওর ব্যবহার অত্যন্ত বিনীত। 'গোলা পাউডার' মেখে আজকাল ও প্রসাধন করে, খোপা বাঁধে পরিপাটি করে। আর যখনই জেন সানের সময় থাকে, তার কাছে ঘন হয়ে বসে ও, চিমটি কাটে উরুতে, কানে কানে ফিসফিস করে কত মিষ্টি কথাই না জানি বলে। কিন্তু পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকায় জেন সানের দিকে, হাসে খিল খিল করে। জেন

সানও হাসে, ঠাট্টাতামাসা করে, চিৎকার করে গালাগালি দেয় মাঝে মাঝে।

কিন্তু সিয়াঙ-গিন্নীর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, তার ধারণা এর পেছনে একটা মতলব আছে। জেন সান ও তার বৌ যখন রাত্রিবেলা ঘুমোতে যেত, তিনি বাইরে থেকে ওদের ঘর তালাবন্ধ করে দিতেন।

এই সমস্ত সংবাদ বুড়ো চ্যাঙের কাছে পৌঁছল, এবং ঘটনার এই গতিতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।

'অমন সুন্দরী বৌয়ের সঙ্গে ও বেটা কেন শোবে? হতভাগা! শুয়োরের বাচ্চা! বেটা ষাঁড়ের গোবর, নেহাৎ ভুলেই ওর ভেতর পদ্ম ফুটেছে।'

আর আজকাল ও আগের মতই লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করছে। তিনি ভাবলেন, এবার আস্তে আস্তে ওর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভালও লেগে যেতে পারে ওর।

হাসলেন তিনি। চোখ দুটো ছোট হয়ে সরু সরু রেখার মত হয়ে উঠল। এক গাছি পাথরের তৈরী চুড়ি হাতে গলিয়ে নিলেন তিনি। হঠাৎ একটা চিন্তা তাঁর মনের ভেতর ঝলসে উঠল, 'হয়ত রূপোর টাকাই বেশী পছন্দ ওর।' সূর্যাস্তের সময় পকেটে পাঁচটা রূপোর টাকা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নদীর ধারে উপস্থিত হলেন।

ও তখন সবেমাত্র চাল ধোয়া শেষ করে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছিল।

'ও, ব্যস্ত আছ দেখছি।' বললেন তিনি।

'গোষ্ঠীসর্দারমশাই যে,' ও হাসল তাঁর দিকে তাকিয়ে।

আরও কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। ও সরে গেল না। হঠাৎ কথা আটকে গেল তাঁর মুখে, ওকে কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর কি উচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করা? না হালকাভাবে কথা শুরু করবেন তিনি? কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আমতা আমতা করে

বললেন, 'হ্যাঁ······কি বলে·· ···বলছিলাম কি জেন সান কি বাড়ী আছে ?'

'আজ্ঞে, আপনি কি ওকে খুঁজছেন ?'

'ঠিক তা নয়। না, ঠিক তা নয়······দরকারটা ঠিক জেন সানের সঙ্গে নয়। তুমি আমায় একবারটি বলো ·····'

মেয়েটি হাসতে লাগল ওর দিকে তাকিয়ে। ওকে একবার চেপে ধরবার ইচ্ছা হল তাঁর। কথাটা তিনি ভাষায় প্রকাশ করবেন কি করে ?

'তুমি কি রূপোর টাকা ভালবাস ?'

মুচকি হেসে মাথা নীচু করল জেন সানের বৌ, ঠোঁট ফাঁক করে ফিসফিস করে বলল :

'জেন সান যদি শোনে তো আমাকে মেরে ফেলবে।'

উশখুশ করতে লাগলেন বুড়ো চ্যাঙ। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, এই মুহূর্তে ওকে জড়িয়ে ধরেন নিজের আলিঙ্গনে, কোলে করে নিয়ে যান নিজের বাড়ীতে, সহবাস করেন ওর সঙ্গে। ইচ্ছা হচ্ছে আলতোভাবে ওর সর্বাঙ্গে কামড় দেবার, ওকে সোহাগ জানাবার। এই জন্যে জেন সান যে ওকে মারতে পারে, এই চিন্তা অসহ্য।

'আমি তোমাকে রক্ষা করব······তোমার কোন ভয় নেই······'

আরও কাছে সরে এলেন তিনি, একটা হাত রেখে চাপ দিলেন ওর কাঁধের ওপর মৃদুভাবে তারপর সেই হাতটা নামিয়ে আনলেন ওর হাতের ওপর দিয়ে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওকে স্পর্শ করছেন তিনি। এবারের স্পর্শ বাঁ হাতে, ডান হাতে পাঁচটা টাকা মুঠো করা রয়েছে। তারপর তাঁর মনে হল, 'না পাঁচটা টাকা একটু—হ্যাঁ—একটু বেশী বৈকি।' দুটো টাকা নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বাকি তিনটে ওকে দিয়ে গেলেন তিনি।

ও একটু হাসল কিন্তু টাকা নিল না।

ভয়ে নিতে পারছে না, এই মনে করে তিনি ওর পকেটে টাকা তিনটে গুঁজে দিতে গেলেন। পকেটে হাত ঢোকাবার সময় তাঁর হাত ওর স্তন স্পর্শ করল। এইবার নিয়ে তৃতীয়বার ওকে স্পর্শ করছেন তিনি। এবারের স্পর্শ আবার ডান হাতে।

'অসভ্য !' কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করল ও, 'লোকে দেখে ফেলবে যে।'

জোরে হেসে উঠলেন তিনি। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে একসারি বাদামী ছোপ লাগানো অসমান দাঁত বেরিয়ে পড়ল ; বোধ হয় সন্ধ্যার আহারের পর তিনি দাঁত খুঁটতে ভুলে গেছেন।

'জেন সানকে ভয় কোরো না। শুধু একবার ভেবে দেখ। যেদিন তোমার খুশি......'

'হ্যাঁ।'

'দু-একদিনের মধ্যে আমাকে জানাবে তাহলে ?'

একবার ঘাড় নেড়ে ও দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনের খুশিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বুড়ো চ্যাঙ। এমনভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন যেন চিত্ররসিক কোন শিল্পকর্মের প্রশংসা করছে। আজ রাত্রেই তিনি ওকে পেলেন না বলে হতাশ হলেন আর মনে মনে বললেন, 'ভগবান, গতি দাও।'

আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে এখানে ওখানে।

৪

দালালের সঙ্গে কথা বলবার সময় অনবরত তিনি দাঁত খুঁটতে থাকেন।

'জেন সানকে গিয়ে বলো গে যাও যে এই মাসের মধ্যেই ওকে টাকা ফেরৎ দিতে হবে। সুদ সমেত। বোলো যে এই মাস শেষ হবার পর আর একটি দিনের জন্যেও আমি এই কর্জা ফেলে রাখব না।'

তিনি আবার দাঁত খুঁটলেন, 'আর বোলো যে দুবার আমি কর্জার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমার জরুরী দরকার। টাকাটা আমার চাই-ই। কথাগুলো ভাল করে শুনছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

'শুনছ বলে তো মনে হচ্ছে না। এটা একটা জরুরী ব্যাপার। টাকাটা ফিরে পেতেই হবে আমাকে।'

মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন, দালালের কাছে মেয়েটির কথা বলবেন কি বলবেন না। তিনি জানতেন যে ধার শোধ করার ক্ষমতা জেন সানের নেই। আর তাই তিনি চান মনে মনে, কারণ তাহলে তিনি জেন সানের কাছে একটা জামিন দাবী করতে পারেন দালালটিকে কিছু বলবার আগেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কানে কানে বলল ঃ

'ওকে কি বলবো যে ওর বৌকে আপনার কাছে বন্ধক রাখতে। যখন টাকা ফেরৎ দেবে বৌ ফেরত পাবে।'

এই প্রস্তাবে গোষ্ঠী-সর্দার যদিও মনে মনে খুশি হলেন কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

'চুপ করো, নির্বোধ! লোকের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়।'

'আচ্ছা, তাহলে ও বৌকে এখানে ঝি-গিরি করতে পাঠাক।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে গোষ্ঠী-সর্দার বললেন :

'টাকাটা ফেরত পাওয়া ছাড়া আমি আর কিছু চাই না!' কথাটা বলে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন তিনি। দালালটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু দরজার সামনে থেকে তিনি আবার তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে, কিন্তু খবরদার—বুঝতে পারছ বোধ হয়—ঘুর্ণাক্ষরেও আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

দালালটি বলল, 'আজ্ঞে, তা আর বলতে হবে না। আমার যা কিছু সব তো আপনারই দয়ায় হুজুর। নিজের বাপ-মা যা করে না আপনি আমার জন্যে তাই করেছেন। অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারা সবাই বলবে যে আমি সব সময়েই আপনার গুণ গাই। আপনার জন্যে আমি মরতেও পারি হুজুর।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি এবং তোমার কাজকর্মেও আমার আস্থা আছে।'

কয়েক দিন কাটল। জেন সানের সঙ্গে দেখা করে দালালটি বলল যে, কর্জার টাকা এই মুহূর্তে শোধ করতে হবে। জেন সান মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

'আর কোন আশা নেই,' বলল সে।

দালালটি হেসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আশা নেই তা নয়। আশা আছে।'

'যদি সুদ চড়িয়ে দেওয়া হয়?' আশান্বিত হয়ে সে বলল।

'না, তাতে কাজ হবে না,' মুখের একটা হিংস্র ভঙ্গী করে দালালটি বলল, 'এভাবে টাকা ফেলে রাখতে আর উনি কিছুতেই রাজী নন।'

আবার হাসল দালালটি। কেন জানি দালালটির মনে হয়েছে যে যদি তার উদেশ্য সফল হয় তবে গোষ্ঠী-সর্দারের মনে তার সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণার সৃষ্টি হবে।

'আমি নিজে গিয়ে গোষ্ঠী-সর্দারের পা জড়িয়ে ধরব,' জেন সানের গলার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল।

'তাতে কোন ফল হবে না, চোখ বড় বড় করে দালালটি এমনভাবে কথা বলল যেন সে অবাক হয়ে গেছে, 'ওঁর মেজাজ তো আর তোমার অজানা নয়। যখন একটা কিছু ধরে বসেন, তার থেকে একচুল নড়েন না।' তোমাকে আমি একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। আমার মনে হয় ওতে কাজ হবে। কথাটা তা বলে একেবারে ধরে বোসো না, হঠাৎ মনে এল তাই বলছি।'

জেন সান প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, আতঙ্কগ্রস্ত গলায় সে চিৎকার করে বলল:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপায়টা কি তাই বলো!'

'ওঁর কাছে কিছু একটা বন্ধক রাখ...'

'বন্ধক রাখবার মত কিছুই নেই আমার।'

'আচ্ছা, তাহলে কাউকে জামিন রাখ।'

জেন সান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হ্যাঁ, জামিন রাখবার মত মানুষ তার বাড়ীতে আছে। কিন্তু...

'গোষ্ঠী-সর্দার কি ওকে নিতে রাজী হবেন?'

'বোকা গাধা! গোষ্ঠী-সর্দারের কাছে তুমি নিজে গিয়ে দেখ উনি কি বলেন।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

ঠিক হল, কয়েকদিন পরে দুজনে গোষ্ঠী-সর্দারের সঙ্গে দেখা করবে।

গাঁয়ে আর একটা গুজব শোনা গেল।

চুয়াঙ-সি গাঁ থেকে একটা ভিখিরী নাকি এসেছিল, সে জেন সানের বৌকে এক টুকরো কাগজ দিয়েছে। ও লিখতে পড়তে জানে, সেই কাগজটারই উলটো দিকে ও কি একটা সংবাদ লিখে দিয়েছে এবং সেটা নিয়ে ভিখিরীটা আবার চুয়াঙ-সি গাঁয়ে ফিরে গেছে।

'আর ভিখিরীটাকে ও দুটো রূপোর টাকার দিয়েছে।'

সিয়াঙ-গিন্নী যখন ব্যাপারটা জানলেন ভিখিরীটা তখন চলে গেছে।

খবর শুনে বুড়ো চ্যাঙ হতাশ হলেন। তাঁর কামনা এখনো অচরিতার্থ রয়েছে। তিনটে রূপোর টাকা তিনি ওকে দিয়েছেন, আর এই অবস্থায় ও যদি পালিয়ে যায় তো ভয়ানক ব্যাপার হবে। তাঁর আশা ছিল কিছুদিনের মধ্যে ও তাঁর প্রতি সদয় হবে আর ও কিনা তাঁর দেওয়া টাকা ভিখিরীটাকে দিয়ে দিল! কী স্পর্ধা! কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হল যে হাজার হোক ও তো মেয়েমানুষ। একবার তাঁর হাতের মুঠোয় এলে আর অবাধ্য হবে না। এখন একমাত্র কাজ ওকে পালাতে না দেওয়া।

স্ত্রী পালিয়ে যেতে পারে ভেবে জেন সানেরও দুর্ভাবনা হয়েছিল। কারণ তাহলে তার পক্ষে ধার শোধ করা অসম্ভব। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া তখন আর কোন উপায় থাকবে না। মনে মনে সে ভাবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যদি বুড়ো চ্যাঙের সঙ্গে দেখা করে তাহলে হয়ত কর্জার খতখানা ছিঁড়ে ফেলা হবে। আর তারপর যদি তার বৌ পালিয়েও যায় তো কোন ক্ষতি হবে না।

'হুজুর, কর্জা শোধ করা সম্পর্কে আমার নিবেদন এই...' আমতা আমতা করে সে বলতে শুরু করল। দালালটিও এসেছিল তার সঙ্গে, তার দিকে

একবার তাকাল সে ; দালালটি যেন বলছে, 'ঠিক আছে—কোন গোলমাল নেই।' মাছের মত জড়সড়ভাবে দুর্বল গলায় সে বলে চলল, 'হুজুরের যদি আজ্ঞা হয় তো আমার বৌকে এখানে পাঠিয়ে দেব।'

'চুপ কর হতভাগা!' বুড়ো চ্যাঙ চিৎকার করে উঠলেন, 'একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েলোককে আমি ঝি রাখব না। অসম্ভব, টাকা ফিরে চাই আমার। যাও—টাকা নিয়ে এস—যত তাড়াতাড়ি পার ততোই ভাল!'

জেন সানের মনে হল যেন তার সমস্ত শরীরটা বরফ-জলে চোবানো হয়েছে। দালালটি কি বলেনি যে গোষ্ঠী-সর্দার এতে রাজী হবেন? তার মনে একান্ত আশা ছিল যে জামিন উপস্থিত করতে পারলেই কর্জা মকুব হয়ে যাবে।

জেন সানের বৌ জেলীর মত কোমল, মাখনের মত নরম—সত্যি কথা কিন্তু বুড়ো চ্যাঙ এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবেননি যে একশো চল্লিশ টাকা তিনি ছেড়ে দেবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে মেয়েটিকে জামিন হিসাবে তিনি ততদিনের জন্যেই গ্রহণ করবেন যতদিন পর্যন্ত না জেন সান সমস্ত কর্জা শোধ করে ওকে খালাস করতে পারে। তাছাড়া মেয়েটি যদি তাঁর সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতে শুরু করে তো একটা বদনাম রটবার সম্ভাবনাও আছে।

ভাবতে ভাবতে তিনি দাঁত খুঁটতে লাগলেন।

দিশেহারা হয়ে জেন সান বলল, 'শতকরা তিন টাকা বেশী সুদ দিতে আমি রাজী আছি, শুধু আমাকে আরো একটা বছর সময় দিন।

'না!' গোষ্ঠী-সর্দার ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

'এখন আমি কি করি?' জেন সান দালালটিকে জিজ্ঞেস করল।

'আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি,' কথাটা বলে দালালটিও ভেতরের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ মিনিট পরে দালালটি ফিরে এল। জেন সানের তখনো মনে হচ্ছে যেন বরফ-জলে চোবানো হয়েছে তাকে।

'সব ঠিক করে এলাম,' বলল দালালটি।

'কি ঠিক হল?'

'চল বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

খুশিতে জেন সানের হাঁটু দুটো কাঁপছিল।

'আর কোন গোলমাল নেই তো?'

'শোন, কথা হয়েছে যে,' বৈদ্যুতিক পাখার মত চোখ মিট মিট করে আর অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে দালালটি উত্তর দিল। সে বুঝিয়ে বলল যে, জেন সানের বৌ যতদিন পর্যন্ত গোষ্ঠী-সর্দারের ঝি-গিরি করবে ততদিন আর কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু গোষ্ঠী-সর্দার চান যে মেয়েটি জেন সানের বাড়ীতেই থাকুক, যখন তিনি ওকে ডেকে পাঠাবেন তখন যেন জেন সান ওকে পাঠিয়ে দেয়। শেষকালে সে সাবধান করে বলল, 'খবরদার, এসব কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে, বুঝেছ?'

'আমি কাউকে একটি কথাও বলব না,' জেন সান তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেল, 'কিন্তু আমার কর্জা সম্পর্কে কি কথা হল?'

'আগামী বছরের ড্রাগন-নৌকো উৎসবের দিন পর্যন্ত কর্জার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল। সুদ সেই শতকরা চার টাকাই দিতে হবে। কিন্তু কেউ যেন এসব কথা একেবারে জানতে না পারে।'

সেই দিন সন্ধ্যায় গোষ্ঠী-সর্দার খবর পাঠালেন যে জেন সানের বৌকে তাঁর চাই। ও যাতে পালিয়ে না যায় সেজন্যে জেন সান যেন ওর সঙ্গে পুল পর্যন্ত আসে, পুলের কাছে 'বুড়ো চ্যাঙ' অপেক্ষা করবেন। আর কাউকে যেন না আসতে দেওয়া হয়, এমন কি দালালটিকেও নয়।

কমলালেবুর কোয়ার মত এক টুকরো চাঁদ উঠেছে পূব আকাশে।

বুড়ো চ্যাঙ হেঁটে চলেছেন পুলের দিকে, চোয়ালের উঁচু হাড় চকচক করছে চাঁদের আলোয়। চারদিকের দৃশ্য মনমুগ্ধকর মনে হল তাঁর কাছে। গাছের শুকনো ডালগুলো কাঁপছে, হেলে উঠেছে সামনের ধূসর পাহাড়ের সারি, কবরের ঢিবিগুলোকে মনে হচ্ছে যেন জেন সানের বৌয়ের স্তন।

হ্যাঁ, কিন্তু কবরের ঢিবিগুলো শক্ত···দূরে পশ্চিমদিকে তাকালেন তিনি, জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই।

মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন, জেন সানের বৌ এখনো তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ কিনা। 'জেন সান যদি শোনে তো আমাকে মেরে ফেলবে,' ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে এই কথা ও বলেছিল একদিন। সেদিন তিনি ওর গা ছুঁয়েছিলেন বলে ও আপত্তি জানায়নি, আর ওর সেই চমৎকার হাসি হাসতে হাসতে এমন ভাবও প্রকাশ করেছে যে জেন সানের ওপর ও বিরক্ত।

উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগলেন। থুথু দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে ঘষতে লাগলেন মুখের ওপর। দশ গজ এদিক আর দশ গজ ওদিক বেড়াতে বেড়াতে উচ্চকিত হয়ে উঠতে লাগলেন প্রতিটি শব্দে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, দুটি মূর্তি এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ ওই তো ও —ওকে তিনি ত্রিশ মাইল দূর থেকেও চিনতে পারবেন।

এত উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি যে তাঁর শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল। এবার তিনি···

পেছন ফিরে জেন সান বাড়ীর দিকে চলে গেল আর সেই মুহূর্তে তিনি ওর স্তন স্পর্শ করবার জন্যে ছুটে এলেন।

'এত তাড়া কিসের ?' খিল খিল করে হেসে উঠল ও।

'যুগ যুগান্ত ধরে আমি অপেক্ষা করেছি, আর পারছি না। চল এবার যাই...'

'একটু বসি।'

'লক্ষীটি!'

'একটুখানি বিশ্রাম করে নিই। কী সুন্দর সন্ধ্যা!' তাঁর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ও। মনে হল ও যেন হাঁপাচ্ছে।

যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখল ও। জেন সানকে আর দেখা যাচ্ছে না। চারদিক নিস্তব্ধ। ওর মধুর চোখ দুটির ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে। গোষ্ঠী-সর্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন ওকে। আর মাঝে মাঝে খামচি কাটছেন ওর রক্তাভ গালে, স্তনে, আর পায়ে। তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, হাঁটুতে জোর পাচ্ছেন না যেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল, ওকে সঙ্গে নিয়ে উড়তে শুরু করেন, যে বিছানাটি বাড়ীতে পাতা আছে এই মুহূর্তে হাজির হন সেখানে। শরীরটা এত ভারী মনে হচ্ছে...

'চল এবার যাই।'

চুপ করে রইল ও। ওর হাত ধরে টানলেন তিনি, তবুও ও কোন উত্তর দিল না।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ হল। তাঁর মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরেছে ও। রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে, শরীর টলছে।

'তোমার মতলব কি?'

'মতলব এই যে আমি চুয়াঙ-সিতে যাচ্ছি।'

ও প্রায় ছুটতে শুরু করেছিল এমন সময় তিনি ওর হাত চেপে ধরলেন।

'দূর হও—আপদ! পশু! জানোয়ার!' তাঁর মাথায় বাড়ি মারতে

মারতে ও গালাগালি দিতে লাগল, 'এবার তুমি আমার ফাঁদে পড়েছ ! পশু ! জানোয়ার !'

এত জোরে তাঁকে একটা ধাক্কা দিল ও যে তিনি কাদার ভেতর পড়ে গেলেন। তারপর ছুটতে শুরু করল ও। ছুটল পুল পেরিয়ে, মাঠ-ঘাট-নদী-পর্বত ডিঙিয়ে উত্তর দিকে চুয়াঙ-সির পথে। বড় রাস্তাগুলো এড়িয়ে গেল ও।

'জেন সানের বৌ পালিয়েছে !'

ওকে ধরে আনবার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ওকে আর পাওয়া যায়নি। এমন কি চুয়াঙ-সি গাঁয়েও ওর কিংবা ওর প্রণয়ীর কোন সন্ধান নেই। চুয়াঙ-সির লোকেরা বলেছে—খুব ভোরে ও হাজির হয়েছিল। ওর প্রণয়ী অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। সামান্য গোছগাছ করে ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ওরা তারপর সেখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

লাও চান

বহুক্ষণ আগেই ট্রেনটা ছেড়েছিল। এখন রেলের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের ধাতব আওয়াজ উঠছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাত্রির প্রহর গুণছে যাত্রীরা: সাতটা, আটটা, নটা, দশটা—দশটার মধ্যে যদি ট্রেনটা পৌঁছে যায় তো মাঝরাত বরাবর ওরা বাড়ী পৌঁছবে। হয়ত খুব দেরী নাও হতে পারে—তা যদি হয় তো ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়বে। আজ নতুন বছরের দিন বাড়ী ফিরে যাবার তাড়া ওদের সবার। তাকের ওপর স্তূপাকৃত বাক্স, ফলের চুবড়ি ও খেলনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'বাবা' 'বাবা' বলে ছেলেমেয়েদের চিৎকার যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ওরা একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে, কিন্তু এমন যাত্রীও বহু আছে যারা খুব ভালভাবেই জানে যে আগামীকাল ভোর হবার আগে বাড়ী পৌঁছতে পারবে না। সহযাত্রীদের হাবভাব লক্ষ্য করতে করতে ওরা আবিষ্কার করেছে যে এমন একটি লোকও এখানে নেই যার সঙ্গে ওদের সুদূরতম পরিচয়ও আছে, আবিষ্কার করে ওরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। ওরা যখন বাড়ী পৌঁছবে, তখন নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে! আর একদল যাত্রী আছে যারা ট্রেনের এই শম্বুকগতি দেখে অভিসম্পাত দিচ্ছে মনে মনে। যদিও কামরার ভেতরেই ওদের শারীরিক উপস্থিতি, এখানেই ওরা ধূমপান করছে, চায়ে চুমুক দিচ্ছে, হাই তুলছে আর কাঁচের জানলার ওপর নাক চেপে তাকিয়ে আছে বাইরের অতল অন্ধকারের দিকে—কিন্তু মনে মনে ইতিমধ্যেই বহুবার ওরা

শেষ ট্রেন

বাড়ী পৌঁছে আবার ফিরে এসেছে। চোখের জল গোপন করবার জন্যে এবার ওরা মাথা নীচু করে হাই তুলছে বারবার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় খুব বেশী যাত্রী নেই। মোটা চ্যাঙ আর রোগা চিয়াও একই কামরায় মুখোমুখি বসে আছেন। অন্য কোথাও যাবার দরকার হলে তাঁরা নিজেদের আসনে কম্বল বিছিয়ে রেখে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য —উৎপাতকারীদের জানিয়ে দেওয়া যে এখানে তাদের সহ্য করা হবে না। ট্রেন ছাড়বার পর তাঁরা দেখলেন যে যাত্রী প্রায় নেই বললেই চলে, দেখে কেন জানি তাঁদের মনে দুঃখ হল—বোধ হয় এই ভেবে যে এই বড়দিন নতুন বছরের সময়ে তাঁদের কিনা ট্রেনে ভ্রমণ করতে হচ্ছে। এই দুইজন যাত্রীর ভেতর আরো অনেক মিল আছে—দুজনেই ফ্রী পাস-এ যাতায়াত করছেন ; দুজনেই গতকালের আগে পর্যন্ত পাস যোগাড় করতে পারেননি ; সুতরাং দুজনেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাস দেবার ক্ষমতা যার আছে, পাস না দিয়ে আসল যাত্রীদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আটকে রাখবার অধিকারটুকুও তার আছে। এই ব্যবহারে দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—কারণ, আগেকার যুগে বন্ধুত্বে এত ভেজাল থাকত না। এই সব কথা ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে দুজনেই সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন এই তথাকথিত বন্ধুদের ওপর যারা তাঁদের নতুন বছরের দিন বাড়ী পৌঁছতে বাধা দিয়েছে।

গায়ের শেয়াল-লোমের কোটটা খুলে জোড়াসন হয়ে বসলেন চ্যাঙ। বসেই বুঝতে পারলেন এই আরামজনক ভঙ্গীতে বসবার পক্ষে আসনটা যথেষ্ট চওড়া নয়। ইতিমধ্যে কামরার ভেতর উত্তাপ বেড়ে গেছে, এবং ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে তার কপাল থেকে। 'বয়, তোয়ালে!' বলে তিনি একটা হাঁক দিলেন, তারপর চিয়াওর দিকে ফিরে বললেন, 'আজকাল কেন যে এত গরম হয় বুঝতে পারি না।'

একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'বিমানে যাতায়াত করলে এত গরম হয় না।'

চিয়াও বহুক্ষণ আগেই কোট খুলে ফেলেছিলেন। এখন তাঁর গায়ে শাদা ভেড়ার লোমের আস্তর দেওয়া একটা ঢিলে জামা, তার ওপর চাপিয়েছেন কালো সাটিনের তৈরী একটা জ্যাকেট। তাঁর ভেতর ক্লান্তির কোন রকম চিহ্ন ছিল না। তিনি বললেন, 'আজকাল বিমানের ফ্রী প্যাসও পাওয়া যায়। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।' কথাটা বলে টেনে টেনে অস্পষ্টভাবে হাসলেন তিনি।

চ্যাঙ বললেন, 'বিমান যাত্রার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।', কথা বলতে বলতে যদিও তিনি পা দুটো মুড়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু অনেক কষ্টে বসতে পারলেন সেভাবে। 'বয়, তোয়ালে!'

'বয়'টির বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, ঘাড়টা কাঠির মত সরু—এত সরু যে মনে হয় অত্যন্ত সহজে ওর মাথাটা মট করে ভেঙে এনে আবার বসিয়ে দেওয়া যায়। প্রায় সব সময়েই ওকে দেখা যাবে উত্তপ্ত ধূমায়িত তোয়ালে হাতে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। কাজ করতে ও সব সময়েই উদগ্রীব। কিন্তু একথাও ঠিক, যে ভাবে কর্তৃপক্ষ এমন একটি উৎসবের দিনেও ওকে কাজে আসতে বাধ্য করেছে তা সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কামরার সামনের দিকে ক্ষুদে সুইকে দেখতে পেয়ে নিজের ক্ষোভটা ও প্রকাশ করে ফেলল, 'আচ্ছা দেখ তো ভাই, সাতাশ আর আটাশ তারিখে আমি ডিউটি করেছি, সুতরাং আজ আমার ছুটি পাবার কথা। আর শেষ সময়ে কিনা লিউমশাই বললেন—শোন, নতুন বছরের দিন তোমাকে বেরুতে হবে। ঠিক এই কথাই উনি বললেন। আচ্ছা, ষাটজন লোক তো এই লাইনে কাজ করে আর বেছে বেছে কিনা আমাকেই ধরা হল। অবশ্য, নতুন বছরের জন্যে

আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু অবিচারটা দেখ!' কথাটা বলে ও একবার বকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল মোটা চ্যাঙের দিকে। কিন্তু এক পাও নড়ল না সেখান থেকে। নিংড়ে-রাখা তোয়ালেগুলো খুলল একে একে, একটা তোয়ালে ক্ষুদে সুইর হাতে দিয়ে বলল, 'দাও না একটা,' তারপর আবার পুরনো নালিশে ফিরে গেল, 'লিউমশাইকে আমি বলে দিয়েছি যে নতুন বছরের জন্যে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু ওঁরও বোঝা দরকার যে ওই দিন আমার ছুটি থাকার কথা। ওঁকে বললাম যে সারা বছর আমি কাজ করেছি সুতরাং একটা দিন আমার ছুটি পাওয়া উচিত।' কথাটা বলে ও ঢোক গিলল। জলের ভেতর হঠাৎ একটা বোতল উলটিয়ে ধরলে যেমন বুদ্‌বুদ্ ওঠে তেমনিভাবে ভেসে উঠল ওর কণ্ঠমণিটা। ওর গলা এমন ধরে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। 'আমার আর ভাল লাগে না—আজকাল চারদিকেই শুধু গোলমাল।'

ক্ষুদে সুইয়ের ফ্যাকাশে হলদে মুখের ওপর হাসির মত একটা কিছু ফুটে উঠল। সহানুভূতি দেখাবার জন্যে মাথাটা একটু কাত করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু কেন জানি তা পারল না। তারও নিজস্ব কতগুলো অসুবিধা আছে। এ লাইনে সবাই তাকে চেনে—এমন কি, স্টেশনমাস্টার ও মিস্ত্রীরা পর্যন্ত। সবাই তার বন্ধু। তার ফ্যাকাশে হলদে মুখটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটের মত—যানবাহান বিভাগের মন্ত্রী নিজেও এই কথার যাথার্থ্য অস্বীকার করতে সাহস পাবেন না। আর সবাই জানে যে লাইনে বেরুলে তার পেঁটরার ভেতর একশো কি দুশো পাউণ্ড আফিম থাকে আর সবাই স্বীকার করে যে একাজ করবার অধিকার তার আছে। আর ক্ষুদে সুই নিজেও খুব সাবধানী। কারও পেছনে লাগে না বা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না পাছে লোকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়।

লোকের দুঃখ সে খুব ভালভাবেই বোঝে এবং প্রত্যেককেই সে সহানুভূতি দেখাতে চায়। কারও প্রতি দুর্ব্যবহার করে না বলেই কাউকে ভয়ও করে না। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার টিকেটের ওপর—অর্থাৎ তার মুখের ওপর।

'আমাদের সবার ওপরেই এত কাজের চাপ,' এবার সে নালিশ জানাতে শুরু করল। তার ধারণা, তার নিজের অসুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারলেই 'বয়'টির উপকার করা হবে। সে বলল যে সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবার সে বেরিয়েছে, এর চেয়ে বাড়ীতে আরামে বসে থাকা ঢের ভাল। কিন্তু উপায় ছিল না, ঠিক পরের দিনেই তার সঙ্গে একটি রক্তচোষা মেয়ের দেখা হবার কথা, দেখা হলে মেয়েটি তার সর্বস্ব নিয়ে নিত। কালো কালো দাঁত বার করে হাসল সে তারপর গাল দুটো ফুলিয়ে থুথু ফেলল মেঝের ওপর।

কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া হতে দেরী হল না। 'বয়'টিকে দেখে মনে হল যেন নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে ও এখন উপভোগসূচক ঘাড় নাড়ছে। হাতের তোয়ালেগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আবার জলে ডুবোবার জন্যে ও নিজের কেবিনে ফিরল। বেরিয়ে এসে একটিও কথা না বলে স্নুদে স্নুইর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ও। একবারও ফিরে তাকাল না, এমন ক্লান্ত একটা ভঙ্গীতে চোখ বুজে রইল যেন ও দেখাতে চাইছে যে স্নুদে স্নুইর সান্ত্বনা সত্ত্বেও ও নিজের ক্ষোভ ভোলেনি। ট্রেনের দুলুনির সুযোগ নিয়ে ও ঝুঁকে দাঁড়াল কাউ নামে একজন যাত্রীর দিকে। 'তোয়ালে চাই, হুজুর? বছরের এই সময়ে ট্রেনে যাতায়াত করা যে কী কষ্ট!' নিজের মনের ক্ষোভকে নতুন শ্রোতার কাছে বলবার ইচ্ছে হয়েছে ওর, কিন্তু কাউকে ও খুব ভাল করে চেনে না, তাই যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে কথা শুরু করল।

কাউর পোষাকের রীতিমত জাঁকজমক আছে। পরনে আনকোরা নতুন কালো সাটিনের সঙ্গে ফারের কলার লাগানো ঘন সার্জের ওভারকোট, মাথায় তরমুজের আকারের টুপি। টুপি বা কোট, কোনটাই তিনি খোলেননি। টান হয়ে বসে আছেন নিজের আসনে যেন সভাপতি অপেক্ষা করছেন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শুরু করবার মুহূর্তটির জন্যে। তোয়ালে নেবার জন্যে তিনি হাতটা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করে দিলেন এবং কনুইয়ে যেন এতটুকু ভাঁজ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাতটা একটুও না বেঁকিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ধরলেন মুখের সামনে। তারপর একটা দারুণ অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে তুলে সাড়ম্বরে মুখ মুছলেন তিনি। তোয়ালের ঘূর্ণমান আবর্ত থেকে তাঁর মুখটা যখন বেরিয়ে এল, তখন তা চকচক করছে এবং একটা নতুন সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেই মুখে। 'বয়'-এর দিকে তাকিয়ে তিনি একবার শুধু মাথা নাড়লেন কিন্তু কেন যে তিনি নতুন বছরের দিন ট্রেনে ভ্রমণ করছেন সে সম্পর্কে কোন কথা বললেন না।

'ওয়েটার হওয়ার মত খারাপ কাজ আর নেই,' 'বয়'টি বলল, কাউকে ও এত সহজে ছাড়বে না। ও জানে যে, ক্ষুদে স্যুইর কাছে ও যে সব কথা বলছে ঠিক সেই কথাগুলোই আবার এখানে বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঠিকমত ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে এখানে, যেন কথার গাম্ভীর্য ও সততা বজায় থাকে। 'নতুন বছরের দিন লোকের বিশ্রাম করা উচিত', ও বলে চলল, 'কিন্তু আমাদের বিশ্রাম নেই। আমরা কিছুই করতে পারি না।' তারপর ব্যবহৃত তোয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর একটা নেবেন, হুজুর?'

কাউ মাথা নাড়লেন। স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি 'বয়'-এর দুর্দশা দেখে অভিভূত হয়েছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা

করা ঠিক পছন্দ করছেন না। এ লাইনের সকলেই জানে যে তিনি ম্যানেজারের বন্ধু এবং যখন খুশি বিনা ভাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করবার সুবিধাটুকু তিনি উপভোগ করতে পারেন। এ জন্যে তাঁর পরিচয়পত্রটুকুই যথেষ্ট। একজন ওয়েটারের সঙ্গে অসংবদ্ধ আলাপ-আলোচনা না করলেও চলে।

এদিকে ওয়েটারটি কিন্তু বুঝতে পারছিল না, কাউ কেন মাথা নাড়ছেন। কিন্তু ও আর কি করতে পারে, ও খুব ভাল করেই জানে যে এই লোকটি ম্যানেজারের বন্ধু। কামরাটা আবার দুলতে আরম্ভ করল এবং সেই দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে ও ছিটকে পড়ল যাতায়াতের পথটার দিকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর একটা তোয়ালে খুলল এবং তোয়ালেটার দু কোণে আলতোভাবে ধরে নিয়ে গেল চ্যাঙের কাছে। 'আপনি একটা নেবেন হুজুর?' তিনি হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিলেন এবং হাতের পুরু তালু দিয়ে চেপে ধরলেন তোয়ালের মাঝখানের উষ্ণতম জায়গাটাকে, এবং এমনভাবে মুখের ওপর ঘষতে লাগলেন যেন আয়না পরিষ্কার করছেন। তারপর তিনি আর একটা তোয়ালে নিয়ে চিয়াওকে দিলেন। চিয়াও কোন রকম উৎসাহ দেখালেন না, তোয়ালেটা নিয়ে আলতোভাবে নাকের গর্ত আর হাতের নখ পরিষ্কার করতে লাগলেন। তোয়ালেটা ফিরিয়ে দেবার সময় দেখা গেল আগাগোড়া তেল ও কালিতে নোংরা হয়ে গেছে।

'এক্ষুনি ইন্‌স্‌পেক্টর আসবে', এই বলে ও কথা আরম্ভ করল। ও খুব ভাল করেই জানে যে নিজের দুঃখদুর্দশার ফিরিস্তি দিয়ে কথা শুরু করার মত খারাপ কৌশল আর নেই। পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভেতরে ঢুকবার মতলব ওর। 'ইন্‌স্‌পেক্টর চলে গেলে আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করতে চাইবেন। তখন যদি আপনাদের কুশান দরকার হয়

তো একবারটি শুধু বলবেন আমাকে।' একটু থেমে আবার ও বলল, 'ট্রেনে আজ ভীড় নেই। সুতরাং ঘুমোতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না আপনাদের। আজকের মত একটা দিন হুজুরদের যে ট্রেনে কাটাতে হচ্ছে তা খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের মত ওয়েটারদের পক্ষে—' ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ও বুঝতে পেরেছে যে বড্ড বেশী কথা বলছে ও, কোন্ দিকে হাওয়া বইছে সেটা আগেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। চ্যাঙের হাতে আর একটা তোয়ালে দিল ও। চ্যাঙ দেখলেন; প্রসাধন-পর্বটা বড় বেশী সময় নিচ্ছে কিন্তু তিনি ভুলে যাননি যে এখনো তাঁর সদ্য-কর্তিত চুল মোছা হয়নি। মাথার খুলির ওপর তোয়ালে ঘষাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, অন্য কাজের তুলনায় বেশ শক্তই বলতে হবে—কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চুল-মোছা পর্বটা শেষ করে তিনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন। ওদিকে চিয়াও দ্বিতীয়বার আর তোয়ালে নেননি, নিজের সদ্য-পরিষ্কৃত আঙুলের নখ দিয়ে মনের আনন্দে দাঁত খুঁটে চলেছেন তিনি।

'আগুনের ব্যবস্থাটা কি ঠিক নেই?' তোয়ালেটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চ্যাঙ বললেন।

ও উত্তর দিল, 'আমার কথা যদি শোনেন তো জানলা খুলবেন না। নটা থেকে দশটা পর্যন্ত ভীষণ ঠাণ্ডা লাগবে। এ লাইনে কর্তাদের সমস্ত বন্দোবস্তই গোলমেলে।' এত বড় সুযোগ আর আসবে না, তাড়াতাড়ি ও আসল কথাটা পেড়ে বসল, 'এখানে সারা বছরই কাজ করতে হয়, এমন কি নতুন বছরের দিনেও ছুটি নেই। আমাদের কোন কথায় কেউ কান দেয় না।'

এর পর আর কথা এগোল না, কারণ ইতিমধ্যে ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাক্স-পেঁটরা নিয়ে একদল যাত্রী নেমেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে এবং দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে স্টেশনের বাইরে যাবার গেটের দিকে। কারও কারও একটু ইতস্তত ভাব যেন ভেবে দেখছে ট্রেনে কোন কিছু ফেলে এসেছে কিনা। কামরার ভেতর যারা রয়ে গেছে তারা ঈর্ষা ও উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে কাঁচের জানলার ওপর নাক চেপে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কেউ নামেনি কিন্তু প্রায় আধ ডজন সৈন্য উঠেছে কামরাটার ভেতর। মেঝের ওপর ভারী বুটের বাজখাঁই আওয়াজ, চামড়ার বেল্টের ঝলসানি। ওদের সঙ্গে রয়েছে নানা রকম বাজীতে ঠাসা চারটে প্রকাণ্ড বড় বড় বাক্স। বাক্সগুলো লাল টকটকে কাগজে মোড়া, মোড়কের ওপর সোনালী কাগজের আঁকিবুঁকি। সেগুলো এত বড় যে কোথায় রাখা হবে তাই ঠিক করতে পারছে না কেউ। জুতোর মশমশানি, ত্রস্ত আনাগোনা, চড়া গলায় কথাবার্তা, তবুও বহুক্ষণ পর্যন্ত বাক্স চারটে একটা সমস্যা হয়ে রইল। অবশেষে একজন লোক—দেখে মনে হয় ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার —বলল যে ওগুলোকে মেঝের ওপরেই রাখা হোক। প্লেটুন কমাণ্ডার সেই কথা পুনরাবৃত্তি করতেই নীচু হয়ে আদেশ পালন করল লোকগুলো, পরে টান হয়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি ঠুকল একবার। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে ডিস্‌মিস্ করে দিলেন ওদের। ভারী বুটের বাজখাঁই আওয়াজ উঠল আর একবার, ধূসর টুপি, ধূসর সাজপোষাক, ধূসর ফেল্টের একটা আবর্ত পাক খেয়ে গেল।

কার যেন গলা শোনা গেল, 'চট্‌পট্ !' অনুগতভাবে বেরিয়ে গেল ওরা। ট্রেনের হুইস্‌ল্ বেজে উঠল, শব্দটা কেমন যেন চাপা। তারপর আলো-ছায়ার চাঞ্চল্য, চাকার ঘড় ঘড় আওয়াজ, স্টেশন ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ট্রেনটা।

কামরার এদিক ওদিক পায়চারি করছে ওয়েটার, যেন কিছু একটা মতলব আছে ওর। দু-একবার আড়চোখে তাকিয়েছে সৈন্য দুজনের দিকে, যাতায়াতের পথ আটকিয়ে মেঝের ওপর উদ্ধত ভঙ্গীতে বসানো বাজীর বাক্সগুলোর দিকেও চোখ পড়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু কিছু বলবার সাহস নেই ওর। ক্ষুদে সুইর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এল ও। ছাড়া ছাড়া অসংবদ্ধ আলাপ—সেই একই বিষয় এবং একই ভাষা, কিন্তু এবার নিজের দুঃখদুর্দশার বিবরণ আর একটু সন্তোষজনকভাবে যোগ করে দিতে পেরেছে ও। ক্ষুদে সুই আবার তার মেয়ে-বন্ধুদের কথা বলেছে। কিন্তু ও সেই বাজীর বাক্সগুলোর অস্তিত্ব ভুলতে পারছিল না। ক্ষুদে সুইর কাছ থেকে উঠে এসে ও কামরার এদিক ওদিক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে পায়চারি করতে লাগল। কোণের ছোট টেবিলের ওপর পিস্তলটা রেখে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার সাহস অবশ্য প্লেটুন কমাণ্ডারের হয়নি, কিন্তু টুপি খুলে রেখে সেও প্রবলভাবে মাথা চুলকোতে শুরু করেছে। সিনিয়র অফিসার যেন জেগে না ওঠে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে জুনিয়র অফিসারটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গদগদভাবে হাসল ও। 'কি যেন বলছিলাম আমি?' আমতা আমতা করে এমনভাবে ও কথা বলল যেন কিছু একটা দোষ করে ফেলেছে, 'ও হ্যাঁ, বলছিলাম কি, ওই বাজীর বাক্সগুলো তাকের ওপর রেখে দিলে বোধ হয় ভাল হত।'

'কেন?' মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাঁকা দৃষ্টিতে, ওর দিকে তাকিয়ে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

'মানে, লোকে হয়ত অসাবধানে ওর ওপর পা দিয়ে ফেলবে; সেই জন্যেই আর কি।' উত্তর দেবার সময় মাথাটা কচ্ছপের মত সেঁদিয়ে দিল দুই কাঁধের ভেতর।

'বটে! কার এত সাহস শুনি? কেন যাবে সে ওই বাক্সগুলোর কাছে?' গোল গোল ভাঁটার মত চোখ দুটো খোঁচ করে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!' বিনীত হাসিতে ওয়েটার গোল হয়ে উঠল, মুখটা দেখাল আরো ছোট—যেন প্রকাণ্ড একটা অদৃশ্য পাথর ওকে চেপে ধরেছে, 'ওখানে থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

'ফের যদি গোলমাল করতে চাও তো তার আগে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক এস।' অফিসারটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। সিনিয়র অফিসারের দুর্ব্যবহারে আগে থেকেই তার মেজাজটা ভাল ছিল না, এই অবস্থায় যে কোন ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে ফেলবার জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু এই ধরনের বোঝাপড়া করবার কোন ইচ্ছা ওয়েটারের ছিল না। সেখান থেকে দ্রুত অদৃশ্য হল ও। চ্যাঙের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'এক্ষুনি ইন্‌স্‌পেক্টর আসবে, হুজুর।'

ইতিমধ্যে চ্যাঙ ও চিয়াওর মধ্যে অকপট বন্ধুতা হয়েছে। টিকেট দেখা শুরু হল। দু-জন ইন্‌স্‌পেক্টর, পেছনে তিনজন লোক। ইন্‌স্‌পেক্টরদের প্রথম জনের মাথায় সোনালী ফিতে লাগানো টুপি, ফরসা গায়ের রঙ, উঁচনো নাক। দ্বিতীয়জনের মাথায়ও একই ধরনের সোনালী ফিতে লাগানো টুপি, কিন্তু লোকটি বেঁটে, গায়ের রঙ ময়লা, মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে। প্রথমজনের রুক্ষ ব্যবহারে যে সব যাত্রী চটে ওঠে, তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করবার একটা ক্ষমতা কি করে যেন আয়ত্ত করেছে দ্বিতীয়জন। যতক্ষণ ওরা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় থেকেছে ততক্ষণ দুজনের মুখেই একটা

থমথমে ও ভারিক্কী ভাব ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এর পর যখন ওরা প্রথম শ্রেণীতে যাবে তখন দুজনেই হাসবে উদারভাবে। তৃতীয় জন তিয়েন্‌ৎসিন্‌-এর লোক, আকারে দৈত্যকায়, হাতে পিস্তল, কোমরের বেল্‌টে থাকে থাকে সাজানো টোটা। চতুর্থজনও দৈত্যকায়, শানটুঙ-এর লোক, তার কাছেও টোটা-ভর্তি বেল্‌ট ও পিস্তল, কিন্তু এছাড়াও একটা লম্বা তরোয়াল আছে তার কাছে। পঞ্চমজন সেই ওয়েটার। মাথাটা নিয়ে হয়েছে ওর যন্ত্রণা—ঘাড়ের ওপর মাথাটা সব সময়েই নড়বড় করছে এবং মাথাটা ঠিক জায়গায় রাখবার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হচ্ছে ওকে।

ক্ষুদে সুইর সামনে এসে দলটি মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। ওরা সকলেই ক্ষুদে সুইকে চেনে, তার ফ্যাকাশে হলদে মুখ আর কালো দাঁতের সঙ্গে সবাই পরিচিত। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেমন হাসে তেমনি হাসি ফুটে উঠল ক্ষুদে সুইর মুখে। কেমন একটা বিশ্রী মুহূর্ত। প্রথম ইন্‌স্পেক্টরটি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অন্য দিকে। মুখের ভাবটা এমন যেন সে গভীর চিন্তামগ্ন, কিন্তু হাতের পাঞ্চটা অনবরত সে ঠুকে চলেছে উরুর ওপর। দ্বিতীয়জন ক্ষুদে সুইর দিকে তাকিয়ে পরিচয়-সূচক মাথা নাড়ল। তিয়েন্‌ৎসিনের দৈত্যকায়টি হাসল তার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই সুইচ টিপে বন্ধ করবার মত মিলিয়ে গেল সেই হাসিটুকু। শানটুঙের দৈত্যকায়টি এক হাত ঠেকাল টুপির মাথায়, তার চোখের মধুর দৃষ্টিটুকু যেন বলতে চাইছে, 'আজ একটা লম্বা গল্প বলব। কিন্তু একটু সবুর কর, এই সব বাজে হাঙ্গামা আগে চুকুক।' ওয়েটারের মনে হল যে এই টিকেট দেখার ব্যাপারটা বড় বেশীক্ষণ ধরে চলছে। দলটি আবার চলা শুরু করতেই সে বলল, 'একটু বোসো ভাই, এক্ষুনি আসছি।

আজ খুব বেশী যাত্রী নেই, টিকেট দেখা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি আসব।' ক্ষুদে সুই আবার একা পড়ে রইল, একটা ছায়া সরে গেল তার মুখ থেকে, আবার বসে পড়ল সে।

একটু পরেই ওয়েটার দলটির নাগাল ধরল, কিন্তু দলের সঙ্গে সঙ্গে গেল না, কাউ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাউমশাই, হুজুর।' কিন্তু দলের নেতা একটু বিরক্ত হল ওর এই কোঁপরদালালিতে, এবং কাউকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'ম্যানেজারসাহেব আজকাল কেমন আছেন? ট্রেনে লম্বা পাড়ি দেবার পক্ষে বছরের এই সময়টা কিন্তু একটু দেরীই হয়ে যায় বলতে হবে।' কাউ সামান্য একটু হাসলেন—তাঁর মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এই ঘটনায় তা আরো বেড়ে গেছে যেন। বিড়বিড় করে কি তিনি বললেন তা শোনা গেল না, মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানালেন, তারপর হাসলেন আর একবার। প্রহরী দুজন নিশ্চলভাবে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই সমস্ত আলাপ আলোচনায় তারা যোগ দিতে পারে না, জীবনের ক্ষেত্রে তাদের স্থান অনেক নীচুতে, সকলের সঙ্গে কথা বলবার অধিকার তাদের নেই—নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে তারা শুধু বুক ফুলিয়ে থাকে আর ঋজু টান ভঙ্গীতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে এই সুযোগে চ্যাঙ ও চিয়াওকে টিকেট দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হতে খবর দিয়েছে ওয়েটার। ওর হাতেই তারা টিকেট দুটো দিল। দেখে ও আশ্চর্য হল যে টিকেট দুটো ফ্রী-পাস এবং ভদ্রলোক দুজনের প্রতি ওর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল যেন। চ্যাঙের পাসটা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিল ও; কিন্তু চিয়াওর বেলা তা করল না, সাহসে ভর করে তাঁর পাসটা হাতে রাখল দেখবার জন্যে। সেই পাসের উপর স্পষ্টভাবেই একটি স্ত্রীলোকের নাম লেখা, কিন্তু চিয়াও যে পুরুষ

তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইন্‌স্‌পেক্টর দুজন একটু দূরে সরে গিয়ে ফিস ফিস করে কানাকানি করল কিছুক্ষণ। একটু পরে তাদের মাথা নাড়ার ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল, দুজনে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে যে, নতুন বছরের দিনে স্ত্রীলোকের পাসে পুরুষ ভ্রমণ করলেও ক্ষতি নেই। মাফ চাইবার ভঙ্গীতে ওয়েটার চিয়াওর টিকেট দু হাতে ফিরিয়ে দিল।

এদিকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নাক ডাকাচ্ছে। ইন্‌স্পেক্টরদের ঢুকতে দেখেই প্লেটুন কমাণ্ডার আসনের ওপর পা তুলে এমন একটা ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছে যেন মনে হয় কোন রকম গোলমাল সে এতটুকু বরদাস্ত করবে না। পথের মাঝখানে রাখা বাজীর বাক্‌সগুলো নজরে পড়ল ইন্‌স্‌পেক্টরদের, এতগুলো চমৎকার বাজী একসঙ্গে দেখে মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়ল শানটুঙের লোকটি। কামরাটা পার হয়ে হয়ে দরজার সামনে পৌঁছবার পর প্রথম ইন্‌স্‌পেক্টরটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে বলল, 'ওদের বলে দিও যেন ওই বাজীর বাক্‌সগুলো তাকের ওপর উঠিয়ে রাখে।' ওয়েটারের সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে দ্বিতীয় ইন্‌স্‌পেক্টর তাড়াতাড়ি বলল, 'তার চেয়ে ভাল হয় তুমি নিজেই যদি ওগুলো উঠিয়ে রাখ।' কাঠির মত সরু ঘাড়টা পেণ্ডুলামের মত দোলাতে দোলাতে ওয়েটার একটিও কথা না বলে সায় দিল, কিন্তু মনে মনে ও ভাবছে, 'কথাটা নিজেদের মুখে বলবার সাহস নেই—কেমন কিনা—আর আমারও বয়ে গেছে, আমি শুধু ওই ঘাড়ই নাড়ব—ঘাড় নাড়া মানেই করে ফেলা নয়, ও দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ।' খাঁটি কথাটা বুঝে নিয়েছে ও — বাজীর বাক্‌স-গুলো কিছুতেই নাড়ানো চলবে না।

ক্ষুদে সুইর কাছে ফিরে গিয়ে ও আশ্চর্য হয়ে দেখল, লোকটি কেমন নেতিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পারল ওর এক গ্লাশ জল দরকার। কোন কথা না বলে কেটলিটা নিয়ে এল ও। ক্ষুদে সুই

তার পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে নিল—জিনিসটা যে কি তা ভাল করে ও দেখতে পেল না, কিন্তু ওর কেমন যেন সন্দেহ হল যে সেটা আফিমের বড়ি। জিনিসটা বাঁ হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল সে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে তার, মুখটা কাগজের মত ফ্যাকাশে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মুখের ওপর, অস্পষ্ট বাষ্পের মত কি যেন বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, গরমে চাপানো পেঁয়াজের মত চকচক করছে মুখটা।

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল সে। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে অস্থিরভাবে, চোখ দুটো বোজা। এক চুমুক জল নিল মুখের ভেতর, গাল দুটো ফুলে উঠল গোল হয়ে। কিছুক্ষণ পর সে চোখ খুলল, হলদে ফ্যাকাশে মুখটা ভরে গেল অকুণ্ঠ হাসিতে।

'ভাতের চেয়েও এটির দরকার আগে, এটি না হলে একবেলাও চলে না বাবা।' ক্ষুদে সুই বিড়বিড় করে বলল।

'ঠিক কথা। কিছুতেই চলে না', ওয়েটার সায় দিল।

বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই। ট্রেনের চাকাগুলো একসঙ্গে গান গেয়ে উঠেছে। ওপরে তারাভরা স্থির আকাশ। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে পাহাড়, গাছ, গ্রাম, শ্মশান। অন্ধকারে সমানে মাথা কুটছে ইঞ্জিনটা। ধোঁয়া, কালি আর স্ফুলিঙ্গ ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পর মুহূর্তেই। অবিশ্রান্ত, একটানা ছুটে চলেছে ট্রেনটা—অন্ধকারের পর অন্ধকার, এক ফালির পর আর এক ফালি। একটা সরু জাঙালের পাশে খানিকটা জায়গায় বরফ পড়েছিল—জায়গাটা এক মুহূর্তের জন্যে জলে উঠেই আবার নিভে গেল। তারপর আর দেখা গেল না। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী যাই। সব কটা আলো জ্বালানো, উত্তাপের ঢেউ

উঠছে। যাত্রীরা মুমূর্ষু, ঘুমোবার ইচ্ছা নেই কারও। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই। পুরনো বছরের বিদায়-অনুষ্ঠান, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পানীয়, পূর্বপুরুষদের অর্ঘ-প্রদান, তুলট কাগজের লিখন, আগুনে বোমা, পুলিপিঠে, মিঠাই, ভোজ আর মদ—এগুলো হঠাৎ অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে ওদের কাছে, আচ্ছন্ন করেছে ওদের দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ, ঘ্রাণ। মাঝে মাঝে হয়ত একটু হাসির আভাস ফুটে ওঠে ঠোঁটের ওপর—কিন্তু পর মুহূর্তে যেই মনে পড়ে যে ওদের শারীরিক উপস্থিতিটা এখনো এই ট্রেনের ভেতরেই, তক্ষুনি মিলিয়ে যায় সেই হাসিটুকু। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। তারাভরা নিথর আকাশ। বরফ-ঢাকা জমির ওঠা-নামা। নিঃশব্দ, নিশ্চল, নির্নিরীক্ষ্য। পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে অন্ধকার, এর যেন শেষ নেই। এক অনন্ত পথের গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে আলোকোজ্জল ট্রেনটা। হিংস্র অন্ধকার উদ্যত হয়ে উঠেছে চারপাশে। ট্রেনটা প্রবল চেষ্টা করছে এই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই…

তাকের ওপর থেকে দু বোতল পরিশ্রুত মদ নামিয়ে নিয়ে চ্যাঙ চিয়াওকে বললেন, 'এতক্ষণে আমরা দুজনেই দুজনের কাছে পুরনো বন্ধুর মত হয়ে উঠেছি। এবার এই জিনিসটা একটু চেখে দেখলে কেমন হয়? নতুন বছরের দিনে একটু আমোদআহ্লাদ না করবার কোন কারণ থাকতে পারে না।' তারপর এক গ্লাশ মদ চিয়াওর হাতে দিয়ে আবার তিনি বললেন, 'খাঁটি ঈনুকো মদ। বিশ বছরের পুরনো। বাজারে এ জিনিস পাওয়া যায় না। আসুন।'

ভদ্রতার খাতিরে চিয়াও প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। চ্যাঙকে

তিনি কি দিয়ে আপ্যায়ন করবেন তাই ভাবতে লাগলেন মনে মনে। মদের গ্লাশের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, হাত দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাকের ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পোঁটলা নামিয়ে আনলেন তিনি। পোঁটলাটা খুলতেই দেখা গেল তার ভেতর অনেকগুলো ছোট ছোট পোঁটলা। একটা একটা করে টিপে টিপে পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তিনি তিনটে পোঁটলা বার করলেন। পোঁটলা তিনটের ভেতর ছিল শুকনো লিচু, খেজুর আর মশলা-দেওয়া আচার। পোঁটলাগুলো খুলে তিনি চ্যাঙের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা এখন পুরনো বন্ধু। এ নিয়ে আর ভদ্রতা দেখাবেন না।'

চ্যাঙ একটা লিচু তুলে নিলেন, তাঁর আঙুলের চাপে লিচুটা ফেটে গেল। সেই আওয়াজটুকু শুনে কেমন মজা লাগল তাঁর—আজকের এই নতুন বছরের দিনে এই আওয়াজটুকুর প্রয়োজন ছিল যেন। ওদিকে চিয়াও আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছেন মদের গ্লাশে, সমস্ত মদটুকু শেষ হওয়া না পর্যন্ত চ্যাঙ অপেক্ষা করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল?'

'চমৎকার!' চিয়াও ঠোঁট চাটলেন, 'চমৎকার! এত ভাল জিনিস আর খাইনি।'

দুজনে একে অপরের গ্লাশে মদ ঢাললেন আবার। আস্তে আস্তে ঐক্যে দুজনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। অনর্গল কথা বললেন দুজনে—পারিবারিক কথা, চাকরির কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা, অর্থোপার্জনের কষ্টের কথা, স্ত্রী পাসের কথা। গ্লাশে গ্লাশে ঠোকাঠুকি, হৃদয়ে হৃদয়ে জানাশোনা, চোখে চোখে অশ্রুর আবেগ, শরীরে শরীরে উত্তাপ। দুজনেই উদার হয়ে উঠেছেন। আর একটা পোঁটলা খুলে কমলালেবু বার করলেন চিয়াও। বাকী বোতল দুটোর দিকে তাকিয়ে চ্যাঙ বললেন, 'আর ওই দুটো ফেলে রেখে

কি লাভ! শেষ করে ফেলা যাক। আমি একটা, আপনি একটা। এক ফোঁটাও পড়ে থাকবে না। আমরা এখন পুরনো বন্ধু। আসুন, আসুন।'

'আমি কিন্তু খুব বেশী অভ্যস্ত নই।'

'কোন ভয় নেই। বিশ বছরের পুরনো, নরম আর শাঁসালো মদ। দেখবেন, আপনার একটুও নেশা হবে না। ভগবানের ইচ্ছা, আমরা তুজনে বন্ধু হই। আসুন!'

চিয়াওকে অকৃত্রিম সম্মান দেখানো হল। নিজের বোতলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন চ্যাঙ—অল্প একটুই অবশিষ্ট আছে। শার্টের কলারটা খুলে ফেললেন তিনি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, জিভটা আড়ষ্ট। কথা এখনো বন্ধ হয়নি, কিন্তু কথাগুলোকে শোনাচ্ছে ছাড়া ছাড়া প্রলাপের মত। আত্মসংযম একেবারে হারিয়ে ফেলেননি তিনি, এখনো ইচ্ছা করলে তিনি নিজের অবচেতন আবেগকে সংযত করতে পারেন। অবশ্য একবার এই চেষ্টা করতে গিয়েই তিনি তাঁর নতুন পাওয়া বন্ধুর সামনে প্রায় বেসামাল হয়ে উঠেছিলেন এবং তার ফল হয়েছিল ঝগড়া বা অভদ্র ব্যবহার নয়—উল্লাস ও আনন্দ। ওদিকে চিয়াও আধ বোতলের বেশী খেতে পারেননি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এক প্যাকেট সিগারেট বার করে একটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন চ্যাঙের দিকে। সিগারেট ধরালেন তুজনেই। সিগারেট মুখে চ্যাঙ আধ-শোয়া অবস্থায় আসনে ঠেস দিয়ে মনের আনন্দে পা দোলাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু গলাটা যেন পুড়ে গেছে, স্বর বেরুচ্ছে না, ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ছেন তিনি। সিগারেট হাতে চিয়াও-ও ঠেস দিয়ে বসেছেন, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উলটো দিকের আসনের পায়াগুলোর

দিকে, বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে দপ্ দপ্ করে, ঢেঁকুর উঠছে মাঝে মাঝে, মুখটা ফ্যাকাশে, কেমন জ্বালা করছে সমস্ত শরীর।

বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই—বাড়ী—যাই। চ্যাঙের মনে হল, ভয়ংকর গতিতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। বুকটা ধড়ফড় করছে, চারদিকে সব কিছু মুখর হয়ে উঠেছে যেন। মাথাটা শূন্যে বন্ বন্ করে ঘুরছে আর মাছির মত শব্দ করে উঠছে গুন্ গুন্ করে। আশেপাশের সমস্ত জিনিস নাচছে, জ্বলে উঠছে লাল লাল বৃত্তের মত। গুন্ গুন্ শব্দটা থামতেই আবার তাঁর বুকের অস্বাভাবিক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল। শরীরের শক্তি সামান্য ফিরে আসতেই চোখ খুলে একটু তাকালেন তিনি, এমন একটা ভান করলেন যেন তাঁর কিছুই হয়নি, তারপর হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে নিবে-যাওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন আবার এবং দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। হঠাৎ একটা সবুজ আগুনের শিখা দপ্ করে জ্বলে উঠল টেবিলের ওপর। মদের গন্ধ পাওয়া গেল। ছড়ানো গ্লাশ আর বোতলের চারপাশে পাক খেতে খেতে ছড়িয়ে পড়ল আগুনটা, উঁচু হয়ে উঠল আরও, লকলকে শিখা বিস্তার করল চারদিকে। হাতের সিগারেটটায় আগুন ধরতেই স্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠলেন চিয়াও, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সিগারেটটা, তারপর টেবিল চাপড়াতে শুরু করলেন আগুন নেবাবার জন্যে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর হাতের ধাক্কায় গ্লাশ আর বোতলগুলো উল্টে পড়ল। রামধনুর মত বিচিত্র রঙের লকলকে শিখা নাগাল পেয়ে গেল খোলা পোঁটলাগুলোর। আগুনে ঢেকে গেল চ্যাঙের মুখ, পালিয়ে যাবার কথা মনে হল চিয়াওর। টেবিলের ওপরকার আগুনের শিখা উঁচু হয়ে হয়ে উঠল, তাকের ওপর থেকে পোঁটলাগুলো যেন একটু নেমে এল সেই আগুন ধরবার জন্যে। এক জায়গায় আগুন মিশে যেতে লাগল অন্য

জায়গার আগুনের সঙ্গে। চিয়াওর সর্বাঙ্গ গ্রাস করে ফেলল সেই আগুন। ছাই হয়ে গেল চোখের ভুরু, মাথার চুল পুড়তে লাগল চড় চড় শব্দে। তারপর তাঁর ঠোঁটের ওপর লেগে-থাকা মদটুকুতে আগুন ধরে গেল আর তখন তাঁকে দেখে মনে হল আগুন-নিশ্বাসী দৈত্যের মত। হঠাৎ, পপ্, পপ্, পপ্…মেসিনগানের গুলির মত মনে হল শব্দটা। প্লেটুন কমাণ্ডার সবেমাত্র একটু চোখ খুলে তাকিয়েছে, এমন সময় একটা বোমা ফেটে পড়ল তার নাকের ওপর। স্ফুলিঙ্গ আর রক্ত ছিটকে বেরিয়ে এল জোরালো পিচকিরির মত। উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে শুরু করল সে। তার পায়ের তলায়, শরীরের চারপাশে —সর্বত্র বোমা ফাটছে। কানে তালা-লাগানো শব্দ—যেন মাইন-পাতা জমির ওপর এসে পড়েছে ওরা। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখবার আগেই ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আগুন গ্রাস করে ফেলেছে। যখন সে চোখ খুলে তাকাবার চেষ্টা করছিল, তার ডান চোখে সোজাসুজি বোমা ফেটেছে একটা।

ওদিকে কাউ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমেই তাকিয়ে দেখেছেন নিজের মালপত্রের দিকে। কয়েকটি পোঁটলা ইতিমধ্যেই জ্বলতে আরম্ভ করেছে—আর ওদের ওপরে, নীচে, চারদিক থেকে আগুনের বেড়াজাল ঘন হয়ে আসছে। একটা লকলকে শিখা এগিয়ে আসতেই হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মেঝের ওপর থেকে এক পাটি জুতো খুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে জানলার শার্শির ওপর ছুঁড়ে মারলেন : জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে চান তিনি। জানলার কাঁচ ভাঙতেই এক ঝলক দমকা বাতাস ছুটে এল কামরার ভেতর আর আগুনটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। তাঁর জামার ফার লাগানো কলার, চারটে বিছানা, পাঁচটা বাক্স, পোষাক-পরিচ্ছদ—সমস্তই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ট্রেন ছুটতে

লাগল তেমনিভাবে, তেমনি শোঁ শোঁ বাতাস, বোমাফাটার শব্দ, বুনো জানোয়ারের মত কাউয়ের ছুটোছুটি।

ট্রেনে যাতায়াতের ব্যাপারে ক্ষুদে সুই একজন পাকাপোক্ত লোক। শব্দগুলো সে শুনেছে, কিন্তু কুড়েমি করে একবারও চোখ খুলে তাকায়নি। অবশেষে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুন এল এবং ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। গরম বোধ হতেই সে উঠে বসেছে। আগুন আর ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না তার। বোমা ফাটছে সমানে, তার সঙ্গে যে আফিম ছিল তা গলে গিয়ে পুড়তে আরম্ভ করেছে আস্তে আস্তে। আফিম-পোড়া মিষ্টি গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করা সত্ত্বেও পা দুটো নাড়াতে পারল না সে। জড়োসড়ো ভঙ্গীতে বসা শরীরটা পুড়তে লাগল ফেনিয়ে ওঠা আফিমের মত, এবং পুড়তে পুড়তে ছোট্ট এতটুকু হয়ে গেল।

সুতরাং ক্ষুদে সুই আর নড়ল না। ওদিকে মদের নেশায় চ্যাঙ বেহুঁশ, গাছের গুঁড়ির মত নিশ্চল। চিয়াও, কাউ আর প্লেটুন কমাণ্ডারকে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। বেঞ্চের ওপর উপুড় হয়ে চিৎকার করছে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার। কামরার সর্বত্র আগুন, গন্ধকের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন আর বোমাফাটার শব্দ নেই—সবগুলো ফেটে গেছে। কিন্তু শব্দটা না থাকলেও ধোঁয়াটা ভারী হয়ে রয়েছে। অবশেষে, যারা ছুটোছুটি করছিল, তারা আর ছুটোছুটি করল না; যারা চিৎকার করছিল, তাদের চিৎকার থেমে গেল। ট্রেন তেমনিভাবে ছুটে চলেছে, তেমনি শোঁ শোঁ বাতাস, ঘন ধোঁয়ার ভেতরে লকলকে আগুনের শিখা মাথা কুটছে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে। ধোঁয়াটা দুধের মত শাদা, জানলায় জানলায় আছড়িয়ে পড়ছে আগুন। সেই আগুনে স্বচ্ছ হয়ে গেল কামরাটা, আকাশ-সন্ধানী

আলোর মত দূরবিস্তৃত আগুনের শিখা ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠল, যেন সহস্র মশাল একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।

ছোট একটা স্টেশনের কাছাকাছি এসে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে গেল, কিন্তু থামল না। হাতল টানতে টানতে ট্র্যাক্‌ম্যান মনে মনে বলল, 'আগুন!' সবুজ আলো দোলাতে দোলাতে সিগ্‌নালম্যান মনে মনে বলল, 'আগুন!' টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রহরীরা মনে মনে বলল, 'আগুন!' স্টেশনমাস্টারের আসতে দেরী হয়েছিল; যখন সে এল ট্রেনটা স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে—কিন্তু কেমন একটা নেশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার ভেতর সেও যেন দূর থেকে দেখল ট্রেনে আগুন লেগেছে। এই দেখাটাকে চোখের ভুল মনে করাই নিরাপদ মনে করল সকলে। সিগ্‌নালম্যান্ আলো নিবিয়ে দিল, হাতল টেনে রেলের লাইন যথাস্থানে ফিরিয়ে আনল ট্র্যাকম্যান, রাইফেল হাতে বিশ্রামঘরে ফিরে এল প্রহরীরা। আগুনের কথা প্রত্যেকেরই মনে পড়তে লাগল বারবার, কিন্তু কেউ তা মুখে স্বীকার করল না। ক্রমে কথাটা সবার মন থেকেই মুছে গেল; তখন একমাত্র চিন্তা হল, কি ভাবে উৎসবের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। সবাই মিলে একসঙ্গে বাজী ছুঁড়ল, মদ খেল আর 'মাজঙ' খেলল—যেন পৃথিবীর কোথাও কোন গোলমাল নেই।

স্টেশন ছাড়িয়ে আসবার পর ট্রেনের গতি বেড়েছে। ফুঁসে উঠেছে বাতাস, ফট্ ফট্ শব্দ হচ্ছে আগুনের। চোখ ঝলসানো গোলা ছুটছে রকেটের মত। অন্ধকার রাত্রি, সারিবাঁধা অগ্নি-উদ্গারী লণ্ঠনের মত দেখাচ্ছে ট্রেনটাকে! আগুনে পোড়া কঙ্কালটা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দাহ্যবস্তুর অভাবে আগুনের শিখাগুলো সামনে পেছনে আবর্তিত হচ্ছে। অবশেষে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় আগুন

লেগে গেল। প্রথমে বেরুল ধোঁয়া। ধোঁয়ার সঙ্গে গন্ধ ভেসে এল— মাংস ও আসবাব পোড়া মিষ্টি মিষ্টি তীব্র একটা গন্ধ। তারপর আগুন। 'আগুন! আগুন! আগুন!' ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল সবাই। মাথার ঠিক রইল না কারও। লাফিয়ে পড়বার জন্যে কেউ কেউ জানলা ভেঙে ফেলল, কিন্তু সাহস হল না। অনেকে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু পরস্পর ঠোকাঠুকি লেগে পড়ে গেল আবার। আর কয়েকজন আসনের ওপরেই নিশ্চল হয়ে রইল, একবার চিৎকার করে উঠতে পারল না পর্যন্ত। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল আর আতঙ্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই সফল হল না। যাত্রীরা আর্তনাদ তুলল, হাত দিয়ে মাথা আড়াল করল, কাপড় ঝেড়ে ঝেড়ে আগুন নেবাল, ছুটোছুটি করল, কামরার বাইরে লাফিয়ে পড়ল······

প্রচুর উপকরণ আর মানুষে ঠাসা নতুন একটা উপনিবেশ আবিষ্কার করে প্রচণ্ড উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে আগুন। লম্বা লম্বা জিভ বাড়িয়ে লেহন করছে; জড়িয়ে ধরেছে পাকে পাকে, আবর্তিত হচ্ছে ধোঁয়ার আড়ালে, জানলার বাইরে, এখানে ওখানে; ফুঁসে ফুঁসে উঠছে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে। এক অদ্ভুত খামখেয়ালী নাচ শুরু করেছে সহস্র সহস্র শিখা, ছুটে আসছে তালগোল পাকিয়ে, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ধূমকেতুর মত— আবার একসঙ্গে জড়ো হয়ে দেখাচ্ছে যেন লাল-সবুজ আগুন-পুকুর। ধোঁয়া আর আগুন। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আগুন, তারপরেই নিস্তেজ হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার হঠাৎ স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার ভেতর থেকে। শরীরের মাংস পুড়বার সময় আর মাথার চুল ঝলসে যাবার সময় শব্দ হচ্ছে নানা রকমের। যাত্রীদের আর্তনাদ, বাতাসের গর্জন, আগুনের ফট্ ফট্ আওয়াজ, জ্বলন্ত গাড়ী, ভারী ধোঁয়া—এ এক চমৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

পরের স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছল। এখানে ট্রেনটা থামবার কথা, সুতরাং থামল। সিগ্‌নালম্যান, টিকেট-ইন্‌স্‌পেক্টর, প্রহরী, স্টেশনমাস্টার, সহকারী স্টেশনমাস্টার, আশেপাশের লোকজন—সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জ্বলন্ত গাড়ীগুলোর দিকে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারল না—কারণ স্টেশনে না আছে দমকল, না আছে আগুন নেবাবার কোন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা এবং তার সামনে ও পেছনে লাগা-লাগি দুটো তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নিঃশব্দ ও নিশ্চল, অলস মন্থর গতিতে একরাশ নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে।

পরে খবর বেরুল যে কামরাগুলোর ভেতর থেকে বাহান্নটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া, জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার ফলে নিহত—এমন এগারোটি মৃতদেহ লাইনের ধারে ধারে পাওয়া গেছে।

দেওয়ালী উৎসবের পর—অর্থাৎ, নতুন বছরের প্রায় পনের দিন পরে একজন ইন্‌স্‌পেক্টর এলেন। প্রথমে তিন দিন কাটল তাঁকে সরকারী অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে—তদন্ত করবার অবসর তাঁর আর হল না। তার পরের তিন দিন তিনি কতকগুলো অপরিহার্য ব্যক্তিগত কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত রইলেন। তারপর তদন্ত শুরু হল।

দেখা গেল, কেউ কিছুই জানে না। ট্রেনের গার্ড, দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর, তিয়েনৎসিন ও শানটুঙের লোক দুটি, ওয়েটার—কেউ বলতে পারল না কি ভাবে আগুন লেগেছে। বিভিন্ন স্টেশনের টিকেট বিক্রীর হিসেবের সঙ্গে সংগৃহীত টিকেটের হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল তেষট্টিটা টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। আর ঠিক এই তেষট্টিটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুতরাং হতাহতের সংখ্যা তেষট্টি। কোন স্টেশন থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন টিকিট বিক্রী হয়নি, সুতরাং ধরে নেওয়া হল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটা খালি ছিল এবং আগুনের সূত্রপাতও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে নয়।

তদন্তের শেষে ওয়েটারকে আবার জেরা করা হল। ও বলল যে ও কিছুই জানে না, আগুনটা যখন লাগে তখন ও ভোজন-কামরায় ছিল। বিচারে স্থির হল যে ওয়েটার নিঃসন্দেহে দোষী এবং নিজের কর্মস্থান ত্যাগ করেছে বলে ওর শাস্তি হওয়া উচিত। সুতরাং নিয়ম মত ওয়েটারের চাকরি গেল।

ইন্‌স্‌পেক্টর এই দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করলেন—অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভঙ্গীতে বিবরণটি লিখিত।

'আমার ভারী বয়ে গেছে,' ওয়েটার ওর বৌকে বলল, 'ওদিকে ডিউটির বেলা নতুন বছরের দিন বেরুতে হবে। আর যখন সব গোলমাল হয়ে যায়, ওঁনারা ভাবেন যেন ওই পচা রেল কোম্পানীর চাকরি গেলেই আমরা না খেয়ে মরব।'

'ওসব বাজে কথা রাখ!' ওর বৌ উত্তর দিল, 'আমি ওই জন্যে ভাবছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে অমন তরকারীটা পুড়ে গেল।'

তুয়ান-মু হুঙ-লিয়াঙ

ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে ; কান্নায় লাল আর ফুলো ফুলো চোখের মত, জ্যোতি-পরিবৃত চাঁদ। মাছরাঙা বিলের ওপর কুয়াশা জমেছে উজ্জ্বল ব্রোন্‌জের মত, কুয়াশার ওপর ভাসছে চাঁদটা। এত ঘন আর দম-আটকানো কুয়াশা যে মনে হয় যেন গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো এলোমেলোভাবে ঝুলে আছে বাতাসে।

কলাইয়ের ক্ষেতের পাশেই নল-খাগড়ার বন। লম্বা গলা বাড়িয়ে ডানা মেলে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল তার ওপর দিয়ে। তারপরেই আবার সেই অভ্যস্ত নীরবতা। মরকত মণির মত চোখ ঝলসানো মাছরাঙা পাখীরা সারা দিন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করেছে জলের ওপর, কিন্তু সেই পাখীর দলও বহুক্ষণ আগেই অদৃশ্য। এখন শুধু কতকগুলো তামাটে রঙের পোকা গুন্ গুন্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পচা আবর্জনার স্তূপের ওপর। ইতিমধ্যে বিলের ধার দিয়ে দুটি লোককে হেঁটে আসতে দেখা গেল।

কালো মত লম্বা লোকটি হাঁটু গেড়ে বসে মাটির ওপর একটা মাদুর বিছোতে লাগল। অপর লোকটি অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও রোগা, হাতে লাল ঝালর লাগানো বর্শা। স্থির দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি, যেন সে এই দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের সীমারেখা খুঁজে বার করবে।

'ভয়ানক কুয়াশা', দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল সে।

অপরজন কোন উত্তর দিল না। মাদুর নিয়েই সে ব্যস্ত। তারপর সে

চোর

কেমন একটা দুর্বল ভঙ্গীতে মাদুরের ওপর বসল, দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে চোখ তুলে তাকাল চাঁদের দিকে।

'শিগগিরই পূর্ণিমা আসছে', বলল সে, 'আজ আর ঘরে গিয়ে কাজ নেই। এসো আজ এখানেই শুয়ে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি।'

'আজ চাঁদের রঙটা কী বিশ্রী রকমের লাল দেখেছ?' অপরজন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ—ওটা একটা অশুভ লক্ষণ।'

'ওই রকম লাল চাঁদ উঠলে নাকি যুদ্ধ বাধে।'

'তা হবে।'

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে রইল। বিলের অপর দিক থেকে দমকা বাতাসের মত শাদা ঝাপসা ধোঁয়া উঠে বিলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক দূরে উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ঝাউগাছের ঝাড়ের ভেতর মাঝে মাঝে দপ্ দপ করে আলো জ্বলে উঠেই নিবে যাচ্ছে আলেয়ার মত।

লম্বা লোকটি বলল, 'সাবধান। আজ একটা দুটো চোর আসতে পারে। যদি আসে তো আমি গন্ধ শুঁকেই টের পেয়ে যাব।'

'তা আসুক না। ভয়ে পালিয়ে যাবে। রোজ রাত্রেই তো আসে।'

'ভয়ে পালিয়ে যাবে? না, আজ আমার ঘুষির বহরটা ওরা একটু টের পেয়ে যাক। চন্দ্রদেবীর পূজো তো শিগগিরই আসছে।'

বেঁটে লোকটি তিক্ত গলায় উত্তর দিল, 'থাক, থাক, তোমার ঘুষি খেলেই তো আর চন্দ্রদেবীর পূজোর পিঠে তৈরী হয়ে যাবে না।'

'তোমার কোন ধারণা নেই। কি মজা হয় দেখ না।'

বেঁটে লোকটি হাতের বর্শাটা মাটির ওপর রেখে পা থেকে ভিজে জুতো-জোড়া খুলে ফেলল, তারপর উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলল, 'কুয়াশাটা

আগের চেয়েও ঘন হয়ে উঠেছে।' কেমন একটা অজানা আর আতঙ্কপূর্ণ ভয়ে ধুক্ ধুক্ করে উঠল বুকটা। ম্লান গোধূলির দিকে বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, কিন্তু ভয়টা কিছুতেই গেল না।

তারপর চাঁদ আরো ওপরে উঠল। আস্তে আস্তে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চারপাশের বাস্তব জগত একটা ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার ভেতর ডুবে যাচ্ছে যেন। বড় বড় ছায়া পড়েছে সর্বত্র, স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে ছায়াগুলো। একটা কালো ঝাউগাছের ছায়া দ্বিগুণ লম্বা হয়ে পড়েছে জলের ওপর। এক জায়গায় জলের ওপর একটা পাথর মাথা তুলেছিল, ঘন ছায়ার ভেতরেও শেওলা-ধরা পাথরটা অস্পষ্ট হয়নি। একটা রহস্যময় সান্ত্বনাবিহীন বিষণ্ণতা থমথম্ করছে বিলের ওপর।

'ভাই লাই-পাও, তোমার বয়স কত হল?'

'তেইশ—আর শিশুটি নই।' লাই-পাও উত্তর দিল।

'আমার বয়স এখনো ষোল। কিন্তু মা বলে, আসছে বছর থেকে আমাকে আর নাবালক শ্রমিক হিসাবে ধরা হবে না, পুরো মাইনে পাব।'

'যত কম কাজ করবে ততোই ভাল। পুরো-মাইনে কাজের জন্যে অতটা অস্থির হয়ো না, কারণ এই সংসারের চারদিকেই শুধু গলদ। তোমার শরীরে এখনো যথেষ্ট শক্তি হয়নি। বেশী পরিশ্রম করলে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে আর সারা জীবনটাই তোমার কষ্টে কাটবে।'

'কিন্তু কি করব? বাবা বুড়ো হয়ে গেছে—গত বছর একজন লোক দয়া করে বিনে পয়সায় তিনটে ওষুধের বড়ি দিয়েছিল, কিন্তু তাতে বাবার কোন উপকার হয়নি। এক বছর আমি চুক্তি করে কাজ করব। যদি একশোটা ডলার আয় করতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কে তোমায় কাজ দেবে? আর এত দয়ার শরীরই বা কার আছে যে তোমাকে এক বছরে একশো ডলার দেবে? গত বছর এদিককার

সমস্ত মাঠে যা ফসল হয়েছিল তার দামও একশো ডলার হয়নি•• আর তোমার ওই রোগা শরীর…’

‘তা হোক, আমি খাটতে পারি…’

‘যাকগে, কালকের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। আমার কাছে খানিকটা মদ আছে। চমৎকার মদ, একটু খেয়ে দেখবে?’ বেল্টের তলা থেকে সে এক বোতল মদ আর একটু চাটনি বার করল।

বেঁটে লোকটি স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে মাথা নড়ল, আর তার সঙ্গীর খাওয়া দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে।

‘হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম মা-নাও। শিগগিরই একটা কিছু ব্যাপার ঘটবে। ক্ষুদে জেনারেল গেছেন রাজধানীতে। সৈন্যরা শিগগিরই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হবে। খবরটা খাঁটি—লোকের মুখে শোনা কথা বলছি না। আর কে একজন জুতোর সুখতলায় লুকিয়ে গ্যেরিলাদের জন্যে গুপ্ত নির্দেশপত্র নিয়ে এসেছে। তাই বড় রাস্তার মোড়ে ওরা আর লোকের জামা কাপড়ের দিকে নজর দেয় না, শুধু জুতো পরীক্ষা করে। সবাই বলছে যে গ্যেরিলারা যদি একবার চেষ্টা করে দেখে তো ক্ষতি কি……’

‘ভাই লাই-পাও, চলো আমরা গ্যেরিলাদের দলে যোগ দিই।’

‘নিশ্চয়ই, সময় হলে দেব। প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই চীনা—নয় কি?’

দুজনের মধ্যে মা-নাও অপেক্ষাকৃত রোগা; কিছুক্ষণ সে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

‘তাহলে আমরা এক টুকরো করে জমি পাব, না?’

‘না। জমির মালিক জমিদারই থাকবে। কিন্তু ফসলের দাম বেড়ে যাবে, আর তাছাড়া অনেক বেশী লোক কাজ পাবে।’

'তাই নাকি,' মা-নাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'তাহলে আমাদের অবস্থা কোন কালেই ভাল হবে না, দুটো পয়সার মুখ দেখা আমাদের ভাগ্যে আর নেই।'

'তোমার মা কি তোমার জন্যে একটি বৌ ঘরে আনবে?' বাধা দিয়ে লাই-পাও সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল।

মা-নাও লজ্জা পেল, কিন্তু কিছু বলল না।

লাই-পাও বলল, 'একটু চাটনি খাও, অনেক রয়েছে। বৌ ঘরে আনাটা হচ্ছে গরু-বলদ কেনার মত। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার বাবাকে অবসর নিতে হবে। সেদিন তাঁকে বিলের ধার দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। তিনি এত কুঁজো হয়ে পড়েছেন যে আর একটু হলেই পায়ের সঙ্গে মাথা ঠেকে যাবে।'

'বৌ ঘরে আনতে হলে টাকা চাই। বিয়ের জন্যে মা আমাকে দুটো পোষাক দিয়েছে; কিন্তু মেয়েটির মা তাতে খুশি হয়নি, বলে—এ বছর মেয়েদের দাম বেড়ে গেছে। ছোটবেলা থেকে যদি আমাদের বিয়ের কথা ঠিক না হয়ে থাকত তবে এই বিয়ে ভাঙবার জন্যে যা কিছু সম্ভব করত ওরা।'

'সংসারটাই এই রকম—মা, সৈন্য, যুদ্ধ—তোমার বলতে কিছুই নেই; এমন কি, মেয়েদের পর্যন্ত ওরা আগলে রাখতে চায়। একটু চাটনি খেয়ে দেখ না, এতটা আমি খেতে পারছি না।'

'সারা রাত বাবা কাশে। কাশি থামাবার জন্যে মাকে উঠে গরম জল নিয়ে আসতে হয়।'

'সত্যি বড় দুঃখের কথা। এসো, শুয়ে পড়া যাক। মাঝরাতে উঠে আবার চোর ধরতে হবে।'

বর্শাটা দুজনের মাঝখানে রেখে একটা ছেঁড়া কাঁথায় সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে লাই-পাও শুয়ে পড়ল।

'তুমি কি চোরের জন্যে রাত জাগবে নাকি?' কাঁথার ফাঁক দিয়ে একটু তাকিয়ে লাই-পাও জিজ্ঞেস করল।

মা-নাও কোন উত্তর দিল না। কাঁথাটার এক কোণ তুলে শুয়ে পড়ল নিঃশব্দে। দূরে গাঁয়ের দিক থেকে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, সেই শব্দও মিলিয়ে গেল একটু পরে। ইতিমধ্যে কুয়াশা চারদিক আচ্ছন্ন করেছে, দুর্ভেদ্য বাষ্প জমেছে স্তরের পর স্তর—ফেঁপে উঠছে ফুলে উঠছে ধোঁয়াটে দুধের মত, মাথা কুটছে সামনের নলখাগড়া-ঝোপে, জমাট হয়ে দানা বাঁধছে ছোট ছোট স্বচ্ছ ঠাণ্ডা বিন্দুতে। আর তবুও আবর্তের পর আবর্ত তুলছে বাষ্পের স্তর, ছড়িয়ে পড়ছে শাদা শাদা আঠালো বস্তুপুঞ্জ, বিলের ওপরকার হলদে কুয়াশার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে—আর চাঁদের আলো পড়ছে তেরছাভাবে, মনে হচ্ছে যেন একটা নিঃসীম নিষ্প্রভ দ্যুতি-জগত ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

'ভাই লাই-পাও, তুমি বললে যে সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। ওরা কি সেই তাতারের গল্পের মত পূর্ণিমার আলোয় রওনা হবে?'

'......'

'ভাই লাই-পাও, তুমি কি আমার বাবাকে দেখছ?'

'......'

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ—গভীর ঘুম?'

'......'

ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করছিল সে, খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছিল নড়াচড়া করবার সময়।

'ভাই লাই-পাও......'

ঘন অন্ধকারের দিকে একজোড়া আশাহীন চোখ তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। কুয়াশা আরও ভারী হয়ে উঠল, পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অস্পষ্ট যবনিকার অন্তরালে। জলের ধারে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রইল

লোক দুটি। তাদের পিছনে উঁচু নীচু ঢেউয়ের মত কলাইয়ের ক্ষেত। গাছগুলো শুকিয়ে গেছে, আর কিছুদিন পর খোলার ভেতর কলাইগুলো পেকে উঠলেই তাদের তুলে নেওয়া হবে। এই রকম চাঁদের আলোয় ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে না, ভিজে বাতাসে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কাঁচের মত স্বচ্ছ ডানাগুলো এমন জড়িয়ে যায় যে ডানা নাড়তে পারে না তারা। শুকনো পাতার অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে।

স্বপ্নের ঘোরে মা-নাও বিড়বিড় করতে লাগল, 'আমাকে মেরো না—না, না, মেরো না—কোমরের নীচে মেরো না।' একটা শজারু—কাঁটাগুলো ফুট্‌ ফুট্‌ দাগওলা—চিত হয়ে আপন মনে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, মানুষের গলা শুনে আতঙ্কিত হয়ে কলাইয়ের ক্ষেতের দিকে পালিয়ে গেল। শজারুটা পালিয়ে যাবার পরেও শুকনো পাতার খস্‌ খস্‌ শব্দটা বেড়েই চলল। তারপর ফসল-কাটার শব্দ শুনতে পেল তারা।

একবার হেঁচে মা-নাও জেগে উঠল। মাটির ওপর কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল একমনে। নানা রকম শব্দ হচ্ছে—কাস্তে চালানোর শব্দ, গাছগুলো মাটিতে পড়ে যাবার শব্দ, আঁটি বাঁধবার শব্দ, পায়ের শব্দ! চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল, চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে চেষ্টা করল সময়টা আঁচ করতে।

'চোর!' লাই-পাওকে হাতের একটা ধাক্কা দিয়ে সে বলে উঠল—তার গলার স্বর প্রায় শোনা যাচ্ছে না বললেই চলে। আর একবার ধাক্কা দিতেই লাই-পাও জেগে উঠল। কেমন হতভম্ব ভঙ্গীতে হাত দুটো একবার নেড়ে মাটিতে কান পাতল সে; নতুন ক্ষেতটার দিক থেকে কিছু কিছু শব্দ সেও শুনতে পাচ্ছে যেন। ধূর্তের মত দাঁত চেপে সে বলল, 'একটা ভাল রকমের ঘুষি দরকার!'

'আমরা কি ওকে ধরব?

'হ্যাঁ—কেন আমাদেরও কি দু-একটা পিঠে দরকার নাকি ?'

নিঃশব্দে দুজনে উঠে দাঁড়াল, তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল নতুন ক্ষেতটার দিকে। মাথা নীচু করে শরীর বেঁকিয়ে হাঁটল দুজনে, যেন চোর তাদের দেখতে না পায়—একবার দেখতে পেলে ধরবার আগেই চোর পালিয়ে যাবে। হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে মা-নাও ঘন কলাইয়ের ক্ষেতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'চুলোয় যাক!' মনে মনে ভাবল সে, 'পুজোর পিঠের বদলে ভাল রকমের একটা ঘুষি—বেচারা!' লাল ঝালর লাগানো বর্শাটা সে জোরে চেপে ধরল।

কুয়াশা এত ঘন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কেউ কাউকে আর দেখতে পাচ্ছে না। পাতার খস্ খস্ শব্দ শুনে একে অপরের গতিবিধি আন্দাজ করে নিচ্ছে। এসব বিষয়ে লাই-পাওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশী, সোজা নতুন ক্ষেতটার দিকে সে এগিয়ে চলল—তার হাত দুটো দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ, গভীর জঙ্গলের সিংহের মত গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে সে, আসামীর জন্যে উৎকর্ণ হয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে প্রতি মুহূর্তে। তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লালচে কুয়াশা ভেদ করে পথ খুঁজে নিচ্ছে।

হঠাৎ মা-নাও একটা আর্তনাদ শুনতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিস মাটিতে পড়বার শব্দ। লাই-পাও একটা লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ভয়ংকর ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে দুজনের মধ্যে।

'বেটা বদমাশ! মনে করেছিস ক্ষেতের মালিক তুই ?' লাই-পাও চিৎকার করছে আর সমানে ঘুষি বর্ষণ করছে অসহায় লোকটির ওপর, 'কি রে বুড়ো, এবার—একবার টুঁ শব্দটি করে দেখ না!' বেচারা ফসল-চোরের গলাটা দু হাতে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেছে সে।

'বাবা, বাবা!' পাগলের মত চিৎকার করে উঠল আ-নাও এবং হঠাৎ ছুটে গিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল যুদ্ধমান লোক দুটিকে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল লাই-পাও। দু চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাল আবার, 'অ্যাঁ, একি!'

একটি বুড়ো কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে আছে—ফ্যাকাশে শরীরটা কাঁপছে যন্ত্রণায়, নিশ্বাস নিতে পারছে না, ছাইয়ের মত শাদা মুখের ওপর রক্তের রেখা।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দুজনে তাকিয়ে রইল, কি করবে ভেবে পেল না।

অনুতপ্তভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। চেহারা দেখে বোঝা যায়, এককালে লোকটি শক্তসমর্থ যোয়ান ছিল; শরীর এখন কুঁজো হয়ে গেছে, কিন্তু ত্রিশ বছর আগেও লোকটি ছিল ভাল ক্ষেতচাষী।

'মাকাকা, মাকাকা', বিড়বিড় করে উঠল লাই-পাও—বুড়ো লোকটির কাছে কি ভাবে ক্ষমা চাইবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে।

বুড়ো তার দিকে ফিরেও তাকাল না। দড়ির বাণ্ডিল ও কাস্তেটা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দুজনে শুনতে পেল, সে আপন মনেই গজ্ গজ্ করছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

দুজনে নিঃশব্দে তাদের বিশ্রাম-স্থানে ফিরে এল।

'আমার চোখে আজ আর ঘুম আসবে না', কথার ভেতর জোর করে একটু রসিকতার সুর আনতে চেষ্টা করল লাই-পাও—মাদুরের ওপর সে বসেছে, দু হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে আগের মত। 'ইচ্ছা হলে তুমি ঘুমোও।'

'আমার বাবাকে তুমি ঘৃণা করবে, না?'

'না, করব না। এখন ঘুমোও।' ঘাড় দুটো টান করে সে উত্তর দিল।

'আমাকে আরো বেশী টাকা রোজগার করতে হবে।' কিছুক্ষণ পর বলল সে।

'কি লাভ বেশী রোজগার করে? সেই গরীবই থাকবে।' লাই-পাওর ভারী নিশ্বাসপতনের শব্দটা বিদ্রূপের মত শোনাল।

'আমার বাবা···বাবা বুড়ো হয়ে গেছে···'

'তা হোক, কিন্তু গায়ে এখনো জোর আছে।'

'জোর আছে?'

'হ্যাঁ। থাকবে না কেন?'

মাদুরের ওপর চুপ করে শুয়ে রইল মা-নাও। একটা অসীম বিষণ্ণতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে, ক্লান্তিতে ঝিম হয়ে আছে মাথাটা। চোখের সামনে একটা পোড়ো জমি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেন—রুক্ষ, অনুর্বর; বাবার আর্তনাদ কানে বাজছে অবিশ্রান্তভাবে—এমন কি ঘুমিয়ে পড়বার পরেও। ঘুম থেকে জেগে তার মনে হল যেন অনেক দূরে কেউ কথা বলছে। আবার ফসল-চোর নাকি? হয়ত লাই-পাওর এখনো ঘুম ভাঙেনি, আর তার বাবাই হয়ত আবার ফিরে এসেছে আরো ফসল চুরি করবার জন্যে। একটু স্থির হবার পর সে বুঝতে পারল যে লাই-পাও আগেই উঠে গেছে। পশ্চিম আকাশের প্রান্তে তরল আগুনের প্রকাণ্ড একটা গোলার মত চাঁদটা ঝুলছে। ভোর হতে আর দেরী নেই। সামনের গাঁ থেকে একটা মোরগ থেকে থেকে ডেকে উঠছে বিশ্রীভাবে।

'হয়েছে, হয়েছে, থাক—অত লজ্জা কিসের?'

গলার স্বরটা যে কোন্ দিক থেকে ভেসে এল তা সে বুঝতে পারল না।

'আচ্ছা বেশ, মারো আমাকে—পশু! এই বুকের ওপরেই মারো। তুমি যদি জানতে যে আমি কত সুন্দর ছিলাম, তাহলে আমাকে ভাল না বেসে পারতে না।'

কথাগুলো শুনে মা-নাও ভয় পেয়ে গেল, একটা অজানা আতঙ্ক যেন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যে অনেক দূর থেকে ভাসতে ভাসতে নানা রকম শব্দ পৌঁচেছে তার কানে—কাস্তে চালানোর শব্দ, গাছকাটার শব্দ, আঁটি বাঁধার শব্দ, দ্রুত চলার শব্দ, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের শব্দ। শিউরে উঠল সে, মনে হল যেন লাই-পাও সঙ্গে থাকলে আর কোন চিন্তা থাকে না। সাহসে ভর করে লাল ঝালর লাগানো বর্শাটা হাতে নিয়ে সে রওনা হয়ে পড়ল যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল সেদিকে।

না, এ ধরনের কাজে সে অভ্যস্ত নয়। প্রকাণ্ড একটা দৈত্য তার জন্যে অপেক্ষা করছে—কল্পনা করেই তার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটার মত শব্দ হতে লাগল। দৈত্যটার মুখে থাবলা থাবলা দাড়ি, কাস্তে উঁচিয়ে মারতে আসছে তাকে…প্রায় কেঁদে ফেলল সে। একবার ইচ্ছা হল, ফিরে গিয়ে লাই-পাওকে ডেকে আনে। কিন্তু লাই-পাওর কোন চিহ্নই নেই, শুধু সেই অস্পষ্ট আর দুর্ভেদ্য হরিদ্রাভ শূন্যতা চারদিক থেকে ঘিরে রইল তাকে।

'কে ওখানে?' একটু কাঁপা গলায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে। তার ধারণা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় দেখাতে পারলেই তার সাহস ফিরে আসবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে কাস্তেশুদ্ধ হাতটা মাথার ওপর তুলে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল।

'যাও, যাও, পালিয়ে যাও শিগগির! ফসল চুরি করবার মতলব—কেমন কিনা?' এবার সে জেনেছে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি অল্পবয়সী সন্ত্রস্তা মেয়ে। নিজেকে ভীষণ সাহসী বলে মনে হতে লাগল। মেয়েটি কেন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে না—ভেবে আশ্চর্য হল সে।

'এইটুকু বাচ্চা বয়সেই তুমি চুরি করতে এসেছ?'

'আমার মা—আমার মা কি আপনাকে কিছু বলেনি ?'

এত ভয় পেয়েছে ও যে এতটুকু হয়ে গেছে কুঁকড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে। এক হাতে এখনো ও কাস্তেটা ধরে আছে, আর কথা বলছে একটি একটি অক্ষর উচ্চারণ করে যেন একটা ভ্যাপ্‌সা চাপা বাতাস গলা চেপে ধরেছে ওর।

মা-নাও জানতেও পারেনি কখন তার গলার স্বর নরম হয়ে গেছে। হয়ত এটা তার কৌতূহল, কিংবা হয়ত সে ওই ভীত সন্ত্রস্ত জীবটিকে একটু সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল।

'আচ্ছা, কে তোমার মা ?'

'মা কি আপনাকে বলেনি ? মা কি কথা বলেনি আপনার সঙ্গে ?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে আতঙ্কিত গলায় মেয়েটি উত্তর দিল। ওর মনে হল যে আর কোন আশা নেই, ওর মার সঙ্গে এই লোকটির আসলে হয়ত দেখাই হয়নি কোনদিন।

'ব্যাপার কি জান, আমরা দুজন লোক। হয়ত তোমার মা অন্য জনের সঙ্গে কথা বলেছে। ভয় পেও না। আমি এই ব্যাপারের কিছু জানি না—এতক্ষণ আমি ঘুমোচ্ছিলাম।'

সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ও, কাস্তেশুদ্ধ হাতটা ঝুলে পড়ল একপাশে। এত অস্বস্তি বোধ করছে মা-নাও যে কাঁদতে ইচ্ছা করছে তার। তারপর তার দিকে পেছন ফিরে মেয়েটি যন্ত্রচালিতের মত কাস্তে চালাতে লাগল আর মাঝে মাঝে আড়চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাল তার দিকে।

'তোমার বাবা আছে ?' অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করল। ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত বুঝতে না পেরে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

একবার মাথা নেড়ে মেয়েটি আবার কাস্তে চালাতে লাগল। ওর ছোট

ছোট হাতের মুঠিতে কলাইয়ের আঁটিগুলো কিছুতেই থাকছে না, আর কাস্তে চালাতে এত কষ্ট হচ্ছে ওর যে দেখে তার ইচ্ছা হল ওকে সাহায্য করে।

'তোমার কি ঠাকুরদা আছে?'

'হ্যাঁ, কাশিতে ভুগছে। ঠাকুরদা আর বেশী দিন বাঁচবে না।'

'কাশি?'

'হ্যাঁ। রাত্রিবেলা ভীষণ বাড়ে।'

'তোমার ঠাকুরদার জন্যে তোমার মা কি রাত্রিবেলা গরম জল তৈরী করেন?'

'কেন?'

'যাতে কাশি কমে।'

'না, মা-র অত সময় নেই।

'কেন সময় নেই?'

'ক্ষেতের ফসল চুরি করবার জন্যে তাকে বেরুতে হয়।'

মেয়েটি একবার হাই তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কাস্তের এক টানে একজন পুরুষ যতটা ফসল কাটতে পারে, এতক্ষণে মেয়েটি তার চেয়েও কম কেটেছে। এখনো থামেনি ও, অক্লান্তভাবে কেটে চলেছে—যেন ওর সমস্ত জীবন নির্ভর করছে এর ওপর।

'তোমার মা এখন কোথায়?' কিছুই বুঝতে না পেরে মা-নাও বলল। এই প্রশ্নে ও একটু দমে গেছে বলে মনে হল। 'জানি না', বিড়বিড় করে বলল ও।

'কিন্তু তুমি একা এখানে এলে কি করে?'

'মা বলল যে তার কাশি উঠেছে, যতক্ষণ কাশি না থামে আমি যেন ফসল কাটতে থাকি।'

'ও হ্যাঁ, তোমার মা...' বিড়বিড় করে কি যেন বলল সে, তারপরেই আবার ডুবে গেল গভীর চিন্তায়, 'আচ্ছা, তোমার ভয় করে না? তুমি জানো যে এরকম কুয়াশা-রাত্রে ভাল করে কিছুই দেখা যায় না।'

চকচকে দুই চোখের দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল ও। শরীরটা যেন আরো রোগা ও আরো ছোট হয়ে গেছে।

'তোমার দাদা আছে?'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল ও।

'ছোট ভাই?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ও।

হতাশ হয়ে চারদিকে তাকাল মা-নাও। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদটা ম্লান হয়ে এসেছে। অতলগর্ভ শাদা বাষ্প তেমনি শ্বাসরোধী, তেমনি সঞ্চরমান—সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমাট-বাঁধা হাজার হাজার ঝকঝকে শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ছে উপত্যকার ওপর। নলখাগড়ার বন, গাছ, পাহাড় এবং চারপাশের ঝাপ্‌সা বস্তুপুঞ্জ প্রত্যূষের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠছে। অসহিষ্ণু মোরগের ভুতুড়ে ডাক শোনা যাচ্ছে আবার। মেয়েটির হাত কেটে রক্ত পড়ছে। নিজের পোষাকে রক্তটা মুছে নিয়ে আবার ও কাস্তে চালাতে লাগল।

'তোমার বাড়ী আছে?'

'হ্যাঁ', পিঠটা সোজা করে গভীর একটা নিশ্বাস নিয়ে ও বলল। পাঁজরার হাড়গুলো বেশ স্পষ্ট, দেখে মনে হয় যেন ওর ক্লান্তি ওর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 'দয়া করে আমাকে এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।' কথাটা বলেই ও আড়চোখে তাকাল, ওর ভয় হয়েছিল যে সে হয়ত চটে উঠবে। 'এতক্ষণে আমি খুব সামান্যই ফসল তুলতে পেরেছি। মা এক্ষুনি এসে পড়বে। মা এসে আমাকে মারবে!'

অনিচ্ছার সঙ্গে শেষ কথাগুলো ও বলল। কেমন জড়োসড়ো হয়ে উঠেছে ও, যেন ইতিমধ্যেই কেউ ওকে মারতে শুরু করেছে।

ঝাপসা পৃথিবীর ওপর ঘন কুয়াশার ঢেউ মৃত্যুরূপী বিষের চেয়েও কম ক্ষতিকর নয়। অবশেষে মেঘের ওপর কুয়াশার স্তর পাতলা হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

মেয়েটির কাছ থেকে চলে গেল সে—কোথায় যাবে কিছু ঠিক নেই, স্বপ্নচারীর মত বিশৃঙ্খল পদক্ষেপ। কিন্তু প্রায় কুড়ি পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে ফিরে এল। তাকে ফিরতে দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল মেয়েটি।

'খুব সামান্যই আমি তুলতে পেরেছি', ও অনুনয় করতে লাগল, 'আর কয়েকটা মাত্র। মা এক্ষুনি এসে পড়বে।'

কোন কথা না বলে কাস্তেটা হাতে নিল মা-নাও এবং ওর জন্যে ফসল কাটতে শুরু করল।

দূরে মোরগ ডাকছে। দিগন্তে প্রভাত আলোর আভাস।

শেন সুঙ ওয়েন

ছ বছর আগে যখন আমি কলেজে অধ্যাপনা করতাম, তখন এই বাড়ীটা আমি ভাড়া নিই। সামনের ঘরটা আমার পড়বার ঘর, পেছনেরটা শোবার। সেটা মে মাস। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম: ইলেকট্রিক বাতি যখন তখন নিবে যেত। সন্ধ্যার সময় হয়ত আমার জন্যে টেবিলের ওপর ভাতের পাত্র আর কাঠি সাজানো হয়েছে আর আমি পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে সেই শাদাসিধে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার পাচককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এমন সময় হঠাৎ বাতি নিবে যেত এবং আমার আহার অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত থাকত। কিংবা হয়ত আমি খাওয়াদাওয়া শেষ করে আরামে বসে বসে কোন একটা বই পড়ছি, কিংবা বাইরের কোন ভদ্রলোক কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করবার জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—ঠিক সেই সময়েই বাতি নিবে যেত। প্রায়ই এমন হয়েছে, আমার বন্ধু এবং আমি হয়ত কোন টিকাটিপ্পনীবিহীন প্রাচীন চীনা লিপির পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করছি কিংবা হয়ত কোন অপ্রচলিত মুদ্রার যাথার্থ্য পরীক্ষা করছি—এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত এবং আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হতাম। আমার বন্ধুটি একজন চিত্রকর এবং লিপি-বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণত অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক—কিন্তু এ ব্যাপারে তিনিও ক্রুদ্ধ না হয়ে পারতেন না এবং ইলেট্রিক কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে গালাগালি দিতেন।

বাতি

এই সমস্ত দুর্ঘটনা এক পক্ষকাল ধরে সমানে চলেছিল। নানা জায়গা থেকে অভিযোগ ও অনুসন্ধানের উত্তরে ইলেকট্রিক কোম্পানীর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বার হয় এবং তাতে বলা হয় যে ঋতু-পরিবর্তনের জন্যেই এই সমস্ত দোষত্রুটি হচ্ছে। ইতি-মধ্যেই আমার পাচকের মুখে শুনলাম যে মোমবাতির দাম পাঁচ সেণ্ট বেড়ে গেছে। এই বিশ্রী ব্যাপার চলতে থাকায় পাচকটি আমার রাত্রিবেলার খাবার টেবিলে রাখবার সময় একটা মোমবাতিও পাশে রাখতে ভুলত না। আমার পাচকটি একজন অসাধারণ লোক—সৎ প্রকৃতি এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। একেবারে ছেলেবেলা থেকে ও আমার বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মঙ্গোলিয়া ও সাচুয়ান পর্যন্ত ও গেছে, এমন কি একবার কুয়াঙসি ও ইয়েনান গিয়েছিল একা একা। কয়েক বছর ও কাটিয়েছে আমার দেশের বাড়ীতে, সেখানে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আমার ঠাকুরদাদার সমাধিক্ষেত্রের পরিচর্যা করেছে। গত বছর যে দক্ষিণাঞ্চলীয় বিপ্লবী অভিযান শানটুঙ-এর দিকে অগ্রসর হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল ও—৭১তম রেজিমেণ্টের কোম্পানী কমাণ্ডারের অধীনে প্রধান পাচকের কাজ। সিনানকুতে বেসামরিক লোকজনের ওপর শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছে ও। তারপর একদিন রাত্রে মেশিনগানের গুলি-বর্ষণের ভেতরে জিনিসপত্র ফেলে রেখে ও রেজিমেণ্ট ত্যাগ করে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসে নানকিঙ-এ। বোধ হয় আমার কোন একজন পরিচিত লোকের কাছ থেকে আমার ঠিকানাটা ও জেনেছিল, কারণ তারপরেই আমাকে একটা চিঠি লেখে ও। চিঠিতে সে জানায় যে আমার বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার জন্যে যদি আমি তাকে রাখি তো সে খুশি হবে। উত্তরে আমি বলি, ও বরং

কিছুদিন সাংহাই-এ বেড়িয়ে আসুক, আমার বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার প্রশ্নই ওঠে না কারণ আমি অত্যন্ত শাদাসিধেভাবে থাকি। আর তাছাড়া যতদিন না ও ফিরে আসে, ততদিন ওর বিপদে আপদে আমি টাকাপয়সা দিয়ে এবং অন্যভাবে সাহায্য করব। অবশেষে একদিন ও আমার বাড়ীতে হাজির হয়। পরনে ধূসর ফৌজী পোষাক—পোষাকটা এত ছেঁড়া আর এত আঁট যে আমার মনে হল, তিন বছর আগে হুনানের ভেতর দিয়ে যখন জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী মার্চ করে গিয়েছিল, সে সময়ে পোষাকটি তৈরী। মোটাসোটা সমর্থ চেহারা, কিন্তু ফৌজী পোষাকটায় ওকে একটুও মানায়নি। সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে একটা ছোট থলে, গরম জলের বোতল, টুথব্রাশ, আর এক জোড়া কাঠি। গরম জলের বোতলটা কোমরে ঝোলানো, টুথব্রাশটা গোঁজা বাঁ দিকের বুক-পকেটের ভেতর আর কাঠি দুটো ফৌজী চালে থলের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাঁধা। এতদিন দিনরাত্রি যে আদর্শ চাকরের সন্ধান করেছি এবার তাকে পাওয়া গেল। আমার স্বভাবটা খুঁতখুঁতে, কিন্তু তবুও ওর ভেতর কোন খুঁত বার করতে পারিনি। আমাদের ভেতর কোন রকম কথা শুরু হবার আগেই আমি বুঝতে পারি যে ওর হৃদয়টা অনাড়ম্বর ও মহৎ।

দেখলাম, আমাদের দুজনের কথা বলবার বিষয়ের অভাব নেই। নানা বিষয়ে আমরা কথা বলি—ঠাকুরদাদার কথা, সেই আশ্চর্য নাতিটির কথা যার অস্তিত্ব কল্পনা করে আমার বাবা খুশি হয়ে উঠতেন কিন্তু যার আবির্ভাবের উপায়টা এখন পর্যন্ত সমস্যামূলক। একটানা কথা বলে যাবার ক্ষমতা চাকরটির আছে। আমার পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করতে যেমন ওর ক্লান্তি নেই, তেমনি ওর নিজের অভিজ্ঞতার পুঁজিও কখনো ফুরোয় না। আর ফুরোবেই বা কেন; পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি লোক—যে নাকি পায়ে হেঁটে বৃহত্তর চীনে ঘুরে বেড়িয়েছে, বক্সার

বিদ্রোহের পরবর্তী গোলযোগ ও চিঙ বংশের পতন যে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে, বহুবার গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, বহু রকম খাবার খেয়েছে, বহু জায়গায় রাত কাটিয়েছে, উঁচু উঁচু পাহাড় ডিঙিয়েছে, খরস্রোতা নদী পার হয়েছে—ওর অভিজ্ঞতার পুঁজি কখনো ফুরোয়! ও হচ্ছে একটা মহাকাব্যের মত, পড়ে শেষ করা যায় না। আর ওর কথা যতই শুনি ততই আমার মনের ভেতর একটা খাঁটি কৌতূহল ও তীব্র অনুসন্ধিৎসা প্রবলতর হতে থাকে। সময় পেলেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলি, আমার মনের ভেতর যখন যে চিন্তা ভেসে ওঠে সেই বিষয়েই ওকে প্রশ্ন করি—কিন্তু ওর কথা শুনে আমি কোনদিন হতাশ হইনি।

দু বেলা খাওয়ার জন্যে বাড়ীউলী আমার কাছ থেকে মাসে ষোল ডলার নিত। স্ত্রীলোকটি ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলের লোক, পাকা হিসেবী। আহার্যতালিকায় কলাইসেদ্ধ ও কাট্‌লফিশ ছাড়া বিশেষ কিছু থাকত না। ওই দুটো জিনিসই পর পর আসত—কিন্তু ওতেই আমি খুশি। মাঝে মাঝে আসত মিষ্টিমত শুয়োরের মাংস, কিংবা মাছ—ভাজা নয়, ভাতের হাঁড়ির ভাপে সেদ্ধ করা। নতুন এসে প্রথম দু-তিনদিন ও কোন কথা বলেনি, নিঃশব্দে আমার খাওয়া দেখেছে। কিন্তু তিন দিনের দিন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আমার কাছে টাকা চায়। টাকার কি দরকার কিছুমাত্র জিজ্ঞেস না করেই আমি ওকে দশটা ডলার দিই। সেই দিন বিকেলে ও লুকিয়ে রান্নার বাসনপত্র কিনে আনে, তারপর খাবার সময়ের আগে পর্যন্ত ওকে আর দেখিনি। আবার যখন ও আমার সামনে আসে, তখন ওর পরনে সেই পুরনো ফৌজী পোষাক, হাতে ভাতের পাত্র, মুখে হাসি। আমাকে বলে যে সমস্ত রান্না ওর নিজের হাতের এবং রান্নার ভারটা যদি ওর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় তো এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হতে পারে। ওর সহজ কথাবার্তা ও রান্নার সুগন্ধ

আমাকে ফৌজী জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং খাবার সময়ে সারাক্ষণ আমরা শুধু সেই কথাই আলোচনা করি। খাওয়া শেষ হবার পর টেবিল পরিষ্কার করে ও রান্নাঘরে যায় আর আমি ডেস্কের সামনে বসে মোমবাতির আলোয় ছাত্রদের খাতা দেখতে শুরু করি। হঠাৎ দরজাটা খুলে ও ঘরে ঢোকে। আমার মনে হয় যেন ঘরের ঝাপসা আলোয় আমি একজন কোম্পানী কমাণ্ডারের মর্যাদা লাভ করেছি। অবসরপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট-মেজর নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। 'ব্যাপার কি?' আমি বলি। ও এগিয়ে এসে একটা কাগজ আমার হাতে দেয়—কাগজটার ওপর সারা দিনের খরচের হিসেব লেখা। হিসেব বুঝিয়ে দিতে ও এসেছে। আমি কেমন একটু বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু ওর গাম্ভীর্য দেখে বোঝা যায় যে ও পাচকের কর্তব্য করছে মাত্র। নিজেকে সামলিয়ে নিই।

'এত ব্যস্ত কেন?' আমি বলি।

'আমার মতে এ বিষয়ে একটা কথাবার্তা বলে নেওয়াই ভাল। আপনি জানেন যে যদি আমরা নিজেরাই রান্না করি তবে খরচ অনেক কম পড়বে। আমাদের দুজনের খাওয়ার খরচও ষোল ডলার পড়বে না। আর ওই পচা ভাত আর কাটুলফিশের জন্যে আপনাকে একাই ষোল ডলার দিতে হয়!'

'কিন্তু তোমার খাটুনি অনেক বেড়ে যাবে না?'

'খাটুনি বেড়ে যাবে! জলের তলা থেকে পাথর টেনে তোলার তুলনায় ভাত-তরকারী রান্না করাটা কিছুই নয়। আপনি—আপনি একটু আয়েসপ্রিয়।'

ওর সহজ ও প্রত্যক্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর কোন প্রতিবাদ তুলতে পারি না। সুতরাং সেই দিন থেকে আমার রান্নার ভার ওর ওপর পড়ে।

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ও নিজেকে সাংহাইয়ের নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওর পুরনো ফৌজী পোষাকটা কেমন বেমানান থেকে যায়। ওর জন্যে নতুন পোষাক তৈরী করে দেব স্থির করে ওকে পোষাকের রং ও ধরন পছন্দ করতে বলি। কিন্তু ও ঘাড় নাড়ে, কোন কথা বলে না। কিছুদিন পর ও জানতে পারে যে আমি অপ্রত্যাশিত-ভাবে কিছু টাকা পেয়েছি এবং ও আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি ওকে দশটা ডলার দিতে পারি কিনা। সেই দিন সন্ধ্যায় পকেটে দশটা ডলার নিয়ে ও বেরিয়ে যায় এবং সান ইয়াৎ-সেনী ঢঙে তৈরী ছুটো ফ্লানেলের পোষাক ও কাঁটা-লাগানো এক জোড়া পুরনো জুতো কিনে আনে। মুখের ওপর গর্ব ও সন্তোষের ছাপ নিয়ে জিনিসগুলো আমায় দেখায় ও।

'আচ্ছা, এই পোষাকটা তোমার এত পছন্দ হল কেন? তুমি তো এখন আর সৈন্য নও, আমার মত পোষাক পরো না কেন?'

ও বলে, 'হুজুর, আমি সব সময়েই একজন সৈনিক।'

আমার বন্ধুবান্ধব মহলে ও 'ফৌজী পাচক' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

প্রথমে ইলেকট্রিক বাতির গোলমালটা খুব ভয়ানক হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে বাতি নিবে যেত। পরে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে ওঠে এবং এমন একদিনও যায় না যেদিন মোমবাতির সাহায্য না নিয়েই আমরা রাত্রের খাওয়া শেষ করি। তারপর একদিন ও একটি পুরনো বাতি খুঁজে বার করে। বাতিটা ঘষে মেজে পরিষ্কার করে ও, ত্রিভুজের আকারে পলতে কাটে, তারপর রাখে আমার টেবিলের ওপর। এই রকম পুরনো ধরনের বাতিকে সাংহাইয়ের লোকেরা হয়ত একটা প্রাচীন-সংগ্রহ বলেই মনে করবে, কিন্তু আমি ওর একগুঁয়েমি জানি, সুতরাং কিছু বলি না। তাছাড়া, বাতিটা বেশ কাজের। যখনই ইলেকট্রিক বাতি নিবে

যায়, আমি এই বাতিটা ডেস্কের ওপর রেখে রাত্রিবেলার কাজ করি। সেই স্ফটিক-স্বচ্ছ বাতি আর তার আবছা হলদে আলোর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন আশ্চর্য জগতে উপস্থিত হই। সেখানে ও আছে আমার সঙ্গে, চারদিকে ভাঙা মন্দির আর ছোট ছোট সরাইখানা—সরাইখানার পাশে পুরো এক ব্যাটালিয়ন অশ্বারোহী সৈন্য ঘাঁটি পেতেছে। এক কালে এই সব দৃশ্য আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল কিন্তু আমার এই সাংহাই-এর জীবনে এ সবের স্থান নেই। এখানে আমার খুঁটিনাটি জীবনের কথা ভেবে নিজের অবিশ্বাস ও ক্লান্তি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। কি করছি আমি? প্রতিদিন একইভাবে বক্তৃতা-গৃহে ঢুকি, শ্রোতাদের সামনে একটা ছোট্ট চৌকো টেবিলের সামনে দাঁড়াই আর মুখের ওপর একটা গাম্ভীর্য ও মর্যাদার ভাব ফুটিয়ে তুলি। কিন্তু নিজের ভণ্ডামি আমার কাছে গোপন নয়, বিবেকের দংশন অনুভব করি সব সময়ে। বক্তৃতাতে আজেবাজে কথা বলি আমি, কিন্তু সেই সমস্ত আজেবাজে কথাও বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের পরস্পরবিরোধী উদ্ধৃতিতে ঠাসা। নিজের যুক্তিতে নিজেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, তারপর যখন ঘণ্টা বাজে আমার নজরে পড়ে এখানে ওখানে দু-একজন ছাত্র হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। একদল ছাত্র আমাকে ঘিরে ধরে আর অবিশ্রান্তভাবে এলোমেলো প্রশ্ন বর্ষণ হয় আমার ওপর। শান্তি পাবার জন্যে কোন রকমে পালিয়ে বাড়ী ফিরে আসি। কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখতে পাই সমস্ত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বই, কাগজ আর পাণ্ডুলিপি। ছাত্রদের খাতা রাখবার জন্যে কাগজপত্র ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিতে হয়। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি ছাত্রদের খাতা দেখি। সত্যি, এসব আমার আর ভাল লাগে না। প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছা হয়, এই পৃথিবী থেকে একেবারে পালিয়ে যাই। এর চেয়ে মাংস-কর

আপিসে কেরানীর চাকরি নেওয়া ভাল—প্রচণ্ড বৃষ্টির পর উঠোনের ছোট্ট পুকুরটায় ব্যাঙের ডাক শোনা যাবে আর আমি প্রাচীন গ্রন্থকারদের অনুকরণ করব।

সেই পুরনো ধরনের বাতিটার সামনে আমি বসে থাকি। বাতিটার কাঁপা আলোয় একবার ওর ওপর দৃষ্টি পড়ে আমার। আত্ম-সন্তোষে উদ্ভাসিত ওর মুখ, একমাত্র ও-ই পারে আমার সারা দিনের ক্লান্তি ও সন্ধ্যার এই বিশৃঙ্খল বাতাসের কথা অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের মুখের ওপর একটা ভক্তি-বিনীত ভাব ফুটিয়ে তোলে।

'তুমি কি কোন যুদ্ধের গান জান?' ওকে জিজ্ঞেস করি।

ও বলে, 'নিশ্চয়ই। এই সব গান সৈনিকদের না জেনে উপায় নেই। কিন্তু বিদেশী গানগুলো আমার কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকে।'

'আর লোক-গীতি?' আমি প্রশ্ন করে চলি।

'কি ধরনের লোক-গীতি?'

'লোক-গীতি কি অনেক ধরনের হয়? 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' বা 'গগনে গগনে গরজে মেঘ'—এই গানগুলো কি তুমি জান? কী সুন্দর গান—কিন্তু ছেলেবেলায় এসব গানের অর্থ বুঝতাম না। তারপর একটি গ্যেরিলা বাহিনীতে আমি যোগ দিই। সেখানে আমাদের এমন একটা বন্য জীবন কাটাতে হত যে কুকুরের মাংস খাওয়াটাও একটা দুর্লভ বিলাস হয়ে উঠেছিল। সে সময় এসব গান আমাদের ঠোঁটের ডগায় থাকত। তখন আমরা যত সুখী ছিলাম, তেমন বোধ হয় ভগবানও নন।'

ও বলল, 'ওসব গান এখন সৈনিকদের গাওয়া নিষিদ্ধ। এমন কি, কেউ যদি শিস দিয়েও ওসব গান গায়, তাহলেও তাকে শাস্তি পেতে হয়।'

'তাহলে আমি নিজেই আইন-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী। যৌবনে এই

গানগুলো আমার কাছে মন্ত্রের মত হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে আমি ভাবি—'নীল আকাশের তলায় পাহাড়ে জঙ্গলে যাদের দিন কাটাতে হয়', সেই সব যুবকরা এখনো এই সব গান গায় কিনা।'

'সে সব দিন আর নেই, পৃথিবী বদলে গেছে', ওর গলায় কেমন একটা কৌতুক ফুটে ওঠে, 'সমস্ত সদগুণ আর রীতিনীতি একটা রহস্যময় ঝোড়ো হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। এই অদ্ভুত বাতিটাকেই দেখুন না। গত বছর দেশের বাড়ীতে আপনার বাবার সঙ্গে যখন ছিলাম, তখন বাতি বলতে এই রকম বাতিই বোঝাত।'

বোঝা যায়, গাঁয়ের লোকের মত গ্যাসোলিনের আলোর চেয়ে রেড়ীর তেলের প্রদীপকেই বেশী পছন্দ করে ও।

দিবাস্বপ্নকে আমরা দুজনেই প্রশ্রয় দিই। আর দুজনেই কেমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বারান্দায় বাড়ীউলীর ঘড়িটায় ঢং ঢং শব্দে নটা বেজে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যায়। আরও কথা বলবার জন্যে আমার অনুরোধ, এমন কি, ভয়-প্রদর্শনেও ও কান দেয় না, আমার শোবার ঘরে ঢুকে চারদিকটা শেষবারের মত দেখে নিয়ে আবার ফিরে আসে, তারপর কেমন অদ্ভুত আর মনোরম ভঙ্গীতে সেলাম করে আমায়—যেন আমরা দুজনে এখনো যুদ্ধ শিবিরের সৈনিক। তারপর ও দ্রুত পায়ে নিজের ছোট্ট ঘরটায় ফিরে যায়।

'ওর এত তাড়া কিসের?' নিজের মনে মনে জিজ্ঞেস করি। হয়ত ওর ভয় হয়েছে যে আমার কাজের সময়ে ও বাধা দিচ্ছে বা আমার ঘুমোতে যাবার সময়ে বিরক্ত করছে। এক মুহূর্ত আগেও ও গল্প বলবার আগ্রহে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল কিন্তু হঠাৎ ও থেমে গেছে এবং আগামীকাল পর্যন্ত গল্প বলা স্থগিত রেখেছে। হয়ত ওর অলিখিত ফৌজী আইনকানুনে

রাত নটার পর নিষ্প্রদীপের শুরু। ও চলে যাবার পর একটা গভীর নিঃসঙ্গতা আস্তে আস্তে আমার মনের ভেতর মাথা তুলছে। এই অবস্থায় মানসিক একাগ্রতা অসম্ভব, কাজ শুরু করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওর অভিজ্ঞতা ও কর্মশক্তির অফুরন্ত পুঁজির কাছে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে নিয়ে বই লিখব। কিন্তু ওর ওই সুন্দর আর পবিত্র আত্মাকে নিশ্চল গদ্যের ভেতর ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা কৈ আমার? ওর গায়ের রং আর ওর গলার স্বর আমার কাছে জীবনের নতুন রূপ খুলে দিয়েছে। এতদিন আমি যা কিছু লিখেছি সমস্তই অন্তঃসারশূন্য ও গদ্যময়। এক জোড়া গর্তে-ঢোকানো চোখ—অস্পষ্ট বিষণ্ণতার ছাপ সেই চোখে কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের আশা একেবারে মুছে যায়নি, পক্ষ্মহীন পিঙ্গল পল্লবের আড়ালে উঁকিঝুঁকি দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি সব সময়েই নম্র, কিন্তু সেই নম্রতাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মাছে মাঝে নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আমি। মাঝে মাঝে আমাদের ভেতর যুদ্ধের আলোচনা হতে হতে যখন কথা ওঠে যে চাষীদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে কিংবা বিজয়ী সৈনিকরা চাষীদের গরু মোষ কেড়ে নিয়ে গেছে, তখন হঠাৎ ও চুপ করে যায় এবং কেমন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় কোন একটা অর্থসূচক শব্দের জন্যে মস্তিষ্কের অন্ধ আনাচে কানাচে ও খুঁজে মরছে, কিন্তু ভাষা এখানে শক্তিহীন। নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ও। আমাদের দুজনের ভেতর কেমন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। অনেক ক্ষণ পরে ওর মুখের ওপর একটা মৃদু ও অত্যন্ত মনোরম হাসির আভাস ফুটে ওঠে, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ও তারপর ও একটা ছোট্ট গান গাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুঃসহ চিন্তাগুলো সম্পূর্ণ অন্য পথে ঘুরে যায়। এই সব মুহূর্তে আমার মনের চাঞ্চল্য ও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। এমনও হয়েছে যে ওর

দু-একটা অত্যন্ত আকস্মিক অঙ্গভঙ্গী দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি— আতঙ্কটা অবশ্য আমার চীনা বন্ধুদের কথা ভেবে যারা অত্যন্ত বেশী রকম নির্বোধ ও অত্যন্ত বেশী রকম ধার্মিক। অবশ্য, এক সময়ে এমনও মনে হয়েছিল যে এই প্রাচীনতম ও প্রাচ্যতম দেশের লোকদের যুগের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সংগ্রাম ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নতুন এক সামঞ্জস্যহীন জগতে। অনেক বঞ্চনা ও দুঃখবোধের ভেতর দিয়ে তাদের জীবনপাত হয়েছে নতুন এক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, আর স্বপ্ন দেখেছে নতুন এক জাগৃতির। ওর কথা শুনতে শুনতে আমি কোন রকমে চোখের জল চেপেছি।

মাঝে মাঝে আমার ভেতর একটা গোপন উত্তেজনা এসেছে, কেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি আর ওকে বলেছি যেন ও শুধু এই ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ না থাকে, খুশি মত আমোদ আহ্লাদও করে যেন। এই রকম মুহূর্তে ও নির্বাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় এবং নিঃশব্দে আমার সামনে থেকে সরে যায়। পর মুহূর্তে আবার ওকে ডেকে ফিরিয়ে আনি। 'থিয়েটারে যাবে ?' আমার কথায় কেমন একটা ক্ষমাপ্রার্থনার সুর থাকে, কয়েকটা ডলার দিই ওকে এবং একথাও ওকে জানিয়ে দিই যে ডলারগুলো ও খুশি মত খরচ করতে পারে। মুখের ওপর জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ও, তারপর বিনীতভাবে টাকাগুলো হাতে নিয়ে নীচে চলে যায়। সাধারণত, মাঝরাত পর্যন্ত জেগে আমি কাজ করি। দরজার মৃদু শব্দ শুনে বুঝতে পারি যে ও চলে যাচ্ছে, আবার রাত দশটায় সময় আর একবার দরজার শব্দ শুনে বুঝতে পারি যে ও ফিরে এসেছে। মনে মনে আশা করি, এই সময়টুকু ও পরিপূর্ণ আনন্দ পেয়েছে—হয়ত নাটক দেখেছে, কিংবা মদ খেয়েছে, কিংবা জুয়ো খেলেছে, কিংবা শুধু মনে মনে ভেবেছে যে

এতগুলো টাকা দিয়ে কি করা যায়। প্রশ্ন করে ওকে বিরক্ত করি না। পরদিন লাঞ্চের সময় টেবিলের ওপর একটা সুরন্ধিত মুরগী দেখে আমি আশ্চর্য হই, কিন্তু তবু একবারও প্রশ্ন তুলি না যে এই মুরগী কোথা থেকে এল। শুধু ওর বাদামী চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি—যে অস্পষ্ট ও মধুর কথাগুলো একবারও মুখ ফুটে বলেনি, তাও বুঝতে বাকী থাকে না আমার। 'এস একটু পান করা যাক', আমি বলি, 'আগে তোমার খুবই পান করবার অভ্যেস ছিল, নয় কি?' ও ইতস্তত করে, তারপর চমৎকারভাবে হেসে উত্তর দেয়, 'ও হ্যাঁ, একটা ভাল খবর আছে। এখানে প্রায় সমস্ত মদের দোকানেই শুধু এ্যালকোহল পাওয়া যায়। অনেক দোকান খুঁজে খুঁজে শেষকালে আমি একজন দেশের লোকের দোকানে যাই। সে আমাকে চমৎকার এক বোতল ধেনো মদ দিয়েছে।' তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে সে ছোট এক বোতল শাদা মদ নিয়ে আসে। আমার জন্যে আধ কাপ মদ ঢেলে দিয়ে ও বলে 'একবার খেয়ে দেখুন—বেশী দিইনি।' মদ স্পর্শ করব না বলে প্রায় একটা প্রতিজ্ঞা ছিল আমার, কিন্তু তবুও ওর ইচ্ছা পূরণ করব বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তারপর আর একবার কাপটা ভরে নিয়ে ও এক চুমুকে শেষ করে ফেলে। মদের মিষ্টিমিষ্টি টকটক সুগন্ধটা ভারী উপভোগ করে ও। হাসিমুখে কোন কথা না বলে ও মদের বোতলটা নিয়ে নীচে চলে যায়। পরের দিন আবার আমরা মুরগী খাই। সাংহাইতে সে সময়ে এক একটা মুরগীর দাম এক ডলার।
যে কলেজে আমি কাজ করি তার সম্পর্কে কোনদিন ও কোন রকম উৎসাহ দেখায়নি। একবার শুধু ও জিজ্ঞেস করেছে, গ্র্যাজুয়েট হবার পর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কি? ওর ধারণা, ছাত্ররা সবাই ম্যাজিস্ট্রেট হবে। আমার মাইনে কত, গৃহযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের মত আমার মাইনে বাড়ে-কমে কিনা—তাও জানতে চেয়েছে ও। ওর প্রশ্নের মূল কথাটা হচ্ছে

এই—ভাবী ম্যাজিস্ট্রেটদের সংখ্যা কত আর আমার বেতন আমার জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট কিনা। একমাত্র আমাকে কেন্দ্র করেই ওর যত কৌতুহল। একটা খাঁটি দয়ার মনোভাব আছে বলে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ও উত্তরোত্তর অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম ও আমার সঙ্গে সমস্ত বিষয়েই একমত হয়েছে, পরে নানা ছুতোয় অনর্থক আমার সময় নষ্ট করতে থাকে, শেষে এমন হয় যে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে ও আর ভ্রূক্ষেপই করে না এবং আমার জন্য নানা রকমের বাধানিষেধ ও কর্তব্য স্বেচ্ছায় মাথা তুলে নেয়। ওকে আমি কড়া গলায় ধমকাতেও পারি না। খুব কম কথা বলে ও, যদিও মাঝে মাঝে কিছু কিছু অভিযোগ শোনা যায় ওর মুখে—অভিযোগটা নানা কল্পিত ও অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে, এবং আমার বর্তমান অশোভন আচরণের কল্পিত কারণগুলোর বিরুদ্ধে। আমার মত বয়সের কোন পুরুষ যে অবিবাহিত থাকতে পারে এতে ওর ন্যায়বোধ ক্ষুণ্ণ হয়। আর যতই সময় যেতে থাকে, ততই ওর অবিশ্রান্ত বাচালতায় আমি বিচলিত হয়ে উঠি। একদিন ওকে আমি সোজাসুজি বলে দিই, যেহেতু আমি ভদ্রলোকের মত ধনী ও সম্মানীয় নই. এবং ছাত্রের মত যুবক ও মেধাবী নই—সুতরাং এ ব্যাপারে আমি অসহায় এবং আমি আর কোন চেষ্টা করব না বলেই স্থির করেছি। আমি ভেবেছিলাম, এর পর ও আমাকে আমার অবহেলার জন্যে আর সমালোচনা করবে না। কিন্তু তা হয়নি, ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়েছে। ও এখন স্ত্রী-অভ্যাগতদের ওপর নজর রাখে। আমার কাছে কোন মহিলা-বন্ধু বা ছাত্রী এলেই ও বাইরে গিয়ে ফল কিনে আনে এবং একটা পরিষ্কার রেকাবিতে অতিথির সামনে দিয়ে যায়। তারপর ও ফিরে গিয়ে দরজার পাশে বা সিঁড়িতে চুপ করে বসে এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে আড়ি পেতে থাকে। অতিথিদের বিদায় দিতে

বাইরে বেরিয়ে এসে সব সময়েই ওকে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়েছি, আমাকে দেখে ও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবার ভান করেছে। দৈবাৎ দু-একবার তাকিয়েও দেখছে মেয়েদের দিকে। তারপরেই থেকে থেকে ও নানা ধরনের প্রশ্ন তোলে—মেয়েটি সম্পর্কে আমার ধারণা, মেয়েটির চালচলন সম্পর্কে ওর নিজস্ব মতামত, মেয়েটির কথাবার্তা ও হাসির ধরন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোঁজখবর করে ও। সব চেয়ে খাপছাড়া ঠেকে যখন ও কতকগুলো অদ্ভুত চীনা নিয়মকানুন প্রয়োগ করে মুখাবয়বের ওপর চরিত্রপাঠ করে। গলার স্বর, অঙ্গভঙ্গী, শারীরিক গঠন ও চালচলন দেখেই ও বলে দিতে পারে কোন মেয়ে সন্তানবতী বা ধার্মিক হবে কিনা, শান্তি বা দীর্ঘজীবন লাভ করবে কিনা। প্রথম প্রথম আমি এসব কথায় বিশেষ কান দিতাম না কিন্তু কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী-অভ্যাগতদের সামনে ওর অস্বাভাবিক চালচলন লক্ষ্য না করে পারি না। অদ্ভুত ব্যাপার। সহজ ও সরল মনে ও ধরে নিয়েছে যে কোন একটি মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে আমাকে প্ররোচিত করে ও একটি পুণ্য-কর্তব্য পালন করছে। হয়ত ও মনে মনে সেই শুভমুহূর্তটিকে কামনা করে যখন ও নতুন পোষাক পরে পূর্ব এশিয়া হোটেলের দরজার সামনে শোভন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আমার বিয়ের বাসরের আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবে। হয়ত আরও আশা করে, একদিন ওই পোষাকেই ও আমার বাচ্চা ছেলের হাত ধরে পার্কে খেলাধুলো ছুটোছুটি করবে—সেনাপতিপুত্রের মত সাজ পোষাক হবে আমার ছেলের। হয়ত আরও অনেক অদ্ভুত স্বপ্নকে প্রশ্রয় দেয় ও। হয়ত ভাবে, একদিন আমি পরিপূর্ণ সম্মানের সঙ্গে সপরিবারে দেশের বাড়ীতে ফিরব, চমৎকার একটা ঘোড়ায় চড়ে ও যাবে সামনে সামনে, নগর-তোরণের ভেতর ওই ঢুকবে সবার আগে, মাথা নাড়বে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের অভ্যর্থনার

উত্তরে, কাঁটার আঘাতে ঘোড়াটাকে উদ্দীপ্ত করে ছুটতে শুরু করবে লাফিয়ে লাফিয়ে, আনন্দে মেতে উঠবে সমস্ত শহরের লোক।······দশ বছর আগে আমার বাবাকে নিয়েও ও এমনি আশা পোষণ করত, বাবার পর দাদা, কিন্তু ওর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন ভাসমান খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরে, তেমনি এখন ও আমাকে আশ্রয় করেছে। এক কালে আমাদের বংশের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা নানা দিকে ছড়িয়েছিল। সেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কখন যে কমতে শুরু করে তা আমি বলতে পারব না। ওর কথা অনুসারে, ওর পূর্বতন মনিব, অর্থাৎ আমার বাবা মঙ্গোলিয়া ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পর পর কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযানের পর ভগ্নমনে বাড়ী ফিরে আসেন। অশ্বারোহী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁর শিরদাঁড়ায় ও শরীরের একপাশে সব সময়েই একটা যন্ত্রণা থেকে গেছে। এই অসুখ তাঁর আর সারেনি এবং এর ফলে তিনি অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়েন। কর্ণেলের পদ তিনি ত্যাগ করেননি এবং স্থানীয় মেডিকেল বাহিনীর কিছু কিছু কাজও তিনি করেছেন। আমার দাদাও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। ঘটনাক্রমে, নানা দেশে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ানোর ফলে, দাদার প্রকৃতিটা হয়েছিল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের লোকদের মত—তেমনি কর্কশ ব্যবহার ও দুঃসাহস, আর মেজাজটা হয়েছিল সাংহাইয়ের ব্যবসায়ীদের মত খরচে ও আড়ম্বরপ্রিয়। সেও বাড়ী ফিরে যায় এবং পেশাদার শিল্পীর মত জীবন কাটাতে থাকে। আমার ছোট ভাইকে ও কোনদিন দেখেনি। তার সময়ে ঘটনার গতি অন্য দিকে গেছে, শুরু হয়েছে বিপ্লবের যুগ। ক্যাণ্টনের ভামপোয়া সামরিক বিদ্যালয়ে সে ঢুকেছিল। আমার এই ভাইটির রক্ত এখনো ভীষণ গরম, অসাধারণ উদ্যমী। প্লেটুন কমাণ্ডার

হিসেবে জনবারো সৈন্য নিয়ে সে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হুপে ও কিয়াঙসিতে কয়েকটি যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু ১৯২৭ সালের বিপ্লব শেষ হবার পরেই সে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে অসামরিক জীবনে ফিরে আসে। রক্তপাত, কলুষ ও অকল্পিত মানবিক অধঃপতনের কথা ভেবে তখন তার সে কী শোকাবহ বিলাপ! এখন সে নিষ্কর্মার মত দিন কাটায়। নিম্নতন পদের অবৈতনিক স্টাফ-অফিসার সে, মাইনে পায়, কিন্তু কোন কাজ করতে হয় বলে কেউ জানে না। বাবা কিংবা ভাইদের পদাঙ্ক আমি অনুসরণ করিনি, এবং হয়ত এইটেই ওর কাছে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃস্বার্থ স্বপ্ন দেখবার যথেষ্ট বড় কারণ।

ওর সামনে সব সময়েই আমি বিষণ্ণতায় ও লজ্জায় পীড়িত হতে থাকি। তবুও ওকে কোন প্রশ্ন করবার সাহস আমার নেই। একদিন ওকে আমি স্পষ্টই বলেছিলাম যে, এই শিক্ষক ও লেখকের জীবন আমার ভাল লাগে এবং এছাড়া আর কিছু আমি চাই না। কিন্তু ও শুধু আমার জীবনের বাইরের দিকটাই দেখেছে। সুতরাং ওর সন্দেহ, আমার জীবনে একটা গভীর অনাবিষ্কৃত দিক আছে।

একটি বিপ্লববাদী তরুণী মেয়ে আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে। এলেই থাকে অনেকক্ষণ। সাধারণত সে আসে নিজের লেখা নিয়ে। বছরের সব সময়েই নীল পোষাক পরে মেয়েটি। আমার ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার কাছে কোনদিন কোন কথা গোপন করেনি। কিছুদিন ওর সমস্ত কৌতূহল মেয়েটির ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মেয়েটির প্রতি ব্যবহার হয়ে ওঠে মায়ের মত, এবং কোন কিছুই—তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন—ওর দৃষ্টি এড়ায় না। আমার বান্ধবীটি এলেই ও কোন না কোন ছুতোয় আমার ঘরের ভেতর লেগে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওর ইচ্ছা মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। ওকে আঘাত করবার ইচ্ছা

আমার নেই। এমন কি আমার তরুণী বান্ধবীটির কাছেও ওর কথা বলেছি—ওর ঘটনাবহুল অতীত, ওর আন্তরিকতা ও সততা, কিছুই গোপন করিনি। ক্রমে মেয়েটিও ওর প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষ ও নরহত্যা দেখে দেখে এই ঝড় জল-সওয়া পুরনো সৈনিকটির মন শক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই মনও মোমের মত গলতে থাকে এবং ক্রমে একটা আশ্চর্য প্রক্রিয়ার ফলে ও এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে এই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হই তবে আমি ভয়ানক একটা পাপকাজ করব। আর কেউ না থাকলে মাঝে মাঝে ও এই বিষয়ে আলোচনা করে আমার সঙ্গে—গাম্ভীর্য ও কেমন একটা তিরস্কারের ভঙ্গী ফুটে ওঠে ওর কথায়। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবার সময় প্রথম প্রথম ও লজ্জা পেত। কিন্তু ক্রমে মেয়েটি যখন ওর অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে, তখন ওর মুখ খুলে যায়। তবুও লজ্জার ভাব একেবারে কাটে না; সন্ত্রস্তভাবে, বিনীত ভঙ্গীতে, অস্বাভাবিক হাসি হেসে কথা বলে ও। শীঘ্রই ওদের দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা হয় এবং তার ফলে ওর সাহস ফিরে আসে। তখন ওর চেষ্টা হয় আমার জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটিকে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু করে তোলা। মেয়েটিকে ও অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছে যেন সে আমাকে আমার জীবনধারণ সম্পর্কে কিছু কিছু উপদেশ দেয়—যেমন, আমি যেন আরও কম খাটি, খাওয়া দাওয়ার দিকে আরও নজর দিই, ভদ্রলোকের মত পোষাক পরি। অবশ্য, এসব আলাপ আলোচনা আমার সামনেই চলে। আমার বাবার চালচলন কত মহৎ ও ভদ্র, দেশের লোকেরা আমার ভাইদের কত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আমার মা-র সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য—এসব কথা মেয়েটির কাছে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। আর একটা কথা ও যতদূর সম্ভব অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রায় সব সময়েই মেয়েটিকে

বলে—তা হচ্ছে, স্বামী ও শ্বশুরের প্রতি স্ত্রীলোকের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত। যেখানে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, চাপা স্বরে কথা হয় দুজনের মধ্যে, এবং আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্রয়সূচক হাসে—ভাবটা আমি যেন গায়ে পড়ে ভুল শোধরাতে চেষ্টা না করি। কথাবার্তার শেষে যখন ও বুঝতে পারে যে, মেয়েটির মন আমার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে গেছে তখন নিজের পবিত্র কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করে ও, এবং আমার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হেসে চা ও খাবার তৈরী করবার জন্যে নীচে যায়। সিঁড়ির ওপর ওর দ্রুত পদক্ষেপ শুনে বুঝতে পারি যে ওর মন খুব হালকা হয়ে গেছে।

একদিন ডেস্কের সামনে বসে মা-র কাছে একটা চিঠি লিখছি, এমন সময় ও আসে। আমাকে চিঠি লিখতে দেখে ওর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে যে চিঠিতে আমি মেয়েটির কথা লিখেছি কিনা। ও বলে 'অসাধারণ মহিলা', কিন্তু আমি জানি ও বলতে চেয়েছে অসাধারণ সুন্দরী বা অসাধারণ উপযুক্ত। আমি উত্তর দিই না, ভুরু কুঁচকে তাকাই। 'হুঁঃ...' গজগজ করতে করতে ও চলে যায়; ওর চোখ দুটো যেন বলতে চাইছে, 'কিছু মনে করবেন না, একটু ঠাট্টা করলাম আর কি—ভাল মনেই কথাগুলো বলেছি, কিছু মনে করবেন না হুজুর।' ঘরের অন্য এক প্রান্তে গিয়ে ও দাঁড়ায়—ওর ভয় হয়েছে যে আমি হয়ত কালির দোয়াতটা ছুঁড়েই ওকে মেরে বসব।

একদিন আমি বেরিয়ে যাবার পর নীলবসনা মেয়েটি আসে। মেয়েটিকে ও অভ্যর্থনা জানায় এবং কিছুক্ষণের জন্যে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার ভার ওকেই নিতে হয়। (পরে আমি জেনেছি, মেয়েটির সামনে ও অত্যন্ত ভদ্র ও অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেছে—বাড়ীর গিন্নীর সামনে চাকরের যেমন করা উচিত।) আমি কখন ফিরব ঠিক না থাকায় মেয়েটি

চলে যায়। ফিরে এসে ওর মুখে মেয়েটির বিবরণ ও অজস্র সম্পর্কহীন উক্তি শুনতে হয়। হঠাৎ মেয়েটি আবার ফিরে আসে। তখন রাত্রিবেলার খাবার সময় হয়ে এসেছে। মেয়েটিকে আমি নিশ্চয়ই এখানে খেতে বলব—মনে মনে এই কথা কল্পনা করে ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দ্রুত নীচে চলে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ও কয়েকটি আশ্চর্য রকম সুস্বাদু খাবার তৈরী করে আনে। এই নতুন ধরনের রান্না ও কোথায় শিখেছে আমি জানি না। ঝাল লঙ্কা একেবারেই ব্যবহার করেনি, মেয়েটির জন্যে সবই মিষ্টি রান্না—এমন কি, মাছের কাবাবটা পর্যন্ত চিনি মিশিয়ে টক ঝোলে ডোবানো।

খাবার পর টেবিল পরিষ্কার করে ও ফলমিষ্টি নিয়ে আসে—কয়েকটা আপেল ফল আর এক পাত্র ফুটন্ত-গরম চা। আর কিছু দরকার না থাকা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ও আশেপাশে ঘুরঘুর করে তারপর নীচে চলে যায়। আর তারপর উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে মদ খেতে শুরু করে। ওর নেশাচ্ছন্ন চোখে মনিব ও মনিবপত্নীর ছায়া পড়েছে আর পানপাত্রের অতলে হয়ত ছোট একটি শিশুকেও দেখতে পাচ্ছে ও—এই শিশুটিও ওর মনিব, পরনে চমৎকার ফৌজী পোষাক, রাস্তায় ঘাটে বিদেশী ছেলেমেয়েদের যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি। এই কল্পিত শিশু-মনিবটি ছোট ছোট শুভ্র দুই পায়ে আনকোরা নতুন চামড়ার জুতো পরে ঋজু টান ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে, পেছন পেছন চলেছে বিশ্বস্ত চাকর—ও নিজেই! মেয়েটি ও আমি একসঙ্গে রাত্রের আহার করব শুনেই ওর স্বপ্ন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর চেয়ে মর্মস্পর্শী আর কিছু হতে পারে না। মেয়েটি এসেছে আমার কাছে এই কথা বলতে যে পরের মাসে সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে পিকিঙ যাচ্ছে, সেখানে তাদের বিয়ে হবে। ওর কান যুদ্ধের ঘোড়ার মত আশ্চর্য রকম উৎকর্ণ—কেমন করে যেন 'বিয়ে' কথাটা ও শুনতে পেয়েছে।

আর কিছু ও জানে না, কিন্তু ওই একটি কথার অর্থই ও ধরে নিয়েছে ওর এতদিনের সমস্ত মুলতুবী আশার চরম পরিণতি হিসেবে। মেয়েটি চলে যাবার পর এই সুসংবাদের কথা ভেবে খুশি মনে আমি ডেস্কের সামনে বসে আছি এবং হয়ত অবচেতনভাবে একটু বিমর্ষ ভাবও এসেছে আমার মধ্যে—হঠাৎ নাকের তলায় একটা লাল টকটকে মুখ দেখতে পাই, এবং ও যে মদ খেয়ে এসেছে তা বুঝতে বাকি থাকে না আমার।

'এই যে, একটু বেশী মদ খেয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছে? নয় কি? আচ্ছা, অমন সুন্দর সুন্দর খাবারের ব্যবস্থা কি করে করতে পারলে বলো তো? আমার অতিথি তোমার রান্নার ভীষণ প্রশংসা করছিল।'

এমনিতেই ওর মুখে হাসি ধরছিল না, কিন্তু এবার ও মুরগীর ছানার মত নাচতে শুরু করে। 'আমার আজ এত ভাল লাগছে', ও বলে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাল লাগাই তো উচিত।'

আজ ওর মানসিক অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়, তাই বোধ হয় আমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ও বলে 'কি বলছেন আপনি—উচিত? উচিত কেন হবে? এত ভাল আমার আর কোনদিন লাগেনি। আধ বোতল শাদা মদ আমি খেয়ে ফেলেছি।'

'আচ্ছা, কাল আরও মদ কিনে এনো' আমি বলি, 'একটা বোতল সব সময়েই হাতে রেখে দিও। যাই ঘটুক না কেন, তোমার জন্যে যথেষ্ট পরিমানে মদ কিনে রাখবে—যদিও এখানে সব জিনিসেরই টানাটানি।'

ও উত্তর দেয়, 'জীবনে একসঙ্গে এতটা মদ আমি আর কোনদিন খাইনি। আজ তো আমার ভাল লাগাই উচিত। কিন্তু আপনাকে এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? আপনার বাবার দুর্ভাগ্যের কথা যখন ভাবি তখন সত্যিই বড় কষ্ট হয়। আর যখন আপনার দাদা আর তাঁর রোগা শরীরের কথা মনে পড়ে···আপনার ছোট ভাইকে আমি কোনদিন দেখিনি···তিনি

হচ্ছেন চিতাবাঘ, সোনালী ডোরাকাটা চিতাবাঘ। মেজাজটা গরম কিন্তু অত্যন্ত অমায়িক। একসময়ে ভেবেছিলাম, বন্দুক হাতে নিয়ে আপনার ভাইয়ের পেছনে পেছনে যাব, শত্রুর ব্যূহ ভেদ করব, কাঁটাতার ডিঙোব, আর বেয়নেটের খোঁচা দেব ওই উত্তর দেশের লোকগুলোকে···আর সেই যে বিশেষ এক ধরনের হাতবোমা আছে যা সাত সেকেণ্ডের মধ্যে গোল হয়ে ঘুরে যায়—সেগুলো কি করে ছুঁড়তে হয় তা শিখে নেব তাঁর কাছে···কিন্তু কি জানেন, আমি শুনেছি যে ভামপোয়ার অফিসারদের প্রায় সবাই লাওতুঙের যুদ্ধে মারা গেছে। মাস দুয়েক আগে একজন লোকের মুখে শুনেছি যে ওই মড়াগুলোর গন্ধ এখনো নাকি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আপনার ছোট ভাইয়ের ওপর কোন একটা ভাল গ্রহের দৃষ্টি আছে নিশ্চয়ই। ঘোড়ায় চেপে যেভাবে তিনি বুনো শুয়োর শিকার করতে যান—তাঁকে বীর বলতে হবে, নয় কি? তিনি বিভাগীয় কমাণ্ডার হতে পারলেন না, সেজন্যে আমার দুঃখ হয়। আপনার ক্ষমতা কি যে আমার দুঃখ দূর করেন। ওই তো আপনার শরীর। কেন যে ছাই···'

'তাড়াতাড়ি শুতে যাও, কেমন? আমার অনেক কাজ আছে।'

'হ্যাঁ, আমাকে আপনার বিশ্বাস হয় না—একেবারেই না। আপনি আমাকে বিদেশীর চোখে দেখেন। কিন্তু বুড়ো ঘোড়ার মত আমার কান আছে, সব শুনতে পাই আমি। কিছুদিনের মধ্যে বিয়ের ভোজ লেগে যাবে, আর আপনি সে কথা আমার কাছ থেকে গোপন করছেন। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, কালই চলে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, বল তো তুমি কি শুনেছ? তোমার কাছে কখনো কোন কথা আমি চেপে রেখেছি, বলতে পারো?'

'জানি···জানি···আপনার পায়ে পড়ছি···আমার মনের ভেতর যে কি হচ্ছে আপনি জানেন না!'

হঠাৎ ও কেঁদে ফেলে। মধ্য-বয়সী লোকটি অনেক ঘা-খাওয়া সৈনিক মন নিয়েও শিশুর মত কাঁদে। আমি বুঝতে পারি এটা ওর আনন্দ ও স্বস্তির কান্না। অর্থাৎ ও বিশ্বাস করেছে, এইমাত্র যে মেয়েটি এসেছিল তাকে আমি বিয়ে করব।

ওকে সমস্ত কথা খুলে না বলে উপায় নেই। ওর সাহায্য যে আমার সব সময়েই দরকার, এ বিষয়ে ওর আর কোন সন্দেহ নেই। ও বোধ হয় ধরে নিয়েছে যে এখন থেকে সব কিছুর দায়িত্ব ওর। অবশেষে ও আদর্শ প্রভুপত্নী খুঁজে পেয়েছে, ওর এতদিনের স্বপ্ন রূপ-পরিগ্রহ করছে আস্তে আস্তে। চোখের জল আর ও ধরে রাখতে পারছে না। ওর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। প্রকাণ্ড লোমশ হাতটা দিয়ে চোখের জল মুছে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আমি তারিখ ঠিক করেছি কিনা। বলে যে, এই সব সূক্ষ্ম ব্যাপারে লোকে ওই অন্ধ জ্যোতিষের কাছে যায়, কাজেই আমারও উচিত ওই লোকটির সঙ্গে পরামর্শ করা।

আমি বিব্রত হয়ে উঠি। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না। ওকে ধমক দেবার সাহস আমার নেই। তাছাড়া, ও সত্যি সত্যিই মাতাল হয়নি। আসলে ওর মনে এই বিষয়ে একটা দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং কথাটা ওর কাছে গোপন রাখবার কোন অধিকার নেই আমার। ও পরামর্শ দেয় যেন আমি আজই আমার আত্মীয়স্বজনদের টেলিগ্রাম করি, অনেক দূরের দূরের লোকরাও যেন বাদ না পড়ে। আন্তরিকভাবেই ও মেয়েটির সুখ্যাতি করে। কথায় কথায় জানতে পারি, মেয়েটির সঙ্গে এর আগে ওর যে সব কথাবার্তা হয়েছে তার থেকে ওর মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে মেয়েটি আমার মা-র চোখে আদর্শ পুত্রবধূ হতে পারবে।

ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। মুখটা সামান্য একটু ফাঁক করে ও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং মন

দিয়ে আমার কথা শোনে। প্রথমে ও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর ভয় পায়। আমার প্রত্যেকটি কথা ও বিশ্বাস করেছে। ওর গভীর বিষণ্ণতা আমার মন চেপে ধরে। শেষ দিকে একটা সম্পূর্ণ বানানো মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে পারি না, ওকে বলি যে আর একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি এবং সেই মেয়েটিকে দেখতে হুবহু এই নীলবসনা মেয়েটির মতই। দেখে মনে হয় যে ওর মনে এখনো সন্দেহ রয়েছে। ওর ছোট্ট বাদামী চোখ দুটো থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—নড়বার ক্ষমতাও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছে ও।

নীচের ঘড়িতে দশটা বাজে।

'ঘুমোতে যাবার সময় হয়েছে। আজ থাক, আবার কাল কথা বলা যাবে।'

আমার এই অপ্রত্যাশিত অনুনয়ে হঠাৎ ও নিজের ভুল সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। জোর করে মুখের ওপর একটু হাসি ফুটিয়ে তোলে, অত্যধিক মদ খেয়েছে বলে এবং পাগলের মত ব্যবহার করেছে বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, প্রতিজ্ঞা করে যে আর কোনদিন মদ ছোঁবে না। তারপর জিজ্ঞেস করে — কালকের খাবারের সঙ্গে আমি মাছ পছন্দ করব কিনা। আমি কথা বলি না। সোনালী রেকাবিটার ওপর আপেল ফলের ছাড়ানো খোসাগুলো দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে খোসাগুলো তোলে ও, তারপর আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে মাছের মত পিছলে সরে যায়। বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে, তারপর সিঁড়ির ওপর ওর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

বারোটা বাজে ... আমি এখনো জেগে আছি এবং জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর গোলকধাঁধায় হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে মরছি। আমার মন এখন আর শান্ত নেই। একটা শব্দ শুনে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি।

শব্দটা প্রথমে প্রায় অস্পষ্ট ছিল, তারপর ক্রমশ সিঁড়ি পার হয়ে এগিয়ে আসছে আমার ঘরের দিকে। এ নিশ্চয়ই ও, ঘুমোবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে আসছে। তাড়াতাড়ি পলতেটা ঘুরিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিই। বাইরের অন্ধকার থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে। কালো নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে আমি বলি, 'এই যে আমার হয়ে গেছে, এইবার ঘুমোতে যাব।' কোন উত্তর আসে না। কিছুক্ষণ পর আমি দরজাটা খুলি, কিন্তু ও তখন চলে গেছে।

এই প্রহসনের পর ও মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। রীতিমত একটা পরিবর্তন আসে ওর ভেতর। যদি আমি ওকে মদের কথা জিজ্ঞেস করি, ও বলে, দোকানে আজকাল খাঁটি মদ পাওয়া যায় না—শুধু অ্যালকোহল বিক্রী হয়। মেয়েদের কথা ও আর মুখে আনে না, আমার বান্ধবীদের দিকে ফিরেও তাকায় না আজকাল—কিন্তু আমার কাজের প্রতি ওর এখনো কৌতূহল আছে, অবশ্য এখন আর ও আমাকে ভবিষ্যৎ সংসারের জন্যে টাকা জমাতেও উপদেশ দেয় না বা আমার অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পোষাকের জন্যেও কিছু বলে না। এমনভাবে ওর ভুল ভেঙেছে যে ওর ভাঙা স্বপ্নকে আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা ওর, আমার চেয়েও নিঃসঙ্গ।

পিকিঙ যাবার আগে সেই মেয়েটি আর একবার আমার কাছে বিদায় নিতে আসে। আর একবার আমরা একসঙ্গে খেতে বসি। এবার খাদ্যতালিকায় সাধারণ খাবারগুলোর সঙ্গে অতিরিক্ত একটা নিরামিষ তরকারী যোগ হয় মাত্র। খাবার দেবার সময় ওর মুখের কেমন একটা অপ্রসন্ন ভাব চাপা থাকে না। আমি মনে মনে মজা পাই—কারণ আমি জানি যে, যেখানে ওর আনন্দ কিংবা দুঃখের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে ও মর্মান্তিক রকমের গম্ভীর। তারপর থেকে নীলবসনা মেয়েটি আর

কোনদিন আমার পড়ার ঘরে ঢোকেনি। তিয়েন্‌ৎসিনে সে এবং তার স্বামীর গ্রেপ্তারের খবর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার কানে এসেছে। কিন্তু খবরটা ওর কাছে আমি বলিনি।

কিছুকাল আগে আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম যে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা দুজনে একসঙ্গে দক্ষিণে দেশের বাড়ীতে যাব। গত সাত বছর আমি দেশের পরিচিত আকাশ দেখিনি, সেখানকার পরিচিত মাটিতে পা দিইনি। আর ও নিজেও গত ছ-বছর ধরে দেশছাড়া। এখন জুন মাসের গোড়ার দিক, ছুটি শুরু হতে আর মাত্র আঠারো দিন বাকী। তারপর হঠাৎ গৃহযুদ্ধ বেধে যায়, এবং নানকিং যাবে বলে ও কিছু টাকা চায় আমার কাছে—ওখানে কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে আসবে। আজকাল ওর স্বভাবটা ভীষণ চাপা ও সংযত, ওকে সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। দিনের পর দিন রান্না করা আর বাড়ীর খুঁটিনাটি কাজ, আর বাড়ীউলী ওকে না বলে জিনিস নিয়ে গেছে বলে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ঝগড়া—এইভাবেই দিন কাটে ওর। আমার মনে হতে থাকে, ওর পক্ষে এখন নানকিং-এ বেড়িয়ে আসাই দরকার। তারপর ও নানকিং-এ যায়—কিন্তু আর ফিরে আসে না। আমার মনে হয় না ও গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। মিথ্যে কথা বলে না ও। কিন্তু ওর সম্পর্কে আমার এখনো এই কথাই ভাবতে ভাল লাগে যে, ও এখনো সৈন্যদলের পাচক হিসেবে কাজ করছে। মাঝে মাছে যখন কোন ভাঙা মন্দিরের পাশে ঘাঁটি পড়বে, তখন খুব ভোরে উঠে সঙ্গীকে নিয়ে বাজার করতে বেরুবে ও। চালের দোকানে বসে একটু বিশ্রাম করবে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করবে, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পাল তোলা নৌকো দেখবে। সন্ধ্যার সময় বুলেট রাখবার ঝুড়ির ওপর বসে একটা বাতির লালচে শিখায় হিসেব বোঝাবে কর্পোরালকে, তালগোল পাকানো কাগজের ওপর

দুর্বোধ্য হাতের লেখায় তরকারীর হিসেব লিখতে লিখতে গালাগালি দিয়ে উঠবে মনে মনে, তালি-দেওয়া তোষক পেতে কাঠের চৌকির ওপর শোবে রাত্রিবেলা। এইভাবেই ও চিরকাল বেঁচে থাকবে বলে কল্পনা করি আমি। চিরকাল না হোক—অন্তত আরো কুড়ি বছর। ওর কাছ থেকে আমি আজ পর্যন্ত কোন চিঠি পাইনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওএখনো বেঁচে আছে।

এইভাবে বাতিটা আমার ডেস্কের ওপর এসেছে। এখনো প্রায়ই আমি বাতিটা ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে যখন পরিচিত কোন বিষয়ের ওপর লেখা শুরু করি কিংবা গভীর কোন চিন্তায় ডুবে যাই—ইলেকট্রিক বাতি নিবিয়ে দিয়ে তেলের বাতিটা জ্বালাই। এই রকম মুহূর্তে ও যেন স্বপ্নের মত ফুটে ওঠে। ওর সেই লাল মুখ, তালগোল পাকানো ফৌজী পোষাক—একটি পুরনো সংসারের পরিচারক। আর ওর ওই ছোট্ট বাদামী চোখের নিঃশব্দ অশ্রু-বন্যা।

শেন সুও ওয়েন

নিঃশব্দে, ক্ষিপ্র গতিতে বাঁশের ভেলাটা ভাটির দিকে এগিয়ে চলেছে। ভেলার ওপর দুজন লোক। টহলদারী জলসৈন্যের ঘাঁটি গোপনে পার হয়ে এসেছে ওরা, গন্তব্যস্থানের আর দু মাইল মাত্র বাকি। হঠাৎ নলখাগড়া আর ঘাসের জঙ্গলে বোঝাই একটা জংলা জমিতে ভেলাটা ঠেকে গিয়ে স্থির ও নিশ্চল হয়ে গেল। জলের কল্লোলধ্বনি আর নলখাগড়ার বনে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেল ওরা।

গ্যেরিলাবাহিনীর সিগনাল কোরের অফিসার লি-ঈ। কর্কশ গলায় কমবয়স্ক লোকটিকে ধমকাতে শুরু করল, 'হল কি? তোমায় কি ভূতে পেয়েছে নাকি? ভাবছ, খুব মজা, না? যদি এখানে আটকে যাই তবে ওদের হাতেই ধরা পড়তে হবে আর ওরা বন্দুকের গুলিতে আমাদের শেষ করে ফেলবে।'

যে ছেলেটি ভেলা বাইছিল, সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তবুও কোন কথা বলল না। নদীর কালো জলের ওপর অস্পষ্ট আলোর ঝিকিমিকি, ভেলার ওপর দাঁড়ানো লোক দুটির ছায়া উল্টো হয়ে পড়েছে জলের তলায়। নিঃশব্দে ছেলেটি ভেলার অন্য দিকে হেঁটে গেল।

'তাই তো, ভেলাটা মাটিতে ঠেকে গেছে। মনে হয়, কিছু একটা জলায় আটকেছে।' গলার স্বর শুনে বোঝা গেল, ছেলেটির বয়স খুব কম।

বৈঠাটা হাতেই ধরা ছিল, বয়স্ক লোকটির কাছে গিয়ে সেই বৈঠায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ছেলেটি, এবং তারপর লম্বা বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে

প্রত্যাবর্তন

জলের ভেতর এখানে ওখানে ঠেলা দিতে লাগল। নদীটা এখানে বাঁক ঘুরে গেছে, অগভীর জল—কিন্তু জলের কল্লোল শুনে বোঝা যায় যে বাঁকের কাছে স্রোত রীতিমত প্রখর। যদি না ভেলাটার তলায় কোন কিছু আটকে গিয়ে না থাকে, তবে ভেলাটার এখানে স্থির হয়ে থাকবার কোন কারণ নেই।

বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে লি-ঈ আবার গজগজ করতে লাগল, 'এখনো দু মাইল যেতে হবে। আর এই জায়গাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে টহলদারী শত্রু-সৈন্য এসে পড়তে পারে…'

মনে হল, ভয় বা দুঃখের কোন অনুভূতি ছেলেটির নেই। বয়স্ক লোকটির কথা নিঃশব্দে শুনল ও; তারপর অটোমেটিক পিস্তল ও বুলেটের বাক্সটা বেল্ট্ থেকে খুলে রেখে, ট্রাউজার গুটিয়ে জলে নেমে গেল নিঃশব্দে। একটা সুবিধামত জায়গায় পা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে দু হাতে ঠেলতে লাগল ভেলাটাকে। বাঁশের একটানা চাপা কিচ কিচ্ শব্দ কানে এল ওদের, কিন্তু ভেলাটা একটুও নড়ল না। মনে হল যেন কতগুলো অদৃশ্য হাত ভেলাটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

আগের মতই অধৈর্য গলায় লু-ঈ বিড়বিড় করে বলল, 'সাবধান। আমি জানি তোমার গায়ে বেশ জোর আছে, কিন্তু সাবধান। বরং জামাকাপড় একেবারে খুলে ফেল, ভেলাটার তলায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখ কিসে আটকেছে। মনে হচ্ছে, যত শয়তান আর ভূত রয়েছে ওখানে……'

'হ্যাঁ', খিলখিল করে হেসে উঠে ছেলেটি বলল, 'শয়তান আর ভূত। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি…… '

জলের ভেতর এদিক ওদিক নড়ে চড়ে ভেলার তলাটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল ছেলেটি। লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁশগুলো একসঙ্গে বাঁধা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেরোগুলো দেখল ও। আরও নীচু হতেই হাত আর কাঁধ ডুবে

গেল ঠাণ্ডা জলের ভেতর, ঝিরঝিরে জল চুমু খেয়ে গেল ওর চিবুকে। ইতিমধ্যে ওর পা কাদার ভেতর হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে, অনেক কষ্টে টেনে বার করতে হল পা দুটোকে। দড়ি আর গেরোগুলো হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ শক্তমত কি যেন একটা ঠেকল ওর আঙুলে। বুঝতে পারল, জিনিসটা প্রকাণ্ড একটা পাথর, দড়ি আর জামাকাপড়ে জড়ানো। হাতটা আর একটু বাড়াতেই একটা হিমশীতল মানুষের শরীর অনুভব করতে পারল ও, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ও আনন্দ মেশানো গলায় চিৎকার করে উঠল, 'একটা মানুষ!' ভেলাটা না নড়বার কারণ এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে। অস্ফুট গলায় আবার ও বলল, 'একটা মানুষ! কী অদ্ভুত ব্যাপার......'

'উঁ, কি বলছ, কি ওটা?'

ও উত্তর দিল না। শরীরটার ওপর হাতের আঙুলগুলো বুলিয়ে নিল একবার—লোকটার চুলে, মুখে, হাতে, হাত ঠেকল ওর। মোটা দড়ি দিয়ে শরীরটা পাথরের সঙ্গে বাঁধা, আর সেই দড়িগুলোই কি করে যেন জড়িয়ে গেছে ভেলার বাঁশগুলোর সঙ্গে।

'গলার সঙ্গে আবার একটা পাথর বাঁধা। এই শরীরটার জন্যেই তো আমরা নড়তে পারছি না।' ছেলেটি নিঃশব্দে হেসে উঠল।

'ওটাকে সরিয়ে ফেল', অপরজন উত্তর দিল। দূরে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে, আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। 'একটা অকালকুষ্মাণ্ড,' তার গলায় অবজ্ঞার সুর, 'লোকটা বেঁচে থেকেও কোন কাজে আসেনি, মরে গিয়েও ক্ষতি করছে।' মৃদু গলায় বিড়বিড় করল সে।

কাদার ওপর পা টিপে টিপে ভেলাটার চারপাশে ঘুরছে ছেলেটি, ভেলার সঙ্গে জড়ানো দড়িটা খুলতে চেষ্টা করছে। বেল্‌ট্‌ থেকে ছুরিটা খুলে নিল লু-ঙ্গৈ, তারপর ভেলাটার গায়ে শব্দ করে ঠুকতে ঠুকতে বলল,

'এদিকে এসে তো হে। এই ছুরিটা দিয়ে দড়িটা কেটে ফেল। এতেও যদি শয়তানটা মুঠো না খোলে তো হাতটা কেটে উড়িয়ে দাও। তাড়াতাড়ি! ভয়ানক বিপদে পড়েছি আমরা। ঘাঁটিতে ফিরে যেতেই হবে আমাদের।'

'মুঠো না খোলে' কথাটা শুনে ভারী মজা লাগল ছেলেটির, আর সঙ্গীর অধৈর্য দেখে একটু অবাকও হল মনে মনে।

জলের ভেতর ছুরি চালাবার চাপা একটা শব্দ পাওয়া গেল, আর ভেলাটা ঘুরতে শুরু করল আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পর ভেলাটার হালের দিকে গিয়ে কাঁধ লাগাল ও, তারপর ধাক্কা দিল প্রাণপণ শক্তিতে, কিন্তু ভেলাটা জল থেকে একটু ওপরে উঠল মাত্র। কিছুতেই সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না, শুধু ঘুরতে লাগল অনবরত। জলের ভেতর ছুরি চালানো বেশ শক্ত। হয়ত শেষ পর্যন্ত ভেলাটা টুকরো টুকরো করে খুলে আবার জোড়া লাগাতে হবে। কিন্তু অত সময় নেই। তাছাড়া, আর এক মাইল ভাটিতে শত্রুপক্ষ-অধিকৃত একটা নৌকো-সেতু আছে। লু-ঈ আর অধৈর্য চেপে রাখতে পারল না, লঘুচিত্ততা ও ধীরগতির জন্যে ধমকাতে লাগল ছেলেটিকে, আর এই বলে শাসাল যে কর্তব্য-অবহেলা, অযোগ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে ওর নামে রিপোর্ট দেবে। এই কথা শুনেও শান্ত ও অবিচলিত রইল ছেলেটি।

'যাক, এখানে সময় নষ্ট না করে হাঁটতে শুরু করা যাক,' নীরস গলায় অবশেষে ছেলেটি বলল, 'নইলে ভোর হবার আগে আমরা পৌঁছতে পারব না।'

অপরজন বলল, 'পাহাড়ে উপত্যকায় সর্বত্র আমাদের জন্যে ফাঁদ পাতা আছে। শয়তানগুলো দড়ি-পাথর নিয়ে প্রস্তুত। যদি আমরা দু মাইল হাঁটতে চেষ্টা করি তবে আমাদের গলায়ও এই রকম দড়ি-পাথর জুটবে।'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'ভয় পেলে চলবে না। আর কোন উপায় নেই।' অবশেষে বয়স্ক লোকটি মত দিল। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে আর হাতড়াতে হাতড়াতে দুটো বুলেটের বাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাড়ের ওপর নিয়ে এল ওরা, তারপর লম্বা নলখাগড়ার বনের ভেতর আত্মগোপন করে আস্তে আস্তে আলোচনা করল কোন্ পথ ধরে যাওয়া ঠিক হবে। এই রকম অন্ধকার রাত্রিতে আরও দু বার ওরা এই নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছে, কিন্তু হাঁটা পথটা ওদের কাছে অপরিচিত। পথে কোথায় কোথায় পুকুর বা জলা বা ঝরণা পড়বে, সে সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা নেই; কতগুলো গাঁ বা শত্রুঘাঁটি পার হতে হবে তাও ওরা জানে না। অন্ধকার আকাশে একটিও তারা নেই। অবশ্য ওদের দুজনের কাছে টর্চ আছে। কিন্তু চারপাশের ঘনায়মান অন্ধকারে সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে যেন, সামান্য একটু আলোর আভাস পেলেই শত্রুপক্ষের গুলি ছুটে আসবে। আর যদি শত্রুসৈন্য জানতে পারে যে ওরা এইভাবে নদীর ওপর যাতায়াত করছে তাহলে এর পরে যত লোক ভেলা চড়ে আসবে তাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে।

কিছুক্ষণ আলোচনা করে ওরা ঠিক করল যে পাহাড়ে পথে যাবার চেষ্টা না করে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে যাবে। গত কয়েক দিনে বন্যার জল সরে গেছে, পথ এখন শুকনো। তাছাড়া, নদীর ধারে কোথাও একটা ফেলে-যাওয়া শাম্পান বা সালতি পেয়েও যেতে পারে হয়ত।

সরু পথটা নলখাগড়া ঝোপের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে। পায়ের নীচে মাটি কর্দমাক্ত ও পিছল। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ চারপাশে। যত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, ততই অবর্ণনীয় রকমের জোরালো হয়ে উঠছে গন্ধটা।

'সাবধানে পা ফেলো। আশেপাশে হয়ত আরও দু-একটা মড়া পড়ে আছে। হোঁচট খেও না।'

'ভেলার তলায় লোকটার পকেট খুঁজে দেখলে হত, হয়ত ও আমাদেরই কোন কমরেড।'

'কে হতে পারে?'

'এখন আমার মনে পড়ছে। চুয়াত্তর নম্বরের সংবাদ তার ট্রাউজারের পেছনে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল, তের নম্বরের সংবাদ একটা সিগারেটের ভেতর লুকনো ছিল, আর······'

'ওসব বাজে কথা থাক। চারদিকে নজর রাখ। এখানে আরও দুটো মড়া বাড়ুক তা আমরা চাই না।'

সেই অদ্ভুত গন্ধে লু-ঈ বিব্রত হয়ে উঠেছে, তার ধারণা, মড়াটা পাঁচ গজের বেশী দূরে নেই। টর্চটা সে এমনভাবে হাতে ধরল যেন এই মুহূর্তে ফস্ করে জ্বালিয়ে ফেলবে, কিন্তু ছেলেটি বাধা দিল তাকে। কান খাড়া করে উৎকর্ণ হয়ে দুজনে শুনল কিছুক্ষণ: তালে তালে বৈঠা পড়ার একটা শব্দ যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। জল থেকে ওরা মাত্র পাঁচ ফুট দূরে, কিন্তু ঘন নলখাগড়ার ঝোপ আড়াল করে রেখেছে ওদের। নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে ওরা দুজনেই সজাগ, কারণ ওরা ভাল করেই জানে যে এগিয়ে-আসা নৌকোর শব্দটা শত্রুপক্ষের টহলদারী সৈন্যের। গ্যেরিলা সৈন্যরা এই নদীপথকে যোগাযোগের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে কিনা তাই দেখতে বেরিয়েছে ওরা। যদি নদীর বাঁকের ভেলাটা আর কাদার ওপর পায়ের চিহ্ন ওদের চোখে পড়ে তবে আর রক্ষে নেই। দুজনের পেছনে পেছনে ওরা ছুটে আসবে। ভাগ্য ভাল, ওরা দুজনেই এখন ডাঙার ওপর······

সেই মুহূর্তে, ওদের পায়ের শব্দে কিংবা বৈঠা-পড়ার ছলাৎ ছলাৎ

আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে একটা পেঁচা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে অন্ধকার আকাশে উড়তে শুরু করল। তারপর কিছুক্ষণ ওদের মাথার ওপর লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে পাক খেয়ে অপর পাড়ের দিকে উড়ে চলে গেল। নৌকোর আরোহীদের ফিসফিস কথাবার্তা কানে এল ওদের—হয়ত এই নলখাগড়া বনে মানুষ লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ করছে নৌকোর লোকরা; কিন্তু ওদের দিকে না এসে চলে গেল পেঁচাটা যেদিকে উড়ে গেছে সেদিকে। বৈঠা-পড়ার মন্থর আওয়াজ ভেসে এল, অপর পাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে নৌকোটা।

নৌকোর দিকে পিস্তল উদ্যত করে ওরা অপেক্ষা করছে। দুজনেই শান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যেই মুহূর্তে বুঝতে পারল যে নৌকোটা দূরে চলে যাচ্ছে, দুজনে একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে উত্তেজনায় ও স্বস্তিতে চাপ দিল পরস্পরের হাতে। তারপর আবার এগিয়ে চলল দুজনে।

মড়ার গন্ধটা এখনো ভেসে আসছে। খানিকটা বাঁ দিকে এই সামনেই কোথাও মড়াটা পড়ে আছে নিশ্চয়ই। হঠাৎ লু-ঈ বুঝতে পারল, কে যেন তার জামার হাতা ধরে টানছে।

'আচ্ছা জ্বালাতন তো! কি চাও?' চাপা আর্তনাদ করে উঠল সে।

'আচ্ছা, ও তো কমরেড চুয়াত্তরও হতে পারে। ওর শরীরটা বরং একবার পরীক্ষা করে আসি। এই এক-আধ মিনিট···'

বয়স্ক লোকটি যে এই প্রস্তাবে খুশি হয়নি তা স্পষ্টই বোঝা গেল। কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছেলেটি নেমে এল নীচের দিকে যেখানে ঝোপের ভেতর থেকে সেই তীব্র গন্ধটা ভেসে আসছে। আধ মিনিট পরে ও ফিরে এল।

বলল, 'হ্যাঁ, ও-ই। আর গন্ধটা ওরই মত। বেঁচে থাকতে লোকটা

ছিল দুঃসাহসী ও দুর্দান্ত, আর মরে যাবার পরেও শরীরের কী ভয়ংকর গন্ধ!'

'পেলে কিছু?'

'এক মুঠো পোকা।'

'লোকটাকে চিনতে ভুল হয়নি তো?'

'না, আমি ওর জামার কলারটা ছিঁড়ে এনেছি। ভেতরে কাগজগুলো এখনো আছে। আমার আর কোন সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা লোক তোমরা—তোমরা দুজনেই!'

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতেই সামনে এক নতুন বিপদ। একটা পাহাড়ের সামনে এসে পথটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা নেমে গেছে বাঁধের দিকে, আর একটা সার সার পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে। বাঁধের ওপর আলো দেখা যাচ্ছে—জায়গাটা নিশ্চয়ই সুরক্ষিত। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল—কেউ জানে না কোন্ পথে বিপদের সম্ভাবনা বা কোন্ পথটা নিরাপদ।

এক একটা মিনিট পার হচ্ছে আর আশা ফিরে আসছে ওদের মনে। কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না। বাঁধের পথটাই ওদের কাছে বেশী পরিচিত, দরকার হলে সাঁতরে পাড়ি দিতে পারবে। নদীর দিকে ছুটে গেল দুজনে। ছেলেটি দেখল, সামনে একটা আগুন জ্বলছে। কিন্তু আগুনের আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হল না। বয়স্ক লোকটি ওকে আটকাল।

'সামনে যেও না হে।'

'কোন ভয় নেই। নৌকোতে রওনা হবার আগে টহলদারী সৈন্যরা বোধ হয় এই আগুনটা জ্বালিয়ে রেখে গেছে। হয়ত ইচ্ছা করেই জ্বালিয়ে গেছে যেন আমরা ভাবি যে ওখানে লোক আছে।'

এবারও বয়স্ক লোকটির অনুমতি পেল ও। আগুনটা নিবে এসেছে, হামাগুড়ি দিয়ে আগুনটা পার হয়ে এল ওরা, অক্ষত শরীরেই এল। সামনেই লম্বা ও মসৃণ একটা রাস্তা—নদী ও পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলে গেছে। এতক্ষণে ওদের মনটা একটু হালকা হল, বিপদের ভয়টা কেটে গেছে। কয়েক মিনিট পরে ছেলেটির মনে হল যেন রাস্তার ওপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছে। লু-ঈ কান পাতল এবং আওয়াজটা শুনতে পেল সেও। শত্রুসৈন্য বোধ হয় এগিয়ে আসছে। সঙ্গে হয়ত একটা ডালকুত্তাও আছে—রাত্রিবেলা বিদেশীদের গন্ধ শুঁকে খুঁজে বার করতে পারে এমনি ডালকুত্তা। ওরা ঠিক করল, পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের ভেতর আত্মগোপন করবে। অন্ধের মত দুজনে বড় বড় পাথর আর গাছের ছায়ার আড়ালে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল, এবার খুব সামনে, একটু আগে রাস্তার যে জায়গায় ওরা ছিল সেখান থেকে। ঘোড়ার নাল থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে আসছে, মুখ থেকে বেরোচ্ছে ঘন আর শাদা বাষ্প, লম্বা ছায়া পড়েছে মসৃণ পিঠের—এসবও ওরা দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হল ওদের।

ঢালু পথে নামবার সময় লু-ঈর গোড়ালি মচকে গেল। কিন্তু শত্রু-ঘাঁটিকে ফাঁকি দিতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাটা পার হয়ে যেতে হবে—তাও জানা ছিল ওদের।

মোরগের ডাক ভেসে আসছে। ঠিক হল, এখানে এই নলখাগড়ার ঝোপের ভেতর পিস্তলগুলো লুকিয়ে রেখে ওরা সাঁতার দিতে শুরু করবে। সামনের সেতুটা যদি একবার পার হওয়া যায়, তবে আর কোন ভাবনা নেই—সিকি মাইলের ভেতর ওরা নিরাপদ অঞ্চলে পৌছতে পারবে। কিন্তু লু-ঈ বুঝতে পারল, ভাঙা গোড়ালি নিয়ে তার পক্ষে সাঁতার দেওয়া

সম্ভব হবে না। পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাওয়া যায় বটে কিন্তু পথটা অপরিচিত, দিনের বেলাতেও সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তার ওপর, পাহাড়টা পার হলেই খাড়া ঢালু রাস্তাটা দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নেমেছে—অতি সহজেই ওরা শত্রুপক্ষের টহলদারী সৈন্যের চোখে পড়ে যাবে।

কোন দিকে কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে লু-ঈ খেঁকিয়ে উঠল :

'শয়তানরা আমাদের নিয়ে খেলা করছে। আমি জানি, আমি এখানেই মরে থাকব আর আমার শরীরে পোকা কিলবিল করবে। এর পরের বার এ পথ দিয়ে যদি তুমি যাও তো আমার জামার কলারটাও পরীক্ষা করে দেখো। আমি হাঁটতে পারছি না, ডান পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, সাঁতার দিতেও পারব না বোধ হয়। তুমি ভাটির দিকে পাড়ি দাও, আমি পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাব। হ্যাঁ—তোমার পিস্তলটা দিয়ে যাও আমাকে।'

'না, পায়ে যদি যন্ত্রণা হয়ে থাকে, আমিও যাব সঙ্গে। মরতে হলে একসঙ্গে মরব দুজনে।'

'তবে রে ক্ষুদে শয়তান, একসঙ্গে মরতে যাব কেন?' ক্রুদ্ধ গলায় লু-ঈ উত্তর দিল, 'দাও, পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে জলে নেমে পড়।'

ছেলেটি চুপ করে রইল। সেই একই আদেশ পুনরাবৃত্তি করল বয়স্ক লোকটি।

'আচ্ছা, বেশ।' চাপা গলায় উত্তর দিল ছেলেটি। বেল্টটা খুলল কোমর থেকে, কিন্তু বারবার মনে হতে লাগল, খোঁড়া পায়ে পাহাড়ে ওঠা আর উপত্যকায় নামা কি করে সম্ভব? পিস্তলটা দেবার আগে একটু ইতস্তত করল ও। ওরা দুজনে একসঙ্গে অনেক বিপজ্জনক সংবাদ-আদানপ্রদানের কাজ করেছে, কোন কাজে দুজনের ছাড়াছাড়ি

হয়নি, আর এবার লু-ঈকে সব চেয়ে বিপজ্জনক পথ বেছে নিতে হল। সঙ্গীকে ছেড়ে ও যেত কিনা সন্দেহ, কিন্তু লু-ঈ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'শোন, আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। দুটো পিস্তল রইল সঙ্গে, মরবার আগে অনেকগুলোকে শেষ করে মরতে পারব। সাঁতার দেওয়ার চেয়ে পাহাড়ে ওঠাটা আমার কাছে সোজা মনে হচ্ছে। আর তুমি যে পথে যাচ্ছ, সেখানেও অনেক বিপদ। হয়ত সেতুর কাছে জলের ভেতর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আছে। তাহলে তোমাকে সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হবে, সেটা কম বিপজ্জনক নয়। আমার মনে হচ্ছে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথটা আমি খুঁজে বার করতে পারব সহজেই। আবার যখন দেখা হবে পিস্তলটা ফেরৎ নিও। ওরে ক্ষুদে শয়তান, আবার দেখা হবে আমাদের।'

দুজনেই জানত সে মিথ্যে কথা বলছে। কথাগুলো বলেই সে এগিয়ে এসে ছেলেটির কাছ থেকে পিস্তল ও বুলেটের বেল্‌ট্‌টা হাতে নিল। তারপর ছেলেটির পিঠ চাপড়ে জলে ঝাঁপ দিতে বলল ওকে: পাহাড়ের দিকে তার রওনা হবার আগেই ও জলে নামুক। আর একটিও কথা না বলে ছেলেটি জলের ভেতর নামল—বয়স্ক লোকটির সহৃদয় দৃঢ়তা, দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, গ্যেরিলা-বাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলা, এসব ওকে প্রণোদিত করেছিল।

নদীর শান্ত ও ঠাণ্ডা জলের কল্লোলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটি বনমোরগের মত ডেকে উঠল। এই ডাকটা একটা সংকেত, ও বোঝাল যে ও রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বয়স্ক লোকটি শেষ বিদায় জানিয়ে একটা নুড়ি ছুঁড়েছে জলের দিকে। নুড়িটা পড়ল ছেলেটির পা থেকে ফুটখানেক দূরে। এইভাবে দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের নিজের পথে চলে গেল।

শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছেলেটি অত্যন্ত সাবধানে সাঁতার কাটতে লাগল। সেতুর দু ধারে আগুন জ্বলছে। ঝলমলে ছায়া পড়েছে জলের ওপর। কতগুলো শাম্পান আর জেলে-নৌকো লোহার তার দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে সেতুটা তৈরী। দু-ধারে প্রহরী এবং তিনচারজন সৈন্য এদিক ওদিক টহল দিচ্ছে। জলের ওপর মাথাটা সামান্য একটু জাগিয়ে রেখে ছেলেটি চেষ্টা করল স্রোতের টানে ভেসে যেতে—একটুও শব্দ না করে সেতুর তলা দিয়ে পিছলে চলে যাবে ও। হঠাৎ পাহাড়ের দিক থেকে প্রথমে শিস্ দেবার মত শব্দ তারপর গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ও। শুনেই বুঝতে পারল, সঙ্গীটি ধরা পড়েছে। কিন্তু গুলির উত্তরে সেও কেন গুলি ছুঁড়ছে না ভেবে একটু আশ্চর্য হল ও। সেতুটা আর মাত্র দু গজ দূরে, আগুনের আভায় আগাগোড়া ঝলসে উঠেছে। নিঃশব্দে ডুব দিল ও। নদীর তলায় কোন প্রতিবন্ধক নেই। সেতু থেকে তিন গজ দূরে আবার ভেসে উঠল ও, আর সেই মুহূর্তে শুনতে পেল পর পর সাতবার অটোমেটিক পিস্তলের গর্জন। কিছুক্ষণ পর আবার পর পর চারটে গুলির আওয়াজ। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে আর কোন শব্দ হল না।

একটু পরে তিনবার রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেল ও। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, আবার একবার পিস্তলের গুলির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে সেতুর ওপর থেকে কে যেন আর্ত চিৎকার করে উঠল, একটা টর্চের আলো ঘুরপাক খেতে লাগল চারদিকে। আর একবার ডুব দিল ছেলেটি। আবার যখন ও ভেসে উঠল, তখন চারদিক নিস্তব্ধ, সীমাহীন অন্ধকার থমথম করছে—শুধু ওর বুকের নীচে জলের অবিশ্রান্ত ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, মাথার ওপর রাত্রির আকাশজোড়া কালো বাতাস ওর শরীরের চামড়া ও শিরা-উপশিরা ভেদ করে জলের ওপর

চাপ দিচ্ছে যেন। আর সিকি মাইল পার হতে পারলেই নিরাপদ এলাকা।

দূর থেকে শিবিরের আলোটা দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারে জ্বলছে যেন। এ আলোটা ওর পরিচিত, এর উত্তাপ ও অনুভব করতে পারে। শরীরে একটা নতুন শক্তি ফিরে পেল ও।

'সংকেত শব্দ!'

'নব্ব···ই, দুটো পায়েই কাপড় জড়ানো।'

'একজন কেন? সঙ্গী কোথায়?'

'তোমার পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'তাহলে কি সে নেই?'

কোন উত্তর এল না। শুধু একবার ছলাৎ করে জলের শব্দ হল, পাড়ের ওপর উঠে এসেছে ছেলেটি।

চ্যাং তিয়েন-ঈ

প্রাহাড়ী 'লতার মত উজ্জ্বল মুখ। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই অলস দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল টেবিলের ওপর। মৃদু হাওয়া ঢুকছে, টেবিলের ওপর বাতিদানের রেশমী ঝাড়গুলো দুলছে অস্থিরভাবে। কোন একটা বিষণ্ণ যাত্রাগানের সুরে গান গাইছে চারণকবি, সেই গলা ভেসে আসছে বাতাসে। ভুরু কুঁচকে তাকাল সাঙ হুবা। কাঁচা কুল মুখে দেবার মত একটা বিশ্রী মুখ-কোঁচকানো স্বাদ লেগে রয়েছে মুখে। সামনের দিকে ঝুঁকে মিষ্টি কুল বাছল একটা, তারপর মনোরম ভঙ্গীতে ঢুকিয়ে দিল ঠোঁটের ফাঁকে।

'তারপর, কি বলছিলে দিদি?' বলল ও।

অপর স্ত্রীলোকটি ধূমপান করতে করতে অন্যমনস্কভাবে একটা ছবির দিকে তাকিয়েছিল, ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুম্, কি বলছিলাম?'

'আমার সম্পর্কে কি যেন বলছিলে?'

'ও—হ্যাঁ।' টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাইটা ফেলে স্ত্রীলোকটি ঠিক হয়ে বসল, 'শোন বোন, আমার মনে হয় যে তোমার জীবনটা...'

স্ত্রীলোকটি কথা আরম্ভ করতেই মনোযোগে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে সাঙ হুবা। কিন্তু তারপরেই একটা আরসির ওপর দৃষ্টি পড়ল ওর। একটু নড়ে চড়ে আরো মনোরম রেখায় নিয়ে এল নিজের বসার ভঙ্গীকে। ঠোঁট দুটো নড়তে লাগল আলতোভাবে, আগ্রহের ছাপ ফুটে উঠল মুখের ওপর। ওর সম্পর্কে যখনই কেউ কোন কথা বলে, এই রকমই করে ও।

পরিবর্তন

আর এই ধরনের আলোচনায় ও আনন্দ পায়। পারে না-ই বা কেন? প্রত্যেকেই ওকে প্রশংসা করে, প্রত্যেকেই ওর অনুরাগী। টাকা পয়সা প্রচুর আছে ওর, সুতরাং নিজেকে আনন্দ দেবার জন্যে বেহিসেবী হয়ে উঠলেও ক্ষতি নেই। আর তাই হয়ে উঠতেই ভীষণ ভালবাসে ও। লেকের ওধারে যে সব স্ত্রীপুরুষের গান শোনা যাচ্ছে, তারা সকলেই ওর অতিথি, এই চমৎকার বাগানটা ওর, এই বিস্তৃত বাগানবাড়ীটা ওর গ্রীষ্মনিবাস। তাছাড়া, 'ও যে অভিজাতবংশজাত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই'— প্রায়ই একথা বলে সবাই।

অবশ্য, একথাও সত্যি যে এক সময়ে সাঙ হ্বা ও তার মা রীতিমত অর্থকষ্টের ভেতর দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তবুও ওর চালচলন চিরকালই ভদ্রমহিলার মত। এখন অবশ্য অনেকেই ওকে হিংসে করে, ঈর্ষাভরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খতিয়ে দেখে ওর সৌভাগ্যকে এবং ওর স্বামীর ধনসম্পদকে; চিনি ও রবারের দালাল ওর স্বামী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওর অধিকাংশ বন্ধুই স্বীকার করে যে ওর রুচির একটা আভিজাত্য আছে, এবং নিজের টাকাপয়সার অশ্লীল বিজ্ঞপ্তি ও জাহির করে না।

সবাই বলে, 'ও জানে, কোথায় এবং কি ভাবে আনন্দ পাওয়া যায়। এ ভাবে জীবন কাটালে কারও কিছু বলবার থাকে না।'

আর কথাটার ভেতর সত্যিই এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই।

নিজের সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠলেই পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষভাবে সমস্ত মন্তব্য যথাসাধ্য বিবেচনা করে দেখে সাঙ হ্বা। মনে মনে একটা দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করে নেয় যে, আত্মগরিমাকে দূর করে নিজের সম্পর্কে রায়দান ও স্থগিত রাখতে পেরেছে। কিংবা এমন একটা সারল্যের ভান করে যেন অপরাধী শিশু শাস্তিদানের অপেক্ষা করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও মুখের ওপর একটা

হাসির আভাসকে কিছুতেই ও চেপে রাখতে পারে না, তখন ও লুকিয়ে লুকিয়ে আড়চোখে তাকায় আরসির দিকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিজের মুখ, দেখে আর একটু পাউডারের প্রলেপ দরকার কিনা, পরীক্ষা করে কোন্ ভঙ্গীতে সব চেয়ে চমৎকার মানায় ওকে।

এখন ওর মনে হল, যে ভঙ্গীতে ও বসেছে তার চেয়ে চমৎকার আর কিছু হতে পারে না। স্থির দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল নিজের ওষ্ঠবিক্ষেপ আর দিদির অঙ্গভঙ্গীর দিকে। মনে মনে ভাবল, 'কোন পুরুষ আর দিদির মত স্ত্রীলোকের মধ্যে তফাৎ কোথায়? সত্যই দিদি যেন কেমন অদ্ভুত—মেয়েও নয়, পুরুষও নয়। শাদামাজা মুখখানা, প্রসাধনের নামগন্ধও নেই। চুলগুলো ছোট করে কাটা। কোমরের কাছেও শরীরটা একেবারে খাড়া ও সোজা। আর গলা তো নয়, হুংকার। কথা শুনে মনে হয় যেন ও শরীরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলছে।'

উত্তেজিত হয়ে অবশেষে দিদি আসল কথাটা পেড়ে বসল, 'নিজের চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা কর কোন্ যুগে আমরা বাস করছি।' তার মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল, আস্তে আস্তে সরু সরু রেখায় নয়, দমকে দমকে ঘন হয়ে—যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটছে। 'তুমি কি একবারও এসব কথা ভেবে দেখনি? কতকাল এই বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাবে? অবশ্য, একে যদি তুমি জীবন বলো।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে বাস্তব সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। একটা কৃত্রিম জগতের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেই তুমি সন্তুষ্ট। এমন কি, খবরের কাগজও পড় না তুমি। ধরো, আজ যদি রবারের

বাজার ভেঙে পড়ে, কোথায় থাকবে তুমি? এই সব সম্ভাবনার কথা ভাবতেও তুমি ভয় পাও—কারণ তাহলে তুমি যেটা মজা বলে মনে করছ, সেটা আর থাকে না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে—' হঠাৎ সে তাকাল সাও হুবার দিকে। অত্যন্ত চিন্তান্বিতভাবে ও নিজের আঙুলের নখ পরীক্ষা করছে। কী সুন্দর গোলাপী ওর হাতের নখ, কী নরম ঔজ্জ্বল্য ওর নখে! হঠাৎ ও ঢোঁক গিলল—ওর ঢোঁক গেলার ভঙ্গীটাও কী সুন্দর! আলতোভাবে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ও, তারপর ঔৎসুক্যভরা ভঙ্গীতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এসব কথা থাক। আজকের এই দিনটা আমার ভাল লাগছে। প্রতিটি দিনই এই রকম। শুধু ভাল লাগা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'আর হঠাৎ যদি প্রচণ্ড একটা ঝড় ওঠে, তাহলে কি করবে? এমন একটা ঝড় যা সাংহাইয়ের যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর! এই রকম ব্যাপার হঠাৎই ঘটে, আগে থেকে সাবধান করে আসে না। হয়ত আগামী দশ বিশ বছর এই ভাবেই কাটবে, কিংবা হয়ত কালই একটা কিছু হয়ে যাবে।'

'কালই!' সাও হুবা চোখ তুলে তাকাল, 'একথা ভাবার আগে বরং আমি মৃত্যু কামনা করব। কালই যদি এই ভাঙন শুরু হয়, তার মানে কালই আমার মৃত্যু।'

একটু হেসে দিদি উঠে দাঁড়াল, তারপর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকা ও কাকীমার কাছ থেকে তুমি সুশিক্ষাই পেয়েছ আশা করি। তুমি তাঁদের একমাত্র মেয়ে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যেন তুমি—'

'কি?' আরসির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সাও হুবা, দেখে ভাল লাগল এবং একটুও না নড়ে চড়ে বসে রইল সেই ভাবেই।

'কি? তাহলে শোন, যেন তুমি বুর্জোয়া স্ত্রী হতে পার।'

সাঙ হ্বা হাসল, 'কিন্তু কেন?'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে দিদি বলল, 'তোমাকে সুখী করবার জন্যে। তাঁদের কাছে তুমি কি সব বিষয়ে প্রশ্রয় পাওনি? তাঁরা তোমাকে 'মহিলা' করতে চেয়েছিলেন, খাঁটি 'মহিলা'। এবং সে কাজে সফলও হয়েছেন। একজন কোটিপতিকে তুমি বিয়ে করেছ। এখন তো তুমি সুখী, না? আর তোমার সমস্ত আত্মীয়স্বজনও উপকৃত হচ্ছে।'

'না, না, ঠিক তা নয়। অত সহজে আমি সব কিছু মেনে নিইনি। তোমার মনে আছে, সেই যে বছর ঐ চিন্ লোকটার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আমি কি ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়েছিলাম, দিনের পর দিন কি ভাবে আমাকে বাধা দিতে হয়েছিল?'

'কিন্তু এখন?'

সাঙ হ্বা লাল হয়ে উঠল, 'এখনকার কথা আলাদা। এই বিয়ে তো আমি নিজেই করেছি—আমি নিজেই—'

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে কপালের ওপর থেকে ছোট ছোট চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দিদি আবার বসে পড়ল এবং সমস্ত শিষ্টাচারকে জলাঞ্জলি দিয়ে পা তুলে দিল পায়ের ওপর।

'তাহলে স্পষ্ট করেই বলা যাক, তোমার জীবনদর্শন তোমার শিক্ষারই ফল। অবশ্য আমি জানি না এই দশ বছর তোমার জীবন কি ভাবে কেটেছে, কিন্তু তবুও তুমি—'

অন্যমনস্কভাবে কথা বলতে বলতে সে সাঙ হ্বার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ছেলেবেলায় দুজনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল কিন্তু বড় হবার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একবার সে শুনেছিল যে ও কি একটা কাজ নিয়ে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কি কাজ

নিয়েছিল ও? এই পরিবেশে ওকে দেখে মনে হয় যে ওর জীবনের ওই কটা বছর কেটেছে একটা অত্যন্ত সতর্ক পরিকল্পনার ভেতর, ওর ভবিষ্যৎ-জীবনের বিশেষ এক রূপায়ণের পূর্ব-প্রস্তুতিতে—নিজেকে ও ধনী গৃহিনী হিসেবে তৈরী করেছে।

'আমার মনে হয়, এতে আর যাই থাক অস্বাভাবিকতা কিছু নেই: বুর্জোয়া সমাজে চলাফেরা, জীবনের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—শুধু বিবাহিত জীবনের অর্থহীন উপভোগ। এই পটভূমিকা তোমার মনকে এই ধরনের জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে তুলেছে। এ দিক থেকে তোমার বিয়ে সম্পূর্ণ সার্থক; যে সব কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিল, তার সঙ্গে এর কোন অমিল নেই—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সাঙ হ্বা, মুহূর্তের জন্যে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে আবেগভরা গলায় বলে উঠল:

'না, না! সব মিথ্যে!'

'মিথ্যে? তাহলে তুমি—'

'একেবারে মিথ্যে। যে কারণে আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম—আসলে এমন কতগুলো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, তুমি এতক্ষণ ধরে যা অনুমান করছ তা একেবারেই নয়। ব্যাপারটা কি জান, প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে আমি মিশতে আরম্ভ করি সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। তা হচ্ছে—তা হচ্ছে—'

একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সাঙ হ্বা দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সহজাত অভ্যাসবশে মনোরম করে তুলল ভঙ্গীটা। উইলো ডালের মত সরু কোমরটা একটু বেঁকাল কমনীয়ভাবে, একটা পা তুলে পেছন দিকে মেঝের ওপর বুড়ো আঙুলের ভর রেখে ঠিক রাখল ভারসাম্য। তারপর আবার সে বলল:

'তা হচ্ছে এই জন্যে—যে—'

'কি জন্যে ?'

'বিপ্লবের জন্যে,' চাপা নীচু গলায় অবশেষে বলল ও।

'বিপ্লব, তুমি !' প্রচণ্ড একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় দিদি যেন এতটুকু হয়ে গেল, 'তার মানে তুমি কমিউনিস্ট হয়েছ ?'

'ঠিক তাই।'

ওর দিকে খানিকক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে রইল দিদি, তারপর তাকাল টেবিলটার দিকে। নানা রকম ফল ও মিষ্টিতে বোঝাই টেবিলটা, আফিমের বাতি জ্বলছে, গ্লাশের মদ এখনো সবটা শেষ হয়নি। চারপাশের এই স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের আবহাওয়া থেকে আলাদা করে ওকে কল্পনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। কি করে কল্পনা করবে ? প্রতিটি দিনের চার-পাঁচ ঘণ্টা যার কাটে প্রসাধনগৃহে রূপ-পরিচর্চায় ; অসংখ্য বন্ধু, বিলিতী মদ, নাচ, গান আর 'মাজঙ' পরিবৃত হয়ে যার দিন কাটে ; হাজার দু হাজার ডলার যার মাসিক হাতখরচা ; আর যে নাকি খুশিমত নতুন নতুন গাড়ী কিনে বেড়ায়— সে-ই কিনা বিপ্লবী ? আর সে-ই কিনা বলছে, বিপ্লবের জন্যেই তার স্বামীলাভ !

'ওসব কথা আমি আর তুলতে চাই না। পুরনো দিনের কথা পুরনো হয়েই থাক।'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ও। হাতের এমন একটা ভঙ্গী করল যেন মনে হয় হাতটা বাতাসে ভাসছে। দিদি যে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, তা বুঝতে পেরে অনিচ্ছার সঙ্গে ও একবার ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

'তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারিনি। বিপ্লবের উদ্দেশ্য

নিয়ে তোমার স্বামীর মত লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয় কি করে? না কি তুমি সব কথা খুলে বলতে চাইছ না?'

'ঠিক তা নয়। কিন্তু সে সব দিনের কথা ভাবলেই আমার মনে এমন একটা…' কথাটা ও শেষ করল না, জানলার কাছে সরে গিয়ে পটে-আঁকা ছবির মত তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। মধ্য-রাত্রির আকাশে চাঁদ উঠেছে—ম্লান, ড্যাবডেবে, কমলালেবুর কোয়ার মত…

২

এই একই চাঁদের তলায় একাধিকবার লিয়েন ওয়েন-কান-এর দৃঢ় বাহুতে ভর দিয়ে আবর্জনা-ভরা অন্ধকার রাস্তায় ও যাতায়াত করেছে।

ওর মাথার সমান উঁচু তার কাঁধ। বলিষ্ঠ বাহু। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা; লোহার মত শক্তভাবে সেই আঙুল ওর হাত আঁকড়ে ধরেছে। তার পাশে এত ঘন হয়ে ও হেঁটেছে যে মাটির ওপর দুজনের ছায়া আলাদা-ভাবে চেনা যায়নি।

'তুমি এ কাজটা ঠিক করতে পারবে তো?' দ্রুত পথ চলতে চলতে লিয়েন ওয়েন-কান একদিন রাত্রে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই,' হেসে উঠল ও, 'আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে খানিকটা মোহ সৃষ্টি করা আর ঠিক কৌশলমত অগ্রসর হওয়া—'

'না, না, আমি তা বলছি না। এসব কথা তো অবান্তর। আমি শুধু এই কথাই—'

হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা কালো মূর্তি অশুভ লক্ষণের মত ওদের সামনে ফুটে উঠতেই সে চুপ করে গেল।

কেঁপে উঠল সাঙ হ্বা, একটা আতঙ্কের সঞ্চারকে অনুভব করতে পারল মনে মনে। কালো মূর্তিটার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী বাতাস চারপাশের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে, কিন্তু কিছুই ঘটল না। লিয়েন ওয়েন-কানের কাঁধের পাশ দিয়ে চলে গেল মূর্তিটা। লোকটি যেই হোক না কেন, তার দিকে আড়চোখে একবার দৃষ্টিপাত করল ও, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদ্বিগ্নভাবে তাকাল সঙ্গীর মুখের দিকে। লিয়েন ওয়েন-কানের মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি।

সে বলে চলল, 'তুমি ঠিক বলছ যে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবে? কার কথা বলছি বুঝেছ তো? সেই দালাল—কি যেন ওর নাম?,

'লি।'

'হ্যাঁ, লি। এই টাকাটা তুমি ওর কাছ থেকে তুলতে পারবে বলে মনে করো?'

ও হাসল, 'পারবই যে এমন কথা জোর করে বলছি না। সবই নির্ভর করছে একটা মুগ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করার ওপর। একটা অসাধারণ মোহ যদি না হয় তবে কিছুতেই একাজে সফল হওয়া যাবে না।' কথাটা বলে ও তাকাল লিয়েন ওয়েন-কানের দিকে; আশা ছিল, সে একটু অনুমোদন-সূচক হাসলেই এই বিষয়ে আরও কথা বলবে। কিন্তু সে কোন কথা বলল না, মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটতে লাগল নিঃশব্দে—যেন কোন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। সময়ে সময়ে ওর কথা সে একেবারেই ভুলে যায়, তখন এত তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে শুরু করে যে ও ঠিক তাল রাখতে পারে না, দু-একবার পড়েও যায় হুমড়ি খেয়ে।

'কুদে হু কি বাড়ী আছে?' ফিসফিস করে ও জিজ্ঞেস করল।

'এ্যাঁ, হ্যাঁ বাড়ীতেই—সারা দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি।'

সেই পাণ্ডুর ও অনুপ্রাণিত মুখখানির ছবি ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। প্রশান্ত চোখের তলায় কফি রঙের দাগ পড়েছে। আবার ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

'ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে।'

'কিন্তু কি করে তা সম্ভব? টাকা কই?' লিয়েন ওয়েন-কানের মুখটা কেমন নীরস দেখাল, 'আরও অনেক কমরেডেরই তো এই অসুখ করেছে। প্রত্যেকের জন্যেই যদি শুশ্রূষা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে কাজ চালাবার টাকা আসবে কোত্থেকে? আর সেই কাজ চালাবেই বা কে?'

কথাটা শুনে ও কেঁপে উঠল, 'নিজের সম্পর্কে তুমি সাবধান হয়ো। আমাকে কথা দাও যে সাবধান হবে!'

'বিশেষভাবে সাবধান হবার সময় কই আমার?' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে, 'মৃত্যুর জন্যে আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি। আজ হোক, কাল হোক, একদিন তো মরতেই হবে। এইভাবে রোগে ভুগে যদি নাও হয় তো শত্রুর হাতে।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে প্রাণপণে ও চেষ্টা করল যেন তার আতঙ্কভাবটা বাইরে প্রকাশ হয়ে না পড়ে। ফুলে ওঠা না পর্যন্ত জিভটা চেপে রাখল দাঁত দিয়ে, কাঁপতে লাগল গাল দুটো। ক্ষুদে হু আর ক-দিনই বা বাঁচবে? —একথাই ও ভাবতে লাগল মনে মনে। হু-র বাড়ীতে পৌঁছবার পর ও আর নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারল না, কাঁপতে লাগল থর থর করে।

রুগ্ন লোকটির আজ ভীষণ জ্বর এসেছিল। মুখখানা লাল হয়ে রয়েছে। কাশির সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর, কেঁপে কেঁপে উঠছে অসহ্য যন্ত্রণায়। মাঝে মাঝে চাপ চাপ কফ বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে, জোরে

নিশ্বাস নিতে নিতে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ছে বালিশের ওপর। কিছুক্ষণ পর ধীর আর্তস্বরে সে কথা বলতে লাগল লিয়েন ওয়েন-কানের সঙ্গে। ঘরের ভেতরকার বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে, সর্বত্রই যেন রোগের ছাপটা পরিস্ফুট। বিছানার ধারে বসে লিয়েন ওয়েন-কান কথা বলছে, প্রচণ্ড কাশির জন্যে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে তাকে। রুগ্ন লোকটি যখন লিয়েনের মুখে শুনল যে সাঙ হুবা কথা দিয়েছে এই সংকট পার হবার জন্যে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করবে তখন সে প্রবল চেষ্টায় উঠে বসে কৃতজ্ঞভাবে হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। নাকে মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে জানলার পাশে একটা বেঞ্চিতে ও বসেছিল, ক্ষুদে হু তাকাতেই ও রুমালটা সরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি এবং তাকে উৎসাহিত করার জন্যে চেষ্টা করল হাসতে। 'যদি কিছু টাকা না আসে তবে এখানকার সংগ্রাম কিছুতেই জীইয়ে রাখা যাবে না। আর মাঝপথে কিছুতেই থামব না আমরা। শহীদ—' দম নেবার জন্যে সে একবার থামল, 'শহীদ কমরেডদের কথা আমরা ভুলব না, তাঁরাও—'

আবার সে কাশতে শুরু করল। ভাঙা ভাঙা ভীষণ আওয়াজ, উত্তেজনায় কাঁপছে শরীরটা। মনে হল যেন কাশির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। মুখখানা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে গেছে, নারকেল দড়ির মত ভীষণভাবে ফুলে ফুলে উঠেছে শিরাগুলো। তার শরীরের ঝাঁকুনিতে খাটটা শব্দ করতে লাগল সমানে। অবশেষে মুখ থেকে এক দলা ঘন কফ বেরিয়ে আসবার পর সে একটু স্থির হয়ে শুতে পারল, এবং হাঁপাতে শুরু করল ভীষণভাবে। চোখ দুটো আধ-বোজা ছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পর সাঙ হুবা বুঝতে পারল যে সে ওর আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ম্লান হাসল সে, যেন বলতে চাইছে যে দুশ্চিন্তা হবার মত এমন কিছু অসুখ তার হয়নি।

'যদি আমরা পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারি তবে এখানে প্রচণ্ড একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারব—হঙ কঙ আন্দোলনের চেয়েও প্রচণ্ড ও জোরালো।' একটু থেমে টেনে টেনে নিশ্বাস নিল সে, 'এটা একটা সংকটকাল, কিন্তু তবুও আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। আচ্ছা, ঐ লি লোকটার কাছ থেকে কত টাকা তুমি তুলতে পারবে বলে মনে হয়? ও তোমার কি রকম আত্মীয়?'

'ওর নাম লি সুমু-ঈ, সোজাসুজি আমার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই। আমার কাকীমার বাড়ীতে যখন আমি ছিলাম তখন ওর সঙ্গে আমার এমনি একটু আলাপ হয়েছে। কাকীমার ইচ্ছা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেন। ও আমাকে শুধু আত্মীয় হিসাবেই জানে, আর কিছু নয়। আর আমার সঙ্গে খুব যে কথা বলে তাও নয়।'

ও হাসতে লাগল। বলল যে লোকটার ভাঁড়ামি ও ন্যাকামি অসহ্য ও বিরক্তিকর। লোকটার চেহারার একটু বর্ণনা দিয়ে শেষকালে আবার বলল, 'যাই হোক, ভাবনার কোন কারণ নেই। যদি একবার কোন রকমে টাকাটা তুলে আনতে পারি, তাহলে আর কি! একটা মুগ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করে ঠিকমত কৌশল প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চয়ই কার্যসিদ্ধি হবে।'

পর দিনই ও লাঞ্চ খেল লি সুমু-ঈ-র সঙ্গে, মদ পান করল একসঙ্গে, তারপর চাও কেঙ পার্কে গিয়ে গান শুনল বসে বসে। ওর গায়ে পুরু পাউডারের প্রলেপ, গালে হালকা ডালিম রঙের আভাস। অনবরত হাসছে ও, মুখখানা ফুলের মত অনবদ্য ও সুন্দর।

প্রবল চেষ্টায় লি সুমু-ঈ হাসিখুশি ও আমুদে করে তুলল নিজেকে। 'আজ রাত্রের চাঁদ কী সুন্দর!' তাই শান-এর টান তার কথায়। এই ধরনের আরও অনেক রোমান্টিক মন্তব্য শোনা গেল তার মুখে, প্রতিটি কথার

শেষে তার একটানা দীর্ঘনিশ্বাসটা শোনাল অনেকটা বিদ্রূপের মত। বারবার সে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'তুমি কি সুখী নও?' আজ তার বিবেচনা বুদ্ধি প্রখর, অত্যন্ত প্রখর। বেড়াবার সময় প্রতিবার সে অত্যন্ত ভদ্রভাবে নিজের মোটা হাতের বেড়টা বাড়িয়ে দিয়েছে ওর দিকে।

লি সুমু-ঈর বয়স প্রায় চল্লিশ। মাথার ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট গোল টাক। কিন্তু টাকের চারপাশে ঘন চকচকে চুলের অভাব নেই। চুলের মধ্যে ডান হাতের আঙুল চালানোটা তার একটা অভ্যেস। চিনি বা রবারের বাজার সম্পর্কে আলোচনা উঠলেই সে কৌতূহলী হয়ে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু মহিলাদের সামনে এই সব আলোচনা সে করে না। তার চোখ দুটো সব সময়েই আধ-বোজা এবং প্রায়ই সে আক্ষেপ করে বলে যে লোকে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। বিশেষ করে তার রাগ হয় যদি কেউ কথায় কথায় তার ছোট গোল ভুঁড়িটার কথা তোলে। তার নিজের ধারণা, সে এমন কিছু মোটা নয়, শুধু তার ভুঁড়িটাই সাধারণ মাপের চেয়ে বড়। এই অসম বৃদ্ধিটুকুর একটা কারণ হিসেবে সে বলে যে এটা বিয়ার খাবার ফল।

সাও হুবা আড়চোখে তাকাল তার দিকে। মুখখানা তেলতেলে, দাঁতগুলো উঁচু উঁচু। মনে মনে ভাবল, একদিন না একদিন ওর খুড়তুতো বোন পাও চেনকে ওই বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হবে, মুখের ওপর অনুভব করতে হবে ওই দাঁতগুলোকে। ভাবতেই কেমন মজা লাগল ওর।

'হাসছ কেন?' নরম গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি পাও চেনের কথা ভেবে হাসছিলাম—ও যদি আমাদের এই অবস্থায় দেখে তো হিংসেয় মরে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে আর অন্যমনস্কভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সে বলল, 'ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিল হয় না—আমাদের দুজনের প্রকৃতিটাই

আলাদা। কিন্তু তুমি—তুমি—আচ্ছা, আমার সম্পর্কে, তোমার কি ধারণা? তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

একটু হেসে তার হাতে একটু চাপ দিল ও—যাকে ও 'কৌশল' বলে, এটা তারই একটা প্রয়োগ। কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না।

ইতিমধ্যে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হাওয়ায় ওর সিল্কের গাউনটা এঁটে গেছে ওর পায়ের সঙ্গে। মদের ক্রিয়াও খানিকটা হয়েছে ওর ওপর। শরীরের যেন আর কোন ভার নেই, যেন ও মেঘের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাতাসে কেমন একটা সুগন্ধ, সেই সুগন্ধের মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ লেগে রয়েছে ওর জিভে। এটা কি ফুলের গন্ধ? না সবুজ ঘাসের? না কি সত্যিই কোন গন্ধদ্রব্যের? আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মুখের দিকে ও তাকিয়ে দেখল। প্রত্যেকেই আন্তরিক, প্রত্যেকেই প্রশান্ত। দুঃখ বা ব্যথা বলে কোন কিছু পৃথিবীতে নেই। উপবাসীর মত নিশ্বাস নিতে নিতে ও ভাবল, 'না, এই পৃথিবীটা যে সুন্দর, তা মানতেই হবে।'

এখন ওর চলনটা ঠিক পা ফেলে ফেলে হাঁটা নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আর মনের ভেতর কোথায় যেন একটা অকারণ হাসির দমক উঠছে। মুখের প্রতিটি কথার সঙ্গে ওর সমস্ত শরীর গুঞ্জন করে উঠছে যেন। একটু মাথানাড়া বা কাঁধতোলা, এই ধরনের অত্যন্ত তুচ্ছ অঙ্গভঙ্গীর ভেতরেও নতুন একটা আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে ও—লঘুপক্ষ হয়ে যেন ও ডানা মেলেছে অবাধ বিস্তৃতির ভেতর।

'এত দিন আমি জানতেও পারিনি যে সাংহাই এত বাস্তব, এত জীবন্ত।'

এক দল ছেলেমেয়ে মাঠের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, হৈ-চৈ করছে আর হাসছে। আজ ওর মনের ভাবটাও ওদেরই মত। অনেক সহজভাবে

আজ ও নিশ্বাস নিচ্ছে—মুখ থেকে হঠাৎ একটা মুখোশ খুলে গেছে যেন। যেন ও মুক্তি পেয়েছে,—শুধুমাত্র বেঁচে থাকার ভেতরেই যে সহজ আনন্দটুকু আছে তা আবার নতুন করে জেনেছে ও, জেনেছে যে পৃথিবীতে সব কিছুর অস্তিত্ব একমাত্র ওরই আনন্দের জন্যে, এমন কি এত মানুষের জন্মও এই একই উদ্দেশ্যে…

অন্ধকার হয়ে এল, একটা পাতলা মেঘের পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে চাঁদটা। বাতাস ঠাণ্ডা, বাতাসে সাঙ হবার পোষাক ওর শরীরের সঙ্গে এঁটে এঁটে যাচ্ছে।

লি সুং-ঈ হঠাৎ তার মাংসল হাতটা ওর কাঁধের ওপর রাখল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাস্তব চেতনাটুকু ফিরে এল আবার।

'তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসব ?'

স্কুল ! ও ভুলেই গিয়েছিল যে ওর সত্যিকার ঠিকানা বা লিয়েন ওয়েন-কানের সঙ্গে ওর আসল জীবনের কথা সে জানে না। ভেবেছে যে ও এখনো স্কুলে পড়ে।

তাড়াতাড়ি ও বলল, 'না, আজ আর স্কুলে ফিরব না। আমাকে কাকীমার বাড়ী পৌঁছে দিলেই চলবে, সেখানেই আমি রাত্রে থাকব।'

গাড়ীতে উঠবার পর ওর মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এল সে। 'যদি চিরকাল তোমায় সাহায্য করবার সুযোগ আমি পাই তবে বেশ হয়। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।'

কিন্তু ওর চিন্তাটা অন্য ধরনের, যদিও কোন কথা বলেনি। মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও ভেবেছে, 'আজ ওয়েন-কান থাকলে কী ভালই না হত!' কিন্তু চাঁদের দিকে তাকিয়ে সময় কাটানো ওয়েন-কানের স্বভাব নয়। আজকের সন্ধ্যাটা ও মনে করবে বিপ্লব-বিচ্যুত সময় ও অর্থের অপব্যয়। নিজের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে লি-র কাছে কোন কথা

ও বলেনি : আচ্ছা, কালই না হয় বলা যাবে। তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ও মনে মনে একটা মিথ্যে গল্প বানাতে বসল,—এমন একটা গল্প যা অত্যন্ত কার্যকরী হবে। আচ্ছা, একথা তো বলা যায় যে একটা জিনিস (অত্যন্ত জরুরী !) কিনবার জন্যে ওর কিছু টাকা দরকার, বা ওর কিছু ধার আছে? যাক্ গে, পরে ভাবলেও চলবে। চোখ বুজল ও।

'অন্তত আজ এই একটি দিনের জন্যেও আমি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পেয়েছি।'

কিন্তু ও জানে, এই স্বাধীনতা মিথ্যে, ওর নিজের চেয়েও বৃহত্তর কোন ঘটনাশক্তির নির্দেশে শেষ পর্যন্ত অভিনীত এক নাটকের সামান্য অংশমাত্র। এই বৃহত্তর শক্তির কাছে ও নিজে অণু পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর ; আর যে আনন্দ আজ ও পেয়েছে তা তো একটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও অবাস্তব। যে ভাঙাচোরা শ্রীহীন ঘরে ওকে আবার ফিরে যেতে হবে, যে গোপন কাজে একই উদ্দেশ্যে ওর সঙ্গে আরও অনেকের সহযোগিতা—তার পেছনে যেমন একটা লক্ষ্য আছে, তেমনি প্রাণও আছে। এই তো জীবন, এখানেই তো জীবনের সার্থকতা··· সংগ্রাম।

৩

আবার সন্ধ্যা হল। আকাশে সেই একই চাঁদ, কমলালেবুর কোয়ার মত চাঁদটা আর একটু বড় হয়েছে। ক্ষুদে হু-র ঘরের ভেতর অনেক লোক, সাঙ হ্বাও একজন। বিছানা থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ও

বসেছে, হু-র মুখের দিকে তাকাবার সাহস ওর নেই। অনবরত কাশছে সে, কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কাশতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নিজের হাতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও, দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

'ওর দিন হয়ে এসেছে', কে যেন ফিসফিস করে বলল।

রোগজীবাণু ধ্বংস করবার জন্যে কি একটা ওষুধ ঘরের চারদিকে ছড়াচ্ছে লিয়েন ওয়েন-কান। ক্ষুদে হুকে আধশোয়া অবস্থায় তুলে ধরল সু আ, ইয়ে সিন ধরল তার চিবুক। নিজের শক্তিতে উঠে বসবার শক্তি পর্যন্ত তার আর নেই। এখন সে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে কাশতে শুরু করেছে, প্রত্যেকবার কাশির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠে আসছে মুখে। তার নাক আর চিবুকের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না—পুরনো পচা লাক্ষার মত বিবর্ণতা ফুটে উঠেছে। মুখের বাকি অংশ মোমবাতির মত ফ্যাকাশে। চোখ দুটো বোজা, মুখের মাংসপেশী একটুও নড়ছে না। কাশি উঠলেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে শরীরটা কিন্তু কথা বলবার একটা প্রবল ইচ্ছা তার রোগকষ্টকে জয় করল—ভয়ংকর রকমের জরুরী একটা কিছু যেন তার বলবার আছে। ঠোঁট দুটো নড়তে লাগল, ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় কি যেন বলতে চেষ্টা করল সে।

'কথা বোলো না, একটু চুপ করে শুয়ে থাক।'

হঠাৎ সাঙ হুবা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মূর্চ্ছারোগগ্রস্তের মত। আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল সবাই। 'এ দৃশ্য আমি দেখতে চাই না,' কাঁদতে কাঁদতে বলল ও, 'এইভাবে তিলে তিলে মৃত্যু...'

'কমরেড লিয়েন, ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস।' দলের মধ্যে থেকে একজন আদেশ দিল।

লিয়েন ওয়েন-কান যখন ওর হাত ধরল তখন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও আর

ওর নেই। খানিকটা টানতে টানতে আর খানিকটা তুলে ধরে ওকে বাইরে নিয়ে এল সে। গলার মাংসপেশীতে কেমন একটা টান ধরেছিল—সে জায়গাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল ও। হোঁচট খেতে খেতে আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ওর আতঙ্কটা কেটে গিয়ে একটা নৈরাশ্যবোধ এল।

'কেন? উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন গলায় ও বলল, 'কেন এমন হবে? কেন আমাদের জীবন এই রকম? এত নিরানন্দ, এত বিপজ্জনক, এত দুঃখপূর্ণ, আর মৃত্যুর এত কাছাকাছি?'

ওর হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে লিয়েন ওকে থামতে বলল।

'কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? নিজের জীবনের মূল্যে কী পেল ও? আর এই যে ওর মৃত্যু—অনেক দিনের অনেক ছোটখাটো দুঃখকষ্ট জড়ো হয়ে হয়ে একটা মহৎ যন্ত্রণায় রূপান্তর—এর নাম কি মৃত্যু? তোমার মনে পড়ে কিছুকাল আগেও ও ছিল কত প্রাণবন্ত, কত উচ্ছল? আর এই এক কাল অসুখে ও শেষ হয়ে গেল। না হলেও প্রায় সেই রকমই অবস্থা—'

'চুপ করো! তুমি কি মনে করো যে আমরা একথা ভাবি না? একটু স্থির হও। নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করো।'

বাড়ী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটে গিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। টান করে বাঁধা দড়ির মত মনে হচ্ছে নিজেকে, ফুলে ফুলে উঠছে বুকটা। ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল লিয়েন।

'এ পথের শেষ কোথায়, ওয়েন-কান?' অশ্রুভরা গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ো পন্ তু-র কথা মনে আছে তো? সেই দুর্দিনের কথা মনে করো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও ঠিক এইভাবেই মরতে হয়েছে। সুখী জীবন দাবী করবার অধিকার কি মানুষের নেই?'

বিছানার ওপর বসল লিয়েন, কিন্তু ওর দিকে তাকাল না। ওর বুকের

স্পন্দন সে শুনতে পাচ্ছে। কান্নার আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁপে উঠছে ও, এই কাঁপুনিটুকু নিজের শরীরে অনুভব করতে পারছে সে। ঝুঁকে পড়ে মাথাটা ও এলিয়ে দিল তার কাঁধের ওপর।

'সুখ?' অবশেষে বলল সে, 'তার মানে কি এই যে রেশম পোকার মত নিজেকে গুটিয়ে রাখা? তুঁতগাছের পাতা থাকলেই যথেষ্ট, পৃথিবী চুলোয় যাক না কেন? কিন্তু আমরা তো আর গাছের পাতা নই বা পোকাও নই। আমরা মানুষ, এইভাবে বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যে বিশ্বাস করি, প্রকৃত সুখকে প্রত্যেকের জীবনে সম্ভব করে তুলতে হবে—তার কারণ কি এই নয়?

নিজের বিরক্তিকে সংযত করবার চেষ্টা করল ও, এবং সেই চেষ্টায় গলার স্বর হয়ে উঠল আস্বাভাবিক। 'মাঝে মাঝে একটা কথা আমার মনে হয়। কত বছরই বা মানুষের জীবন? সুতরাং স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করে লাভ কি?'

লিয়েন প্রতিবাদ করতে চাইল।

'শোন', বাধা দিয়ে বলল ও, 'আমরা মানুষ বলেই পথের এত বাছবিচার করি। সে অধিকারও আমাদের আছে। দুঃখের পথকে কেউ গ্রহণ করে না, করে কি? মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রচুর আলো না হলে আমি বাঁচতে পারব না, খোলা আকাশের তলায় প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে হবে আমাকে। আর চাই সুখ, সহজ সাধারণ সুখ। কোথায় আমাদের জীবন?—আত্মগোপন করে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের—খোলা বাতাস আর উদার সূর্যালোককে যেন আমরা স্বেচ্ছায় অস্বীকার করছি।'

বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ওয়েন-কান ক্লান্ত গলায় উত্তর দিল, 'স্বাধীনতাকে যদি বাস্তব করে তুলতে হয় তবে পুরনো বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করতেই হবে আমাদের। কিন্তু

এসব কথা তো তুমি জান, তুমি নিজের চোখেই এসব জিনিস দেখেছ।'
সাও হুয়া মাথা তুলল, তারপর ঠোঁটটা বাড়িয়ে দিল ওর চিবুকের কাছে।
'হ্যাঁ, ওসব কথা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে স্বাধীনতার কথা বলছ, তা কি আমাদের এই জীবনেই সম্ভব হবে?
'যদি আমরা না পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এসে করবে। যতদিন তা না হয় একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে আমাদের।' একটু ঝুঁকে সে ওকে শুধু একবার আলিঙ্গন করল, 'আচ্ছা, আজকের মত এখানেই থামা যাক, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কাল তোমার সঙ্গে সব কথা খুব ভাল করে আলোচনা করব।'
পোষাক খুলতে ওকে সে সাহায্য করল, তারপর ও মিলিয়ে গেল বিছানার ভেতর। ক্ষুদে হু-র বাড়ীর দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াল ওয়েন-কান। হঠাৎ ও তার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'হয়ত তুমি ঠিক কথাই বলেছ, হয়ত আমার মাথার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে—আচ্ছা, থাক ওসব কথা। আমার সম্পর্কে তোমার ঠিক কি ধারণা তা কাল তোমার মুখে আমি শুনতে চাই।'
শুয়ে শুয়ে ও লক্ষ্য করতে লাগল: আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল সে। কান পেতে শুনল সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তার পায়ের শব্দ। তারপর যখন সেই শব্দও মিলিয়ে গেল, কেমন একটা ভয় আবার পেয়ে বসল ওকে। একটু পরে ওর মনে হল, কে যেন ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাফিয়ে উঠে আলো জ্বালল স্থইচ টিপে, ডাকাডাকিও করল দু-একবার। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। তখন ওর কোন সন্দেহই রইল না যে দরজার বাইরে 'কালোকোর্তা'টার১ কাণ্ড এটা। ক্লান্ত হয়ে ও বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার।

১ সরকারী গুপ্তচর।

'না, আমি পারব না, এ আমার কাছে অসহ্য,' হঠাৎ জোরে চিৎকার করে উঠল ও, 'একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় কত বড় বোকামির কাজ এটা। মাত্র কয়েক বছরের তো জীবন, তাকে বিসর্জন দিতে হবে এমন একটা আদর্শের জন্যে যা হয়ত জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না, এমন কি সেই সার্থকতার পথই হয়ত এটা নয়...'

পরদিন খুব ভোরে, ওয়েন-কান আসবার আগেই, ও পার্টির কাছে এক মাসের ছুটি চেয়ে একটা চিঠি পাঠাল তার কাছে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে চামড়ার ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল কাকীমার বাড়ী।

৪

যদিও ভালবাসার লোক হিসেবে লি স্যু-ঈ যে খুব কাম্য তা নয়, কিন্তু কতগুলো গুণ আছে তার। যেমন বলা যেতে পারে, সাঙ হুবার সামান্যতম ইচ্ছাও পূরণ করবার জন্যে সে অত্যন্ত তৎপরতা ও উদারতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। ওকে খুশি করবার জন্যে তার কী অপরিসীম ব্যস্ততা! ও জানত, ওর প্রতি লি স্যু-ঈর এই মনোযোগ তার কাকীমা প্রীতির চোখে দেখবেন না, কারণ তাঁকে দেখে মনে হয় যে তিনি এমন একটি ভাবী জামাতাকে হারাবার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কমরেড সাঙের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। কর্মব্যস্ততার ভেতরে যে কটা দিন ছুটির ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছে তা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবার অধিকার ওর আছে।

আন্তরিকভাবেই ও খুশি হয়ে উঠল।

মনের আনন্দে এখন ও পাউডার মাখছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে প্রসাধন

করবার জন্যে। নিজেকে ও ছেড়ে দিয়েছে আমোদপ্রমোদের ভেতর। প্রতিদিন রাত্রে বেরোয় লির সঙ্গে, আর যখন ফিরে আসে মুখে মদের গন্ধ এবং নেশাটাও কম নয়। দিনের বেলায় লির নতুন গাড়ীতে চেপে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। পড়বার মধ্যে পড়ে রোমান্টিক গল্প আর সিনেমা-বিজ্ঞাপন।

দু সপ্তাহ দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। একদিন লির গাড়ীতে বাড়ী ফিরে ও দেখল ছোট খুড়তুতো ভাইটা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে; মেজাজটা ভারিক্কী, কি একটা সংবাদ আছে দেবার।

'লিউ নামে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' ছেলেটি বলল।

লিউ! লিয়েন ওয়েন-কানের আরেকটা নাম লিউ। ও জিজ্ঞেস করল, 'ও কিছু লিখে রেখে গেছে?'

'না। শুধু বললেন যে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তবে এমন বিশেষ কিছু দরকারী কাজ নয়।'

সাঙ হুবা ভুরু কোঁচকাল, তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল নিজের ঘরে। হঠাৎ লজ্জিত বোধ করছে ও, লিয়েন ওয়েন-কানের দীর্ঘ ঋজু মূর্তি ও সুন্দর গম্ভীর মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। হয়ত সে এসেছিল ওকে ধিক্কার জানাবার জন্যে। কিংবা, কোন জরুরী সংবাদ নেই তো? লিয়েনের পেছনে পুলিশ লাগতেও তো পারে? ভাবতেই ও কেঁপে উঠল। হয়ত ওরা ওর ওপরেও নজর রেখেছে। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ও। উষ্ণ তকতকে ঘর, দামী কাঠের আসবাব, বন্যার মত ঝলমলে আলো। দেখে নিশ্চিন্ত ভাবটা ফিরে এল আবার। এখানে কোন গুপ্ত ইস্তাহারও নেই বা বেআইনী বইও নেই। সব কিছু নিষ্কলঙ্ক ও আইনসম্মত, সব কিছু সুন্দর ও সুস্থ। হঠাৎ মনে পড়ল, ক্ষুদে হু ও

অন্যদের কথা যারা খাটছে এবং কাজ করছে। পার্টির অনুমোদন না নিয়ে এভাবে চলে আসা ওর উচিত হয়েছে কি ?

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কাকীমা ওর ঘরে ঢুকলেন। মুখে রূপোবাঁধানো নল, ধূমপান করছেন তিনি। নানা অবান্তর কথা আলোচনা করতে করতে ক্রমে ওর স্কুল-বন্ধুদের প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন। বুঝিয়ে বললেন, সঙ্গী নির্বাচনে কত সতর্কতার প্রয়োজন। কিন্তু সাঙ হুবা উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে ; 'লিউ' নামে যে যুবকটি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাকে দেখে একথাই মনে হয়েছে তাঁর।

'ও তোমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, না ?'

'হ্যাঁ, আমরা দুজনে কমরেড।'

কথাটা শুনে বৃদ্ধা মহিলার সোনা বাঁধানো দাঁতগুলো ঝলসে উঠল, এবং কমরেডের রূপগুণের দীর্ঘ প্রশস্তি শুরু করলেন তিনি। যুবকটি যে রূপবান তাতে কোন সন্দেহ নেই, কথাবার্তায় চমৎকার, অত্যন্ত সহজেই মনকে জয় করে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে হলে (ওর কথা শুনেই তিনি বলছেন), ওর পরিচিতদের মধ্যে এই যুবকটিই সমস্ত দিক থেকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। আরও সূক্ষ্ম ও কার্যকরী স্তুতিবাদের ভাষা মনে মনে তিনি খুঁজতে লাগলেন এবং ভাসুরঝির মুখের হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সাঙ হুবা হাসল, যেন ও খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু মনে মনে ভাবল, 'মনে কোরো না যে আমার কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারবে। দেখে নিও, লি সুসু-ঈ লোকটাকে আমি এমনভাবে আঁকড়ে থাকব যেন তোমার খপ্পরে গিয়ে না পড়ে।'

কাকীমা চলে যাবার পর মোজা দুটো ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মনে মনে আবার বলল, 'হ্যাঁ, লোকটার পেছনে লেগে থাকতে হবে।'

কিন্তু এদিকে আর মাত্র ছ সপ্তাহ বাকী, তারপরেই ফিরে যেতে হবে ওকে। আবার সেই কাজ, সেই বিপ্লব, সেই গুপ্ত জীবন। সেখানে গেলে ওর স্বাতন্ত্র্য বলে আর কিছু থাকবে না; গণচেতনায় মূর্ত আন্দোলনের ভেতর ওর অস্তিত্ব একটা পরমাণুর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সেখানে ব্যক্তির সার্থকতা শুধুমাত্র সচেতন চিন্তায়, আর সেই চিন্তার উৎস একক আত্মস্বাতন্ত্র্য নয়—এক অসীম অনন্ত প্রাণকেন্দ্র। অন্যান্য কমরেডদের মত আবার ওকে সতর্কভাবে জীবন যাপন করতে হবে—সতর্কতা শুধু রোগের বিরুদ্ধে নয়, জুলুমের বিরুদ্ধেও। গ্রেপ্তার, কারাবাস, কিংবা তার চেয়েও খারাপ, অসহ্য অত্যাচারে হয়ত ওর নরম পা আর শরীর ভেঙে পড়বে একেবারে।

'বেঁচে থাকতে যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যুতেও তাই!'

কেন ও ফিরে যাবে? এমন তো নয় যে ওকে না হলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যে জন্যেই হোক এই সব কাজ ওর নিজেরও আর ভাল লাগছে না। কিন্তু ও যদি এসব কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে ওকে কী ভীষণ ঘৃণার চোখেই না ওরা দেখবে! ওর সম্পর্কে মন্তব্যগুলো পর্যন্ত যেন ও এখন থেকেই শুনতে পাচ্ছে: 'সাঙ হুবা কিনা পেটমোটা চিনির দালালটার কাছে নিজেকে বিক্রী করল? কী কাণ্ড!' ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে নিজেকেই নিজে বলে উঠল যে ওদের সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা এখন না করাই উচিত ওর। বেশী দিন না হোক, অন্তত আরো ছ সপ্তাহের জন্যে! আর এখনো…

'ওরা কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?' নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল ও, 'যদি আমি ছেড়ে দিই? লিয়েন ওয়েন-কান কি ক্ষমা করবে?'

হয়ত ওরা ইতিমধ্যেই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই যদি হয় তো ভাল। 'ভাল!' যেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এমনি সুরে

শব্দটা ও উচ্চারণ করল। যেন ও নিজের মনে এই বিশ্বাসটাই দৃঢ় করতে চায় যে ঘটনাটা সত্যি। কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে রইল ও, মুখের ভাবে ভীষণ একটা বিহ্বলতা।

তারপর ও ঢুকল টালি-ঢাকা বাথরুমে, দাঁড়াল লম্বা একটা আরসির সামনে। প্রথমে তাকাল নিজের মুখের দিকে, সেখান থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল ওর দেহের নরম রেখাপথ ধরে। মেঝে থেকে শুরু করে মাথার চকচকে চুলের গুচ্ছ পর্যন্ত বিচিত্র সব রেখা রেশমের মত ওর দেহকে জড়িয়ে ধরেছে। থমকে-থাকা বৃত্তাংশের মত নিতম্বদেশের একটা ভঙ্গী সৃষ্টি করল ও, হাত দুটোকে মাথার ওপর তুলে ধরল মনোরম ভঙ্গীতে—তারপর কয়েক মিনিট চিন্তাশূন্যভাবে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আপন দেহসৌষ্ঠবের দিকে—এমনিভাবেই ও কোন আশ্চর্য শিল্প-কর্মের দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারত।

'এসব কিসের জন্যে?' হঠাৎ ও নিজেকেই প্রশ্ন করে বসল।

নরম আর গোল দুটি কাঁধ, উদ্ধত স্তনযুগলের মারাত্মক সৌন্দর্য, হাতীর দাঁতের মত শুভ্র ও দৃঢ় দুই উরু পর্যন্ত ঝলসে-ওঠা দ্রুত রেখাপাত! এই অপরূপ সৌন্দর্য-সম্পদ যদি অন্ধকারের আড়ালেই থাকে বা সম্পূর্ণ অর্থহীন কোন দুঃসাহসিকতায় বিপন্ন হয় বা নিপীড়িত হয় বর্বরোচিতভাবে—তবে তা কি এই নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবের প্রতি, ওর নিজের প্রতি, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি অবিচার হবে না? আপন দেহের এই বিস্ময় ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে—ও ভুলেই গিয়েছিল কী আশ্চর্য সুন্দর ওর দেহ। মুখের ওপর হাত ঢাকা দিতেই ও বুঝতে পারল কপালের রগ দুটো দপ দপ্ করে লাফাচ্ছে। আর একবার আরসির দিকে তাকাতেই ওর দেহের সেই আশ্চর্য রেখাপাত ওকে মুগ্ধ করল—স্তন থেকে উরু পর্যন্ত উদ্ধত রেখা, দীর্ঘ গানের সুরের মত। সৌন্দর্যের এই বিশেষ

রূপটিকে শিল্পতত্ত্বের পরিভাষায় টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করতে লাগল ও।

'টুকরো টুকরো?' একবার যদি ওর ওপর জুলুম শুরু হয় তবে কতগুলো টুকরোয় ভেঙে পড়বে ওর শরীর? কল্পনা করেই কেঁপে উঠল ও।

মুখটা জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে জল ছিটোল মুখে। প্রথমে গরম জল, তারপর ঠাণ্ডা। মুখের পাউডার, ক্রীম, লিপস্টিক ও অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য পরিষ্কার হয়ে গেল ধুয়ে মুছে, একেবারে সাধারণ হয়ে উঠল গোলাকার মুখটা। মেয়ে-শ্রমিকদের ভেতর সংগঠনমূলক কাজ করবার সময় এই রকমই দেখাত ওর মুখ—কোন রকম প্রসাধনের প্রলেপ থাকত না, এমন কি কামানো ভুরু দুটোকে পর্যন্ত মনে হত নেড়া নেড়া। নিজের দিকে আর একবার তাকাল ও, আর একবার মনে পড়ল ওর কমরেডদের কথা আর ওদের সেই বড় বড় স্বপ্নের কথা। হঠাৎ ও কেমন লজ্জিত হয়ে উঠল আর নিজের লজ্জা দেখে নিজেই চটে উঠল মনে মনে।

একটা কিছু ভেঙে চুরমার করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর, যেন প্রতিবাদটা শারীরিক শক্তি-প্রয়োগের রূপ নেয়। ওদের দল ছেড়ে কেন ও চলে আসতে পারবে না? হঠাৎ মনে হল, চোখের সামনে লিয়েন ওয়েন-কানকে ও দেখতে পাচ্ছে। দেখেই ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'ভাল হোক আর মন্দ হোক, একবারমাত্র জীবন পেয়েছি—সুতরাং আমার কাছে জীবনের পথও একটি। একথা শুনে হয়ত তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। ইচ্ছা হয় তো কোরো। কিন্তু আমি চাই না যে আমার এই দেহ বিপন্ন হোক বা এই দেহের ওপর কোনরকম পীড়ন চলুক। আমি তা সহ্য করতে পারব না!'

খুশিমত পথে চলবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। ওর থাকবে না কেন?

বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। বুকের ভেতরটা দপ্ দপ্ করছে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে কপালের রগ দুটো। হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে বরফের মত, গরম মুখের ওপর রাখল হাত দুটো। কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে ও পৌঁছতে পারছে না; একটি চিন্তার পেছনে অন্য চিন্তা এসে সৃষ্টি করছে পরস্পরবিরোধী মতামত। অবশেষে ওর সমস্ত ক্রোধ জড়ো হল লিয়েন লোকটির ওপর।

পাশের ঘরে কাকীমা তাঁর মেয়ে পাও চেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কাকীমা একটু উচ্চকণ্ঠ হতেই তাঁর কথাগুলো শুনতে পেল ও। সাঙ হবার প্রতি লি স্সু-ঈর মনোযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি অনুযোগ করছেন বলে মনে হল।

'ও, তাহলে পাও চেন এখনো নিজেকে বিক্রী করতে রাজী আছে।' মনে মনে ভাবল ও, 'মনে হয় না করবে। মোটা মোটা বুড়োগুলোর কাছে তরুণী মেয়েদের আত্মবিক্রয় করা উচিত নয়। হুম্, লি স্সু-ঈ যাতে আর এগোতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করব।'

কিন্তু কি করে ও বাধা দেবে? নিজেই লোকটিকে গ্রহণ করবে? বিয়ে করবে তাকে? কথাটা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেকগুলো মোটা মোটা ভুঁড়ি ও উঁচু উঁচু দাঁত। যেন দেখল, লি স্সু-ঈ মাথা চুলকোচ্ছে অন্যমনস্কভাবে, কানে আসছে তার সেই একঘেয়ে ভারী গলা, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলার যেন আর শেষ নেই। সম্পূর্ণ মানুষটির কথা চিন্তা করলে যেন মনে হয় যে এক দাগ বিস্বাদ ওষুধ গিলতে হচ্ছে। ঐ বেঁটে বেঁটে থপথপে হাতের আলিঙ্গনে

নিজেকে ধরা দেওয়া এবং ঐ গোলগাল ভুঁড়িটার ওপর নিজেকে পিষ্ট হতে দেওয়া……বিস্বাদ ওষুধ।

তারপর পাঁচ-ছ দিন ওয়েন-কান এবং অন্যান্য কমরেডদের কথা ভেবে ভেবে নিজের বিবেকের কাছেও কৈফিয়ৎ দেবার মত কিছু থাকল না ওর। কেমন মন-মরা হয়ে রইল সব সময়ে। ওকে নিয়ে ওদের ঠাট্টাবিদ্রূপ ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যেন, টাকাপয়সাওলা গাধাটার প্রতি ওর অনুরাগ দেখে ওরা যে কৌতুকের হাসি হাসছে তাও যেন ওর কাছে গোপন নয়। ওয়েন-কানের বিদ্রূপাত্মক হাসিটা চোখের সামনে যখনই ভেসে ওঠে, মনে মনে ও শুধু বলে, ওরা ওকে বুঝতে পারছে না। এমন কি, লি স্যু-ঈর প্রতিও কেমন একটা সহানুভূতির ভাব আসতে লাগল ক্রমে ক্রমে। এই সংসারের বিরুদ্ধে লি স্যু-ঈরও ভীষণ একটা অভিযোগ আছে, হয়ত একথা সত্যি যে খুব কম লোকেই লি স্যু-ঈকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে।

অবশেষে ও স্থির করল, লিয়েন ওয়েন-কানের সঙ্গে এই বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলবে।

বাড়ীটার সামনে পৌছে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ও। মইয়ের মত সিঁড়িটা দিয়ে ঘরে যাবার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল নিজেকে শান্ত করবার জন্যে। কি ভাবে কথা শুরু করবে, তাও ভেবে রাখল মনে মনে। পরিচিত ঘরটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত মুখ, এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল :

'কি চাই ?'

'মিঃ লিউ……মিঃ লিউ নামে এখানে কেউ থাকেন ?'

'না, না, লিউ-ফিউ এখানে কেউ নেই।'

তাড়াতাড়ি নেমে এসে ও হাঁটতে শুরু করল। মনের ভেতর কেমন

এটা অস্বস্তিকর অনুভূতি—কে যেন ওর ওপর দৃষ্টি রাখছে, কে যেন পিছু নিয়েছে ওর।

কিন্তু তবুও ও খোঁজখবর করা ছাড়ল না। পুরনো কমরেডদের মধ্যে কোন একজনকে খুঁজে বার করবার জন্যে ঘুরতে লাগল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। প্রত্যেকেই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে, আর সর্বত্র সন্দেহের দৃষ্টি পড়ছে ওর ওপর। অবশেষে ওয়াঙ চাও-তির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর, পুরনো যুগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। কিন্তু ওকে দেখে সে বিশেষ খুশি হল না, এবং অত্যন্ত নিরুৎসুক ভঙ্গীতে ওর বক্তব্যটা শুনল। আর প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সংক্ষেপে এড়িয়ে-যাওয়া-গোছের দু-একটা কথা বলল মাত্র। ভীষণ রাগে তার ঘাড়টা আঁকড়ে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল ও, তারপর তার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে কাঁপা গলায় ফুঁসে উঠল ঃ

'চাও-তি, আমি কি তোমার চোখের বিষ? কোথায় থাকে ওয়েন-কান? বলছ না কেন? আমাকে তোমার ভয় কি? বলবে না, ও কোথায়? ওর সঙ্গে আমার একটা জরুরী দরকার আছে, দেখা হওয়াটা বিশেষ দরকার।'

ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে ওর দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল সে।

'আমি সত্যিই জানি না।'

হঠাৎ ওর একটা অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা হল, লোকটাকে মেরে ধরে খবরটা বার করে নেয়। তারপর ভাবল, লোকটাকে জড়িয়ে ধরবে, পেছনে লেগে থাকবে, কাঁদবে, ভিক্ষে চাইবে—যেন সে চলে না যায়। কিন্তু কিছুই করল না ও, নিঃশব্দ আক্রোশে ফুঁলতে ফুঁসতে তার দিকে তাকাল কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর চোখের জল চেপে চলে গেল সেখান থেকে।

'আমার আর কোন দোষ নেই,' মনে মনে বারবার বলতে লাগল ও, 'ওরাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার আর কোন দোষ নেই।'

তিন দিন পর আর একবার ও চাও-তির সঙ্গে দেখা করে লিয়েন ওয়েন-কানকে দেবার জন্যে একটা চিঠি দিল তার হাতে। প্রায় তিন হাজার অক্ষরের চিঠি, ভারী মোটা প্যাকেটটায় শক্তভাবে 'স, হ' নামাঙ্কিত শিলমোহর আঁটা।

এই চিঠি লিখতে দু রাত্রি লেগেছে ওর।

প্রথমে ও শুরু করেছে অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজের স্বভাব ও মেজাজের বিশ্লেষণ করে। ওর মতে, কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ওর আছে যা অন্য কোন মেয়ের ভেতর নেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিপ্লববাদী কাজের সঙ্গে ও ঠিক খাপ খায় না, ওর জীবনদর্শনের সঙ্গে সংগ্রামের আবহাওয়াটা বেমানান। ওর জীবনদর্শনটা যে কি, তাও ও ব্যাখ্যা করেছে: নিজের খুশিমত স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো। ও বুঝতে পেরেছে যে, একটিমাত্র জীবন মানুষের এবং সেই জীবনটা কি ভাবে কাটল তাই নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষ একদিন মাথা ঘামাবে—এই ঐতিহাসিক বিশ্বাসের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে কেন জানি ওর মনে হয় না। কিন্তু ওর জীবনদর্শনের সঙ্গে কর্মজীবনের এই বিরোধের কথা না তুলেও কি বলা যায় না যে ওরাই ওকে প্রথমে পরিত্যাগ করেছে? কোনদিন কি ও ঘুণাক্ষরেও বলেছে যে ও মুক্তি চায়? কোনদিন কি এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এমন বিশ্বাস হতে পারে যে ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে? কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, এখন ও শুধু চায় যে ওর জীবনদর্শনটা ওরা বুঝুক। একথা সত্যি নয় যে মৃত্যুকে ও ভয় করে—আসলে জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ওর। চিঠিটা ও শেষ করেছে লিয়েন ওয়েন-কানকে সাবধানে চলাফেরা করবার জন্যে

বারবার অনুনয় করে, এবং কথা দিয়েছে যে তাকে চিরদিন মনে রাখবে, এমন কি তার যদি আপত্তি না থাকে তবে দুজনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকেও অটুট রাখতে ও ইচ্ছুক।

কিন্তু চিঠিটা লিখেও সাও হ্বা সুখী হয়নি। বারবার মনে পড়েছে ওয়েন-কানকে আর বারবার ভেবেছে, আর ওকে দেখতে পাব না? কোন দিনও নয়?

আর তবুও ওর জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। কাকীমার বাড়ীতে এভাবে দিন কাটানো আর সম্ভব নয়—পাও চেনের ঈর্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিজের ঐ ভাঙা ঘরে কিছুতেই ও ফিরে যাবে না। পুরো একটা মাস সম্পূর্ণ নিজের করে নিয়ে ও এসেছিল,—এর ভেতরেই কোন একটা পথের সন্ধান করতেই হবে ওকে।

মনে হল, অনন্তবিস্তৃত সমুদ্রের ওপর অসহায়ভাবে ও ভেসে চলেছে, কোন দিকে তীরের চিহ্নমাত্র নেই। একদিন যেখানে ও জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিল সেখান থেকে যখন চলে আসতে হল, তখন পথ বা লক্ষ্য বলে আর কিছু রইল না, হারিয়ে গেল পথের ঠিকানা, ভেসে ভেসে চলল উদ্দেশ্যহীনভাবে…

মনের এই অবস্থায় ও দেখা করল লি সুস্-ঈর সঙ্গে।

আর একবার ও তাকাল তার মাথার ছোট্ট গোল টাকটুকুর দিকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল তার তেল-চকচকে হৃষ্টপুষ্ট মুখখানা, স্থির দৃষ্টিতে দেখল সেই উঁচু উঁচু বিশ্রী দাঁতগুলোকে। নিজেকে ও বোঝাল যে এসব ছোটখাটো ত্রুটি মাত্র, খাঁটি প্রেম যে কোন লোককে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর মনে মনে বারবার আবৃত্তি করতে লাগল একটা কথা—'আমি ওকে ভালবাসি, ভালবাসি ওকে আমি।' কিন্তু তবুও যখন তার বাহুবন্ধনের ভেতর ও ধরা দিল, তার প্রকাণ্ড মুখখানা

নেমে এসে ঢেকে ফেলল ওর মুখকে, তার নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল ওর কানের কাছে—কিছুতেই মনের ভেতর থেকে এই ভাবটা ও দূর করতে পারল না যে একটা বিস্বাদ ওষুধ ওকে যেন গিলতে হচ্ছে, এ যেন নিজের বিরুদ্ধেই নিজের কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।

'উঃ!'

সে প্রস্তাব করল, 'সাঙ হ্বা, আর দেরী না করে এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি—আমার নানিয়াঙ যাবার আগেই বিয়েটা হয়ে যাক! কি বলো?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও বলল, 'এ বিষয়ে আমার কোন মতামত নেই।'

ক্ষুধার্তভাবে ও ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, এবং ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে রইল কয়েক মিনিটের জন্যে। সরে যাবার পর দেখা গেল, তার মুখটা লাল হয়ে গেছে এবং হাঁপাচ্ছে সে। আবেগভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, একটা সুখানুভূতির দ্যুতিতে আবিষ্ট হয়ে উঠল চোখ দুটো। মোটা হাতটা নিজের অজান্তেই উঠে এল মাথার চুলের কাছে।

হঠাৎ একটা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সাঙ হ্বা।

'আরে, ব্যাপার কি?' আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'হল কি তোমার?'

অনেকক্ষণ পরে ও মাথা তুলল, চোখের জলের দাগ সারা মুখে। কিন্তু তবুও জোর করে একটা মনোরম হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখের ওপর, এবং তার গালে গাল ঠেকিয়ে বলল:

'কিছু না। আজ আমি কী সুখী!'

শ্রীমতী লি সুয়্-ঈর মুখর গ্রীষ্মনিবাসের সম্মুখস্থিত লেকের রূপ নরম অকাশের তলায় ম্লান হয়ে আসছে। জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রির পটভূমিকায় নৌকো ভাসছে দু-একটা, একটা বিষণ্ণ কুহকের ছোঁয়া লেগেছে চারদিকে।

জানলার সামনে বহুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে সাঙ হুবা, দিদির কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। হঠাৎ লেকের বাতাসটা জোরালো হয়ে উঠল, চারণ-কবির গান ঘরের ভেতর ধাক্কা দিল যেন। বিষণ্ণ যাত্রাগানের সুরে গান গাইছেন কবি। বারবার এই একই গান কেন? গানটা শুনে ওয়েন-কানের কথা মনে পড়ছে ওর। কেমন আছে ও?

'তুমি কি ওর কাছ থেকে দু-একদিনের মধ্যে কোন চিঠি পেয়েছ?' দিদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'কার কাছ থেকে?' চমকে উঠল সাঙ হুবা।

'কেন, তোমার স্বামীর কাছ থেকে।'

'ও!' লাল হয়ে উঠল সাঙ হুবা, 'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিল ও, কী অপরূপ ওর গ্রীবাভঙ্গী! তারপর দিদির কাছে এগিয়ে এসে ও তাকাল তার দিকে—মুখে সেই হৃদয়জয়ী হাসি যে জন্যে ও বিখ্যাত; মহিয়সী মহিলার মত নরম গলায় বলল:

'চল দিদি, চাঁদের আলোয় একটু নৌকো চড়ে আসি। দুজনের জন্যে দু বোতল মদও সঙ্গে নেওয়া যাবে, কি বলো? এসো, এসো। চমৎকার নেশা জমানো যাবে আজ।'

তিং লিং

পাতলা গাছের সারিটা পার হলেই বিস্তৃত প্রান্তর, তার ওপাশে শান্ত ও নিভৃত পশ্চিম উইলো গাঁ। গাঁয়ের প্রান্তে উইলো গাছের নেড়া নেড়া ডালগুলো শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রবলভাবে দুলছে। গাছগুলোর তলায় একটা বাড়ীর উঠোনের শাদা চুণকাম করা দেওয়ালটা কেমন যেন বিবর্ণ। পাণ্ডুর রঙটা শীতকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে; চারপাশের আবহাওয়ায় মৃত্যুর থমথমে স্পর্শ অনুভব করা যাচ্ছে যেন।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা পুরনো অন্ধকার বাড়ী, আকারে প্যাগোডার মত। আবছা আলোয় বাড়ীটাকে মনে হচ্ছে যেন কোন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সন্ধ্যা আসন্ন। বাড়ীগুলো থেকে আজ আর বেশী ধোঁয়া উঠছে না। সন্ধ্যার শান্ত অস্পষ্টতা নেমে এসেছে গাঁয়ের ওপর।

ছোট ছোট কাকের ঝাঁক মাথার ওপর ঘুরছে গোল হয়ে, তারপর উড়ে যাচ্ছে খেজুর বাগানের দিকে। কয়েকটা ছোট ছোট পাখী আগে থেকেই খেজুর গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, এই সব আগন্তুকদের দেখে এবার তারা ভয়ে কিচিরমিচির শুরু করল।

কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে যে একটা বড় ছায়া ভারী ভারী পা ফেলে টলতে টলতে নেমে আসছিল, তাকে দেখে আরো ভয় পেল পাখীগুলো। তার পায়ের কালো ও গদি-লাগানো জুতোর চাপে ঘাসের ওপরকার

নতুন বিশ্বাস

পাতলা পাতলা বরফের টুকরোগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র পালকওলা একটা বুনো মোরগ ভয় পেয়ে একপাশে ঝোপের ভেতর লাফিয়ে পড়ল।

চেন সিঙ-হান-এর মনের ভাবটা ফাঁসিকাঠে-দাঁড়ানো আসামীর মত। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে। নিষ্প্রভ চোখের শূন্য দৃষ্টি আকাশের দিকে—মাটির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে, একটা ভয়ংকর কিছু চোখে পড়ে যাবে হয়ত। পাহাড়ের তলায় এসে আরও আস্তে আরও ভারী ভারী পা ফেলে সে এগিয়ে চলল।

গাঁয়ের ওপর যে নিঃশব্দতা ঝুলে ছিল, তা ভেঙে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রুগীর জ্ঞান ফিরে আসার মত ক্লান্ত ও অস্ফুট গোঙানি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ভীষণ অন্ধকার। কিন্তু ওই শব্দগুলো কিসের? যেন একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে মাঝরাতে কবরখানায় ঢুকেছে আর আর্তনাদ করছে করুণভাবে। শব্দগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে চেন সিঙ-হান। ভীষণ একটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল শরীরটা, নড়বার-চড়বার বা শব্দ করবার ক্ষমতাও আর রইল না, শুধু কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে আবার সে হাঁটতে শুরু করল গাঁয়ের দিকে। একটা ধূসর কুয়াশায় গাঁটা ঢেকে গেছে, বাড়ীর ছাদগুলো প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

ছায়ার মত দুজন মানুষ নিঃশব্দে বেরিয়ে এল গাঁ থেকে। একজনের পেছনে আর একজন—মাঝখানে কি একটা জিনিস ওরা ধরাধরি করে আনছে। চেন সিঙ-হান যখন বুঝতে পারল যে জিনিসটা হচ্ছে একটা মানুষ, তখন তার মনে হল যেন কেউ তাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সে, ভীষণ একটা উদ্বেগে পুড়তে লাগল মনের ভেতরটা।

একটু দূরে থেকে সে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ভগ্নোস্তমে লোক দুটি শাবল দিয়ে আলগা মাটি তুলে তুলে গর্তটার ভেতর তাড়াতাড়ি ফেলছে। ক্রমে গর্তটা ভরাট হয়ে গেল, তারপর চাপড়ে চাপড়ে শক্ত করা হল মাটিটা। এখন ওই তৈরী-করা জমিটুকুকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পেস্‌ট্রি-কেকের মত। শেষবারের মত মাটিটা এখানে ওখানে সমান করে দিয়ে পরিচিত পথটা ধরে ফিরে চলল ওরা। এতক্ষণ কেউ একটাও কথা বলেনি, শুধু চলে যাবার সময় একজন গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'আমাকে বলতে হবে, যাকে তোমরা এইমাত্র কবর দিলে, সে কে?' লোক দুটিকে আঁকড়ে ধরল চেন সিঙ-হান, রুগ্ন গরুর আর্ত চিৎকারের মত শোনাল তার গলার স্বরটা।

'আমাদের বুড়ো দাদু চ্যাঙ। ওর নাতির বাড়ীতে ওকে পাওয়া গেছে। বোধ হয় ওকেই প্রথমে শেষ করা হয়েছিল।' ওদের একজন উত্তর দিল।

অপর জন বলল, 'আর ওর নাতির বৌয়ের শরীরটাও পাওয়া গেছে ওর পাশেই। গায়ে জামাকাপড় কিছু ছিল না। চাপ চাপ রক্তে শরীরটা মাটির সঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়েছিল প্রায়। ওই দেখ—ওই ডান দিকে ওর নাতবৌ রয়েছে। শান্তিতে ঘুমাচ্ছে সে এখন।'

আঁকড়ে-ধরা হাতটা সরিয়ে নিল চেন সিঙ-হান। আর একটা প্রশ্ন তার গলায় আটকিয়ে রয়েছে কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস হচ্ছে না। ওদের মধ্যে কম-বয়স্ক লোকটি আবার কথা বলল:

'চেনকাকা, এই ক-দিন কোথায় পালিয়েছিলে? তাড়াতাড়ি যাও! তোমার ভাই তো ফিরে এসেছে।'

'আমার ভাই, মানে সো-হান? কখন ফিরল?' উত্তর শুনবার জন্যে সে আর অপেক্ষা করল না। তার পায়ে এখন নতুন শক্তি ফিরে এসেছে,

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে। সামনের দিকে তাকাতেই অনেকগুলো দৃশ্য ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—ছোট ছোট ঘটনা, কিন্তু তাকে বিচলিত করেছে ভীষণভাবে।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের ভেতর ঢুকেছে তিনজনে। অন্ধকারে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। উদ্বেগের বদলে আশার সঞ্চার হল চেন সিঙ-হানের মনে, কবর-খননকারীদের পেছনে ফেলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল নিজের বাড়ীর দিকে।

পাঁচ দিন আগে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন ভোর হয় হয়, এমন সময় গাঁয়ের বাইরে থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ আসে, লাফিয়ে উঠে বসে সে, তার বৌ আগেই উঠেছিল। পনের বছরের মেয়ে সোনা মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখে ছুটে আসে ঘরের ভেতর। ব্যাপারটা তক্ষুনি বুঝে নিয়ে সে বলে, 'যাও, পাহাড়ের ওপাশে তোমার দিদিমার বাড়ীতে ছুটে পালিয়ে যাও।'

'বাবা, যদি মরতেই হয় তো একসঙ্গে মরাই ভাল।'

'তোমার সেই ভেড়ার লোমের জ্যাকেটটা কোথায়?'

'ওসব জিনিস নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিও না, বাবা। শয়তানের দল আসছে।'

এক হাতে বৌয়ের ও অন্য হাতে সুন্দরী ছোট মেয়েটির হাত ধরে সে। ধুলোকালিতে নোংরা মুখ—কেমন অসহায় ও কুৎসিত দেখায় তাকে। ভীড়ের আগে আগে দৌড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে যায় তারা। বৌ হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মেজ মেয়ে আর ছেলেটি কোথায়? তারা কি পালাতে পেরেছে? তাছাড়া,

চেন সিঙ-হানের সাতাম বছর বয়সের মা এখনো জীবিত। সুতরাং বৌকে ও মেয়েকে ভীড়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে বলে সে আবার ফিরে আসে। কেউ কেউ আটকাতে চেষ্টা করে তাকে। 'আরে, ফিরে যেও না, প্রাণে বাঁচতে চাও তো পালাও—তাড়াতাড়ি পালাও!' কিন্তু সে ভয় পায় না—মা-কে বাঁচাতে হবে। ক্রমবর্ধমান মানুষের ভীড় ঠেলে সে মা-কে খুঁজতে থাকে।

এক বছরের শিশুটিকে কোলে নিয়ে সো-হানের বৌ দলটির নাগাল ধরবার জন্যে ছুটে আসছিল।

'মা কোথায়? মা-কে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। আমাদের আগেই তিনি বাড়ী ছেড়ে গেছেন। রূপো আর তুঙ-কুয়া গেছে তার সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছি আমরা?

'দিদিমার বাড়ীতে। দৌড়ে চলে যাও।'

তবুও সে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে না, বাড়ীর দিকে যায়। গাঁয়ের চারদিকে বিশৃঙ্খলা, আর্তনাদ, চিৎকার। বুলেট ছুটছে। আগুন ধরে গেছে গাঁয়ের বাইরের দিকটায়। শাদা ধোঁয়ার ভারী পর্দা পাক খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গাঁয়ের ভেতর।

বাড়ীতে কেউ নেই, এখানে ওখানে কয়েকটা মুরগীর ছানা ছুটোছুটি করছে।

আবার সে ছুটে বেরিয়ে আসে। এক ঝাঁক বুলেট তাকে বিদ্ধ করেছিল প্রায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পেছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। ভারী আকাশটা হঠাৎ যেন ভেঙে পড়েছে, আর পৃথিবীটা চুরমার হয়ে গেছে যেন। নিশ্বাস নেবার সময় পাচ্ছে না মানুষ—ভাঙা ভাঙা আর্ত চিৎকার আর তারপরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবন।

ফিরবার পথে বাড়ীর লোকজনদের সে আর খুঁজে পায় না।

গাঁয়ের দু-একজন লোককে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারে না।

পাহাড়ের ওপরে এক জায়গায় দুটি বুড়ো বসে বসে করুণভাবে কাঁদছে। কিন্তু তার মা ওখানে নেই। ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেও রয়েছে, কিন্তু তুঙ-কুয়া নেই। আর এবার তার বৌ ও মেয়েও হারিয়ে গেল! সো-হানের বৌকেও যদি খুঁজে পাওয়া যেত—কিন্তু ওকেও আর দেখা যাচ্ছে না। এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম নেয় সে। দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে। কিন্তু তার নিজের লোকজন ওদের ভেতর নেই।

'পুরো এক রেজিমেণ্ট শয়তান এসেছে।'

'কয়েকটা চাষীকে মেরে ফেলেছে ওরা!'

'আমাদের গাঁ কি এইভাবে শেষ হবে?'

'ওরা যে আসবে, তা তো আমি অনেক দিন আগেই বলেছি।'

'হ্যাঁ, তাই দেখছি। আমাদের আর কোন আশা নেই।'

'একেই বলে ভাগ্য।'

মানুষের ভীড়ে সংক্রামক রোগের মত ভয় ছড়াচ্ছে। সেখান থেকে উঠে সে যায় ত্রিশ 'লি' দূরে চ্যাঙ কিয়া কুয়ান গাঁয়ে। গাঁটা ছোট, বিশ ত্রিশ ঘর লোক থাকে। কোন সময়েই কোন রকম গোলমাল নেই এখানে। লোকজন খুব কমই যাতায়াত করে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আদিম জীবন যাপন করে গাঁয়ের লোকরা। তার শ্বশুর শাশুড়ী এই গাঁয়েই থাকে।

তার আসার একটু পরেই বৌ আর সোনা হাজির হয়। কিন্তু পরিবারের অন্য লোকজনের কোন হদিশ নেই। পরদিন সে আবার বেরোয়, কিন্তু গাঁয়ের কয়েকটা দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না।

তৃতীয় দিন ভাইয়ের কাছে সে একটা মৌখিক সংবাদ পাঠায়। চতুর্থ দিন উত্তর আসে যে শীঘ্রই তারা ফিরে যেতে পারবে। পঞ্চম দিন আবার সে বেরোয় এবং একটা সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। গেরিলারা পশ্চিম উইলো গাঁ পুনরধিকার করেছে এবং লোকজন আবার ফিরে যাচ্ছে। অবস্থাটা কেমন দেখে যাবার জন্যে সেও ফিরে আসে। ভীষণ একটা ভয় নিয়ে সে রওনা হয়েছে—তার প্রিয়জনের ভাগ্যে কি ঘটেছে কল্পনা করেও শিউরে ওঠে সে। কিন্তু তবুও ফিরতে হয়েছে তাকে। ভয় ও আশঙ্কা নিয়ে সে এসেছে।

কিন্তু এখন আশ্বস্ত বোধ করছে সে। তার পরিবারের কোন অমঙ্গল ঘটেছে বলে এখন পর্যন্ত সে সংবাদ পায়নি, হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে সবই ঠিক আছে। কিন্তু কবর-খননকারীরা তাকে বলতে ভুলে গেছে যে আজ বিকেলেই তারা একটি ছেলেকে কবর দিয়েছে—নাম, তুঙ-কুয়া, তার একমাত্র ছেলে।

২

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

মা-র অমতকে সোনা গ্রাহ্যও করল না। কোমরের বেল্‌টটা আর একটু শক্ত করে বেঁধে এগিয়ে গেল তার কাকা চেন সো-হানের দিকে।

চেন সিঙ-হানের ছোট ভাই চেন সো-হান বাবার সাহস ও গাম্ভীর্য পেয়েছে। যখনই তার ভুরু দুটো ভ্রূকুটিতে নেমে আসে আর ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট শক্তভাবে চেপে যায়—তার ভাইরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। ছেলেমেয়েদের আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করে বলে বাড়ীর মেয়েরা তার ওপর একটু যেন অসন্তুষ্ট।

'থাক, বাইরে যেও না। ঘরেই থাক। দেখছ তো, বাইরে বরফ পড়ছে।' সোনার গায়ের তুলো-ভরা পাতলা সুতীর পোষাকটার ওপর মৃদু চাপড় দিল সে।

'না, আমি যেতে চাই। বাড়ীতে থাকতে চাই না আমি।' শরীরটা বেঁকিয়ে মুখের একটা উদ্ধত ভঙ্গী করল সোনা। মা ও কাকীমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার সে চোখ ফিরিয়েছে কাকার দিকে, আশা ও আনন্দের ছাপ তার চোখে।

কাকা হাসল, যেন সে বলতে চাইছে, 'মেয়েটা তো·· '

'এই গোলমালের ভেতরেও তুই বাইরে যাবি? ধাড়ী মেয়ে এতটুকু লজ্জা হয় না তোর···' মা বকতে শুরু করল। মা যেন আজকাল কেমন অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

'মা-র সঙ্গে বাড়ীতে থাক্।' কথাটা বলে মেয়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে চেন সিঙ-হান বাইরে গেল।

'নে, এইবার উনুনটায় আগুন দে গে যা। আর বেশী করে জল চাপিয়ে দিস। তোর সেজকাকা হয়ত তোর ঠাকুমা আর ছোট বোনকে খুঁজে পেতেও পারে। কিছু কি চাই তোর?'

সোনা উত্তর দিল না, মাথায় একটা রুমাল জড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

'যাচ্ছিস কোথায়?' রাগে ফেটে পড়ল মা।

'কয়লা আনতে যাচ্ছি। না কি তাও যেতে পারব না?' সমান চড়া গলায় উত্তর দিল সোনা।

কাকা আবার হাসল। মুখটা থমথমে, শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বাইরে চলে গেল সে।

খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে চেন সিঙ-হানের বৌ। দুঃখক্লিষ্ট

মনে চারদিকে তাকিয়ে সে এমন একটা কিছু খুঁজছে যার ওপর সে নিজের সমস্ত চাপা রাগ ও অভিশাপ বর্ষণ করতে পারে। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা এল এবং চিন্তাটা যে নির্ভুল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ রইল না। ভীষণ একটা রাগে রি রি করতে লাগল শরীরটা; কামড়ে, লাথি মেরে তুমুল একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবার প্রবল ইচ্ছাকে সংযত করতে হল কোন রকমে; মৃদু, শান্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা মেজ-জা, তুমি তো বললে যে সেদিন পালাবার সময় রূপো ও তুড়কুয়াকে ঠাকুমার সঙ্গে দেখেছ, না?'

খাটের অন্য ধারে ছেলেকে কোলে নিয়ে মেজ-জা বসেছিল, ভাল মনেই উত্তর দিল কথাটার। গত দু দিন ধরে দিদির সঙ্গে কথা বলাটা তার কাছে একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'হ্যাঁ, চলে যাবার সময় ওদের আমি দেখেছিলাম।'

'আর সোনা ও তার বাবার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হয়েছিল?'

'রাস্তায়!'

'হুঁ...'

কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। তারপর আবার সে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'তুমি কি কাকার বাড়ীতে এর আগে আর গিয়েছিলে?'

'না। আমার সঙ্গে আরো লোক ছিল। তাদের সঙ্গেই কোন রকমে সেখানে যেতে পেরেছিলাম। কাকা যদি খুঁজতে না বেরোতেন, তাহলে হয়ত...' নিজের সেই দুর্দশার কথা মনে পড়ল মেজ-জায়ের। কাকার সঙ্গে দেখা না হলে কি অবস্থাই না তার হত!

'হুম! কী সুন্দর যোগাযোগ! কেমন চমৎকার মিলে যাচ্ছে! শোন মেজ-জা, আমরা একই সংসারের লোক, ওরকম ঢেকে-রেখে কথা বলে লাভ কি? সোনার বাবা যদি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েই থাকে

তো দোষ কি? সেকথা আমার কাছে লুকোতে চাইছ কেন?'

'দিদি, অবুঝের মত কথা বোলো না। সংসারের ওপর এই দুর্যোগ, এখন অন্তত শান্তিটুকু বজায় থাকুক।'

'দুর্যোগ! তোমার কি ক্ষতি হয়েছে শুনি? নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেখার লোক আছে তোমার। কিন্তু হায়রে আমার পোড়া কপাল! তুঙ কুয়া! বাছা রে! এই রকম মরণও তোর কপালে ছিল! এই বাড়ীটা হয়েছে শয়তানের ঘাঁটি—দয়ামায়া, লজ্জাসরম, কিছু নেই...'

মনে মনে সে এমন একটা কথা খুঁজছিল যেন মেজ-জা অপমানিত বোধ করে রেগে ওঠে।

মেজ-জায়ের মনে হল, দিদি তার সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করছে। কম্বলে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করল সে। সঙ্গে সঙ্গে কোলের ছেলেটিও ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল।

'মা, কি হল?' এক ঝুড়ি কয়লা নিয়ে ফিরে এসে সোনা হতভম্ব হয়ে গেছে।

মেয়ের গলা শুনে মা-র দুঃখ আরো বেড়ে গেল যেন। এখন তার একটিমাত্র মেয়ে রইল। মেজ মেয়ে ছিল সোনার চেয়েও সুন্দরী। ওদের দুজনের মত অমন লক্ষ্মী আর অমন চমৎকার ছেলেমেয়ে আর কার আছে! মা-র অমতে কখনো কোন কাজ ওরা করেনি। তুঙ-কুয়ার মৃতদেহটা পর্যন্ত সে দেখতে পায়নি। দু বার সে ঐ ছোট্ট কবরটা দেখে এসেছে। কি অবস্থায় ছেলেটি মারা গেছে তার একটা ছবিও কল্পনা করতে পারে না সে। জবাই-করা ভেড়ার বাচ্চার মত দেখতে হয়েছিল কি ও? নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে—সর্বাঙ্গ হলদে, শাদা আর লাল? এই কথা ভাবলেই তার মনে হয় যেন তার নিজের শরীরের নাড়ীভুঁড়ি কেউ টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে।

'কেঁদো না, মা।' 'মেজকাকীমা, ও কি হচ্ছে?' কথাটা বলে সোনা নিজেও কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বরফ পড়ছে—অন্ধকার নামছে সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধকার চেপে রয়েছে বরফের ওপর। স্তরে স্তরে অনন্তবিস্তৃত রঙের সমারোহ। ঝোড়ো হাওয়া প্রচণ্ডভাবে মাথা কুটছে কাগজের দেওয়ালে, ভেতরে ঢুকছে ফাটল দিয়ে। ঘরের ভেতরটা এতক্ষণ আধা-অন্ধকার ছিল, এবার কালো হয়ে গেল একেবারে। মানুষের আবেগও বদলাচ্ছে। অনিশ্চিত আশঙ্কার যন্ত্রণা আর নেই, আছে গভীর দুঃখ। কান্না থেমে গেছে, কিন্তু আহতদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে এখনো।

কোলের ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে খাটের ওপর শুইয়ে রেখে মেজকাকীমা উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতড়ে হাতড়ে ঘুরতে লাগল ঘরের চারদিকে। তার মনে হচ্ছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।

ঘরের ভেতর কে যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে—দেখতে পেয়েই সোনা সমস্ত দুঃখ ঠেলে সরিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উনুনে গনগনে আগুন, খাটে বসে থেকেও উত্তাপটা অনুভব করা যাচ্ছে। ফুটন্ত জলের ধোঁয়ার আড়ালে চারপাশের মুখগুলো ঝাপসা। আবার ওরা কথা বলল, খুশিমত বানিয়ে বানিয়ে অনেক আশার কথা শোনাল পরস্পরকে। সকলেই আশা করেছে, দুজনেই এক্ষুনি ফিরে আসবে—শাদা-চুল ঠাকুমা ও নিরপরাধ ছোট মেয়েটি।

দূরে ও কাছে মাঠ ঘাট পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড উত্তুরে হাওয়া বইছে। পাতলা পাতলা বরফের টুকরো আবর্তিত হচ্ছে নিঃশব্দে। গা-শিউরনো ঠাণ্ডা আর হিংস্র অন্ধকার আজ পৃথিবীর অধীশ্বর। খুব কম ঘরেরই চালা বা দেওয়াল ঠিক অবস্থায় খাড়া আছে—বিধ্বস্ত মাটির তলায় কুকুরের মত মুখ গুঁজে আছে নিরাশ্রয় মানুষ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে

শক্তভাবে লেজ গুটিয়ে ভাঙা জিনিসপত্রের আড়ালে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছে কুকুরগুলো। চোখের সামনে ছায়া নড়তে দেখেও আজ আর চিৎকার করছে না ওরা, চোখ বুজে রয়েছে ক্লান্তিতে। চেনদের বাড়ীর সবাই অনেক আশা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রায় সমস্তটা রাত জেগে কাটাল। সোনা সেই একইভাবে টহল দিচ্ছে ঘরের ভেতর, আর বারবার জিজ্ঞেস করছে, 'মেজকাকা, ঠাকুমা কি ফিরে আসবে মনে হয়?'

'না, আজ রাত্রে আর আসবে না। আজ বড় ঠাণ্ডা। ঠাকুমাকে যদি খুঁজে পাওয়াও যায়, তবুও সেজকাকা তাকে আজ ফিরতে দেবে না। আচ্ছা, এবার ঘুমোও গে যাও।' খাটে ঠেস দিয়ে বসে বসে চেন সো-হান তামাক টানতে লাগল।

'তুমি তো ঘুমোচ্ছ না, তাহলে আমিও ঘুমোব না। দেখ, মা-র কী গভীর ঘুম!' তারপর সোনা জিজ্ঞেস করল, গাঁয়ে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা, আবার তুলল ঠাকুমার কথা, দুজনেই আশা করতে লাগল ঠাকুমা যেন আজ ফিরে না আসে। বড় ঠাণ্ডা আজ।

বাতাসে কান্না আর চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। ভয় পেল সোনা, শব্দটা আরো ভাল করে শুনবার জন্যে ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বলল কাকাকে। সোনার কাকাও চেষ্টা করল শব্দটা শুনতে, নিশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল সে। সোনার বাবা খাটের ওপর বসে ঢুলছিল, সেও সোজা হয়ে বসল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শীতের আবছা আলোয় এমনি উৎকণ্ঠা নিয়ে ওরা বসে রইল ভোর না হওয়া পর্যন্ত; ভোর হওয়া মানে সমস্ত আশা আর একদিনের জন্যে মুলতুবী রাখা। কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরের মত ঘরের ভেতরটাও নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

ম্লান ও বিমর্ষ দিন! কালো আকাশ ধূসর বিবর্ণতায় রূপান্তরিত হয়েছে। দ্রুত বরফ পড়ছে ঘন হয়ে। পাখী বা মোরগ বা কুকুরের ডাক শোনা

যাচ্ছে না কোথাও। ভাঙা ঘর, চূর্ণবিচূর্ণ দেওয়াল—বরফে ঢেকে গেছে সব কিছু। যেখানে যা কিছু নোংরা ও দুর্গন্ধ, পালক ও হাড়ের ছড়াছড়ি, ঢেকে গেছে সব। দেখা যাচ্ছে শুধু শাদা দেওয়ালের ওপর বড় বড় কালো অক্ষরগুলো—'চিয়াং কাইশেক নিপাত যাক! কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ কর!' আরও একটা লেখা আছে, 'চীন থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত কর!'—অবশ্য এই শ্লোগানটা এখন আর তেমন প্রচলিত ও স্পষ্ট নয়। চোখের জলে ধোয়া বিষণ্ণ মুখের মত ঝাপসা হয়ে গেছে লেখাগুলো।

ফাকা জমির ওপর কি যেন একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মাঝে, পড়ে যাচ্ছে মুখ থুবড়ে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে বরফে, পর মুহূর্তেই আবার বেরিয়ে আসছে বরফ ঠেলে। চলন্ত বস্তুটি গাঁয়ের আরও কাছাকাছি এল। এখন যে কেউ ওটাকে মানুষের মূর্তি বলে চিনতে পারবে।

মূর্তিটা পথের ধারে আর একবার পড়ে যেতেই একটা কুকুর ছুটে গেছে। কুকুরটাকে তাড়াবার জন্যে ও উঠে দাঁড়াল কোন রকমে। দুর্বল ভঙ্গীতে হাত নাড়তে নাড়তে চেষ্টা করল সোজা হয়ে দাঁড়াবার, টলতে টলতে এগিয়ে চলল একটা পরিচিত বাড়ীর দিকে। কি করবে বুঝতে না পেরে কুকুরটাও ক্লান্তভাবে পিছু নিল। একাগ্র ইচ্ছাশক্তির জোরে সেই আকারহীন মূর্তি কোন রকমে এল চেন সিঙ-হানের বাড়ীর উঠোন পর্যন্ত, কিন্তু শক্তিতে আর কুলোল না, সেখানেই পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। এক জোড়া ক্ষুধার্ত হলদে চোখের জলজ্বলে দৃষ্টি তাকিয়ে রইল ওর দিকে, কিন্তু এত দুর্বল ও যে সেই চোখ দুটোকে তাড়াবার বা এড়িয়ে যাবার শক্তিও ওর নেই। একটা চাপা গোঙানি শোনা যাচ্ছে শুধু, কুঁকড়ে যাওয়া শুকনো চোখের পাতা দুটো বুজে গেছে আস্তে আস্তে। ঠিক সেই সময় একটা

ভাঙা দেওয়ালের ভেতর থেকে আর একটা কুকুর বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল। উত্তরে প্রথম কুকুরটা আরও জোরে চিৎকার করে ঝাপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। চাপা গভীর গলায় আর একবার আর্তনাদ করে উঠল মূর্তিটা।

'বাবা, বাইরে এত গোলমাল কিসের?' গোলমালে সোনার ঘুম ভেঙে গেছে, কেমন ভয় পেয়েছে সে।

'কুকুর ডাকছে।'

'কী আপদ! ওগুলোকে বরং তাড়িয়ে দিয়ে আসি।'

খাট থেকে নেমে সোনা এক টুকরো কয়লা তুলে নিল। কিন্তু দরজাটা খুলে বাইরে যেতেই আরও বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল কুকুরগুলো। কয়লার টুকরোটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুর দুটো একটু দূরে সরে গেল বটে কিন্তু চিৎকার থামল না।

'কুকুরগুলোর পেছনে পর্যন্ত না লেগে থাকতে পারে না।' সোনার মা গজগজ করতে লাগল।

'মেজকাকা, বাইরে উঠোনে কি যেন একটা পড়ে আছে।'

সোনা আর একটু এগিয়ে যেতেই হিংস্র হয়ে উঠল কুকুর দুটো। সে দুটোকে তাড়িয়ে দেবার পর মূর্তিটার চোখ দুটো একটু ফাঁক হল যেন, একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। বাঁশ চেরার মত তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে উঠল সোনা। ভীষণ একটা বিশৃঙ্খলা, ছুটোছুটি, গোলমাল—তারপর সেই অচেতন মূর্তিটিকে তুলোভরা শুকনো পোষাক পরিয়ে শোয়ানো হল উষ্ণ খাটের ওপর। মুখের ওপর দু-একটা বিক্ষিপ্ত চুলের গুচ্ছ, গর্তে-ঢোকানো চোখের নিষ্প্রভ ও নির্জীব দৃষ্টি। মার কোলে মাথা রেখে কাঁদছে সোনা। ছোট শিশুটি নিঃশব্দে ঘরের কোণে বসে আছে—যে ঠাকুমা তাকে এত কোলে নিত আর চুমু খেত, তাকে আজ

আর সে চিনতে পারছে না। মেজ কাকীমা ভাতের ফেন খাওয়াচ্ছে, চেন সিঙ-হান গেছে ডাক্তারের সন্ধানে। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অবিশ্রান্ত কাঁদছে চেন সিঙ-হানের বৌ—তার মেয়ে, তার মেয়েকে ফিরে পেতে চায় সে।

'মা আমাদের চিনতে পারছ না?' বারবার এই একই প্রশ্ন করে চলেছে চেন সিঙ-হান। কিন্তু বুড়ী কোন কথা বলছে না, কাউকে চিনতে পারার কোন চিহ্নই তার চোখে মুখে নেই।

বয়সের ভারে জরাজীর্ণ, কুৎসিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চেন সিঙ-হান। পোড়া কাঠের মত চেহারা, মাছের মত চকচকে দুটো চোখ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনের দীর্ঘসঞ্চিত ঘৃণা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে, এবং সেই ভাবহীন নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে দিয়ে বলল:

'মা, এবার তুমি শান্তিতে মরতে পার। তোমার ছেলে প্রাণ দিয়ে প্রতিশোধ নেবে। আজ থেকে আমার জীবনের একমাত্র কাজ হবে জাপানীদের খুন করা। প্রতিশোধ আমি নেবই; সে প্রতিশোধ তোমার জন্যে, আমাদের এই গাঁয়ের জন্যে, শানসির জন্যে—চীনের জন্যে। জাপানী রক্তই আমার কাম্য। সেই রক্তে ধুয়ে মুছে যাবে আমাদের দেশ, উর্বরা হবে জমি। হ্যাঁ! ওই জাপানী শয়তানগুলোর রক্ত আমার চাই-ই...'

কথাগুলো মন্ত্রের মত কাজ করল। খাটের ওপর নড়েচড়ে উঠল বুড়ী, ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল একটু একটু। মনে হল, ঠোঁটের কাঁপুনিটুকু আস্তে আস্তে সশব্দ হয়ে উঠছে। হঠাৎ আতঙ্কপূর্ণ গলায় বুড়ী চিৎকার করে উঠল, 'জাপানী শয়তান......' তারপর ফিরে তাকাল বৌ ও নাতি-নাতনীর দিকে, কিন্তু আর কোন কথা বলবার ক্ষমতা তার ছিল না। জবাই-করা হাঁস যেমন অন্ধ আবেগে ডানা ঝাপটায় তেমনি সেও মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল শিশুর মত।

'ঠাকুমা! ঠাকুমা!' ঘরের আবহাওয়াটা বিষণ্ণ, কিন্তু তবুও যেন একটু আশা ও উত্তাপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

৩

বেঁচে থাকবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল বলেই বুড়ী তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। কয়েক দিন পর দেখা গেল, সে উঠোনের রোদে বসেছে, বাড়ীর মেয়েরাও জড়ো হয়েছে সেখানে। বুড়ী বলে চলল, 'মেয়েটা সমানে কেঁদেছে আর চিৎকার করেছে। ঢাকের কাঠির মত দাপাচ্ছিল পা দুটো। আর ওর গায়ের সেই বরফের মত শাদা চামড়া...'

'ঠাকুমা, তোমার পায়ে পড়ি, আর বোলো না। আমার ভয় করছে।' দু হাতে মুখ লুকোল সোনা।

'তিনটে শয়তান একসঙ্গে ওকে ধরেছিল,' বুড়ীকে দেখে মনে হল যেন নাতনীকে আতঙ্কিত করতে পেরেছে বলে সে গর্বিত, 'একবার চেঁচিয়ে উঠবার সময়ও মেয়েটা পায়নি। মুখটা বেগুনী হয়ে গিয়েছিল, বুড়ো গরুর মত একটা গোঙানি শোনা গিয়েছিল শুধু। আর সে কী কাতর দৃষ্টি! 'দাঁত দিয়ে কামড়ে দু টুকরো করে ফেলো জিভটাকে—কামড়ে ধর জোরে।' আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে এর চেয়ে ওর পক্ষে মৃত্যুও ভাল।'

'মা! মা!' বড় বৌয়ের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কিন্তু তেমনি নিষ্ঠুরভাবে বুড়ী বলে চলল, 'মেয়েটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল, কিন্তু নিজের হাতে ও মরেনি। ওর সেই গোলগাল ছোট্ট শরীরটা রক্তে ভেসে গিয়েছিল। সে কী রক্ত! ছেলেপিলে হবার সময়েও এত রক্তপাত হয় না। বুক থেকে রক্ত গড়িয়ে হাতে আর পাছায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল। ওর ছোট্ট মাই দুটো কামড়ে নিয়েছিল শয়তানরা। তোমার

চয়ে বড় ছিল না ওর মাই।' ডাইনীর মতো দৃষ্টিতে নাতনীর দিকে স্থিরভাবে তাকাল সে। 'শয়তানরা ওর ছোট্ট নরম মুখটাকে কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল—পোকায় খাওয়া আপেলফলের মত। আর তারপরও সেই বড় বড় চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ও।' বুড়ী কেমন যেন বদলে গেছে। পরিবারের ওপর তার সেই ভালবাসা কি আর নেই? তাহলে কেন সে এই সব গল্প বারবার বলে? কেন তাদের সব সময়ে যন্ত্রণা দেয়? আর তার গল্প শুনে কেউ যদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'যাও যাও—বসে বসে শুধু নাকী কান্নাই কাঁদ। দু দিন যাক না, ঐ জাপানী শয়তানগুলো আবার এল বলে…' আর যদি তার কথা শুনে শ্রোতারা রাগে লাল হয়ে ওঠে তবে সে খুশি হয়—ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন জ্বালাতে পেরেছে সে।

প্রথম প্রথম ছেলেরা সামনে এলে সে গল্প থামিয়ে চুপ করে যেত। ছেলেদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে ভয় করত সে। তাছাড়া, কেমন একটা লজ্জা ও যন্ত্রণাবোধ হত—গল্প বলতে পারত না কিছুতেই।

নাতনীর মৃত্যুর বর্ণনা দিত সে। তের বছরের মেয়েটিকে ব্যবহার করা হয়েছে 'বিলাস-সঙ্গিনী' হিসেবে। রাজকীয় সৈন্যদের শরীরের তলায় পিষ্ট হতে হতে সে ভীষণ আতঙ্কে চিৎকার করেছে মা ও ঠাকুমার নাম ধরে ধরে। দু জন সৈন্য 'বিলাসতৃপ্ত' হবার পর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে। তারপর আর একদিন মাত্র সে বেঁচে ছিল—তার ফ্যাকাশে শুকনো মুখের ওপর চোখের জল গড়িয়েছে তখনো। 'প্রাচীন-সমাজ-শ্রদ্ধাজ্ঞাপনী'তে১ যাবার আগে ঠাকুমা দেখেছে জীবন্ত অবস্থাতেই

১ 'প্রাচীনসমাজ-শ্রদ্ধাজ্ঞাপনী।' যে সব বৃদ্ধ লোকের কোন পারিবারিক সংস্থান নেই, তাদের সাহায্য করবার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অধিকৃত চীনে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাপানীরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে। সেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলো বৃদ্ধদের শ্রম-শিবিরে পরিণত হয়েছিল।

মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কুকুরকে খাওয়ানো হবে বোধ হয়।

নিজের চোখে ঠাকুমা তুঙ-কুয়াকে মরতে দেখেছে। অনেক খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে ঘটনাটা বলত সে। বড়বৌ দুঃখ পেতে পারে ভেবে কোন বাছবিচার করত না। তার মতে, তুঙ-কুয়া ছিল সাহসী ছেলে। বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়েও সে পালাতে চেষ্টা করেছে। তখন 'শয়তান'টা এমন ভীষণভাবে বেয়নেটের খোঁচা দেয় যে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে ছেলেটি, একবার চিৎকারও করেনি। এই রকম ঘটনা বহু ঘটেছে। গত দশ দিনে যত নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, ঠাকুমা তার সারা জীবনেও তা দেখেনি। দু-একজন পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজনের সংবাদ জানবার জন্য বুড়ীর কাছে আসত, আর বুড়ী অত্যন্ত সততার সঙ্গে বিশদভাবে বর্ণনা দিত কি ভাবে তাদের বাপ-মা, বৌ, ছেলেমেয়েদের খুন করা হয়েছে আর কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাদের।

শ্রোতাদের ওপর নিজের কথাবার্তার প্রতিক্রিয়া দেখে বুড়ী আনন্দে আটখানা হয়ে উঠত। শ্রোতারা সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করত তার প্রতি আর বুড়ী এই ভেবে খুশি হত যে তার নিজের ঘৃণাকে অপরের ভেতর সঞ্চারিত করতে পেরেছে।

তার স্বভাব কোনকালেই ঝগড়াটে নয়। প্রথম প্রথম গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলত সে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংযত করল নিজেকে। তখন সে শ্রোতাদের মুখের ভাব পরীক্ষা করত এবং সব চেয়ে কার্যকরী শব্দ কি হবে তাই ভাবত মনে মনে।

তার নিজের অপমান ও লজ্জার কথাও গোপন করেনি। 'প্রাচীনসমাজ-শ্রদ্ধাজ্ঞাপনী'তে সব রকমের কাজ করতে হয়েছে তাকে। ময়লা জামা-কাপড় ধুয়েছে, জাপানী নিশান তৈরী করেছে। এমন কি বেতের মার

থেকেও রেহাই পায়নি। কথাটা বলে জামার আস্তিন ও কলার তুলে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাত শরীরের ওপর কালশিরার দাগগুলো।

হ্যাঁ, একটা বুড়ো চীনার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পর্যন্ত হয়েছে তাকে। চীনাটিকে দিয়ে জোর করে এই কাজ করাবার সময় বিছানার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত জাপানীগুলো। বৃদ্ধ চীনাটির চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত তার মুখের ওপর, আর চাপা আর্তনাদ তুলে লোকটি বলত, 'আমাকে ঘৃণা কোরো না। ক্ষমা কোরো আমায়।'

প্রতিদিন গাঁয়ের ভেতর ঘুরে ঘুরে এই সব কথা বলে বেড়াত সে। দলে দলে লোক জড়ো হত তার চারপাশে। 'এসব কথা কি তোমরা ভুলতে পার?' প্রশ্ন করত চেঁচিয়ে। রাস্তায় লোক না থাকলে বাড়ী বাড়ী ঢুকে গল্প বলত। প্রায়ই এমন হয়েছে যে তার আবেগময় গল্প শুনে শ্রোতারা কাজকর্ম ভুলে ডুবে গেছে কথার ভেতর।

এইভাবে গাঁয়ের সমস্ত লোকের কাছে সে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে চিনল তাকে, প্রায়ই তারা আসে তার কাছে। ব্যাপার দেখে ছেলেরা আর বৌরা বলাবলি শুরু করল, 'বাড়ীতে একটা পাগল জুটেছে! খাওয়া পরা বা চুল বাঁধার দিকেও আর নজর নেই। বাড়ীতে আর মনই টেঁকে না।' বড়-বৌ একদিন ফেটে পড়ল একেবারে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা আর আগের মত নেই। রূপো বা তুঙ-কুয়ার কথা বলবার সময়েও এখন আর মা-র চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ে না। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না মা-র আজকাল কি হয়েছে।' মেজ-বৌ শুধু একবার আড়চোখে তাকাল স্বামীর দিকে, তার স্বামীর চোখেমুখে চিন্তার রেখা।

সেই দিনটির কথা চেন সিঙ-হানের এখনো স্পষ্ট মনে আছে যেদিন

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদল লোকের সামনে মা-কে বক্তৃতা দিতে দেখেছিল। নিজের গল্প বলছিল বুড়ী। শুনে রক্ত উঠে এল তার মাথায়, পাগলের মত হয়ে উঠল হঠাৎ। সে বুঝতে পারেনি, সে জোরে চিৎকার করে উঠবে না ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে না পালিয়ে যাবে সেখান থেকে। শুধু থর থর করে কেঁপেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে মা ছেলেকে দেখতে পেয়ে কথা থামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। প্রত্যেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল তাকে কিন্তু হেসে ওঠেনি কেউ। সামনে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'মা, তোমার হয়ে আমি প্রতিহিংসা নেব।' কথাটা শুনে প্রচণ্ড আবেগে বিকৃত হয়ে উঠল বুড়ীর মুখ এবং হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে লড়াইয়ে হেরে যাওয়া মুরগীর মত ফিরে গেল জড়োসড়ো হয়ে এবং কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে তাকাল জনতার মুখের দিকে। কেউ কোন কথা বলেনি। মাথা নীচু করে ভারী ভারী পা ফেলে চলে গিয়েছিল সকলে। নির্জন রাস্তায় একা পড়ে ছিল সে। মনের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, কিন্তু তবুও যেন অনেক কিছুতে ঠাসা হয়ে চাপা কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে।

'দেখছি বাড়ীশুদ্ধ লোকের পাগলামি শুরু হয়েছে', আলোচনাটা আর একবার তুলল বড়-বৌ' 'কেন তুমি মা-কে কিছু বলছ না? কোন দিকেই তোমার যেন কোন হুঁশ নেই।' স্বামীকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল সে।

'হুঁশ! কি বলব বল? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।'

'কষ্ট পাচ্ছে না কে শুনি?'

এই নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটাবার ইচ্ছা সিঙ-হানের ছিল না। নিঃশব্দে সে তাকাল ভাইয়ের দিকে। তার ভাই তার সঙ্গে একমত।

সে জিজ্ঞেস করল, বাড়ীর মেয়েদের এই ইচ্ছা কিনা যে বুড়ীকে ঘরের ভেতর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হোক। আর বুড়ী তো অপরের কোন ক্ষতি করেনি। তার মতে, সোনা যদি বুড়ীর ওপর একটু চোখ রাখে তবে আর কোন গোলমাল হবে না।

এই সময়ে বুড়ীর তৃতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ফিরে এল। এই ছেলেটিই তার সব চেয়ে আদরের। মা-র পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ছেলেটি কাঁদতে লাগল এবং ভাঙা ভাঙা গলায় বলল :

'মা, সবই আমার দোষ। আমি যদি বাড়ীতে থাকতাম তো তোমাকে কিছুতেই ওই শয়তানগুলোর হাতে পড়তে দিতাম না। জানো মা, সৈন্যদের সব সময়ে নিজের খুশিমত কাজ করার অধিকার থাকে না।'

'তা সত্যি, কিন্তু তোমাকে সৈন্যদলে তো থাকতেই হবে।' ছেলের দিকে বুড়ী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বছর কুড়ি বয়স। পরনে খাটো জ্যাকেট, কোমরে পিস্তল। দেখে খুশি হল বুড়ী। 'এটা কামান পিস্তলের জগৎ। আচ্ছা খোকা, বল্ তো তুই কতগুলো জাপানী মেরেছিস ?'

এখন আর ছেলের কাছে তার নিজের কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই —সেই সব কথা যা এই ক-দিনে তার জীবনে ঘটে গেছে। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গল্প কিছু কিছু শুনতে চায় সে। এই গল্প শুনলেই তার মন শান্ত হবে।

'তোমার ভয় করছে না ? আচ্ছা বেশ, তবে শোনো।'

চেন লি-হানের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলতে শুরু করল সে। তারা প্রথমে ছিল পশ্চিম উইলো গাঁয়ে। সেখানে কুড়িটা 'শয়তান'কে তারা মেরেছে। তারপর তারা পূর্ব উইলো ও লী গাঁ দুটো আক্রমণ করে। সান ইয়াও গাঁটা তারা অধিকার করেছিল, পরে

হাতছাড়া হয়ে যায়। এখন আবার তারা সেখানে গেছে। তার ঠিক মনে নেই কতগুলো 'শয়তান' খুন হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর উপকরণ পেয়েছে তারা—গোলাবারুদ, কামান এমন কি রসদ পর্যন্ত। তাদের সঙ্গে, তার নিজের দলেই, বিখ্যাত বীর চাঙ তা-চুয়ান রয়েছে। একবার চাঙ তা-চুয়ান শহরে যায়। সঙ্গে ছিল একটা হালকা মেশিনগান, কাঁধের ওপর মেশিনগানটা চাপিয়ে তুলোর কোট দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল। নানা বিপদের জন্যে শহরে গিয়ে সে অবশ্য কিছু করতে পারেনি, সুতরাং ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু ফিরবার পথে দশটা জাপানী সৈন্যের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয় এবং দশটাকেই সে মেরে ফেলে। একবার একটা জাপানী সৈন্য ধরা পড়ে তাদের হাতে। লোকটা এত মোটা যে তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে অসামরিক লোকজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু কি করে যেন লোকটা পালিয়ে যায়, তাকে আর চেষ্টা করেও ধরতে পারা যায়নি।

অত্যন্ত উৎসুক হয়ে কথাগুলো বুড়ী শুনেছিল এবং তারপর অন্যের কাছে না বলা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারেনি। এখন সে যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার বড় ছেলে চাষী-ইউনিয়নের কর্মী, সে গেছে নতুন বীজ কিনতে। মেজ ছেলের ডাক পড়েছে সৈন্যদলে। ছোট ছেলে তো বাড়ীতে প্রায় থাকেই না বলা চলে। থাকলেও বুড়ীর বিশেষ কিছু যায় আসে না, কারণ ছোট ছেলেকে ভয় করবার কিছু নেই। একদিন বিকেলে বাড়ীর উঠোনে দুটো বড় ট্রাক্ দেখতে পেয়ে বুড়ী ছেলেকে জিজ্ঞেস করল:

'ওগুলো কি আমাদের ট্রাক?'

'হ্যাঁ ওই সব ট্রাকে মালপত্র চালান যায়।'

'তা যাক্! কি ধরনের মালপত্র যায় তা জানবার দরকার আমার নেই।

ওগুলো যদি আমাদেরই হয় তো আমার একটা কাজ আছে। কাল আমি একবার ওয়াও গাঁয়ে যেতে চাই।'

বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক বুড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি! জায়গা নেই! মালপত্র ছাড়া আর কিছু যেতে পারে না নাকি? তা যাক্ আর না যাক্, কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে যেতেই হবে। আমি আমার ভাই ও ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে দেখা করব।'

এইভাবে সমস্ত বাধানিষেধ সে এক কথায় উড়িয়ে দিল।

পরদিন সোনাকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ী ট্রাকে চড়ে রওনা হল ওয়াও গাঁয়ে। সেখানে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করল সে। নিজের চোখে দেখা অত্যাচারের কাহিনী সে যখন বলেছে, জল এসেছে তাদের চোখে। শুধু চোখের জল নয়, ভয় ও ক্রোধের চিহ্নও ফুটে উঠেছে মুখগুলোতে। তারপর ছেলের কাছে শোনা বীরত্ব-উত্তেজনা-উৎসাহপূর্ণ গল্পগুলো বলে তাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবার পর হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। যুবকদের সে রাজি করিয়েছে গ্যেরিলা দলে যোগ দিতে। শ্রোতাদের মুখে সামান্য দ্বিধার আভাস দেখলেই সে ভুরু কুঁচকে ফেটে পড়েছে, 'ভীরু! কাপুরুষ! আচ্ছা বেশ, থাক বসে। জাপানীরা এসে কুচি কুচি করে কাটুক তোমাদের। আমি জানি, শয়তানগুলো দুর্বলদের কি ভাবে খুন করে।'

হ্যাঁ, বহু লোক তার কথা শুনে যোগ দিয়েছে গ্যেরিলা দলে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু লোককে সঙ্গে এনে ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে সে বলেছে, 'এদের নাও, এরা তোমাদেরই মত বন্দুক ধরতে চায়।'

ওয়াও গাঁ থেকে ফিরে আসবার পর সোনাকে সঙ্গে নিয়ে আর একটা গাঁয়ে সে গেল। ট্রাক পাওয়া না গেলে হেঁটেই চলে গিয়েছে দুজনে। সোনাকে প্রায়ই সে ধমকিয়েছে, 'লোকের সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

গোড়া থেকেই সোনা তার ঠাকুমার পক্ষে। ঠাকুমাকে সে ভালবাসে, ঠাকুমার স্নেহকে পোষণ করে মনে মনে। একসঙ্গে হাঁটবার সময় মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ও সহানুভূতিভরা দৃষ্টিতে সে তাকায় বুড়ীর দিকে, আর বুড়ী তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। খানিকটা উত্তাপ অনুভব করে সোনা, সেই উত্তাপের সঙ্গে বিষণ্ণতাও যে নেই তা নয়।

ঠাকুমার উৎসাহী ভক্ত সোনা। ঠাকুমার অনুপস্থিতিতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবার সময় একই ভাষা সে ব্যবহার করে—যদিও কথার ভেতর কুণ্ঠা থাকে একটু যেন।

বুড়ীর পুত্রস্নেহের ভেতর সম্পূর্ণ একটা পরিবর্তন এসেছে। ছেলেরা যতদিন ছোট ছিল, ততদিন তার কাছে তারা ছিল পোষা বেড়ালছানার মত। তারা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠে মা-র সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর করবে—এই আশা তখন সে মনে মনে পোষণ করত। তারপর ছেলেরা বড় হল; শরীরে ভাল্লুকের মত শক্তি, ঈগলের মত ক্ষিপ্রতা। কিন্তু মা-কে তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সুতরাং মা-র পুত্রস্নেহ তার মনের ভেতরেই গোপন হয়ে রইল—গোপন, নিঃশব্দ ও বিষণ্ণ। কিন্তু সব সময়েই একটা ভয় ছিল যে ছেলেদের সঙ্গে হয়ত আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ছেলেরা আরও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দিন শুরু হল এবং একটা দৃঢ়তা এল তার প্রকৃতিতে। তখন ছেলেদের দেখে মনে হত না, মা-র প্রতি তাদের কিছুমাত্র দরদ আছে। আর মাঝে মাঝে তার মনেও ছেলেদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব আসতে লাগল যেন। কিন্তু সে এত দুর্বল ও ভীরু যে ছেলেদের ভালবাসা তার কাছে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। একটা কথা বা একটা ইঙ্গিত তার মনকে একেবারে গলিয়ে দিতে পারে। ছেলেদের প্রতি সে সব সময়েই অনুরক্ত, কিন্তু এখন তাদের মুখের হাবভাব তার

কাছে একেবারেই অর্থহীন। সে কি ছেলেদের আর ভালবাসে না? না, সে তাদের ঘৃণা করে? আসলে সে এখন অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলেদের দিকে তাকায়। যখনই ছেলেরা তার কাছে জাপানী শয়তানদের গল্প বলে, পুত্রগর্বে ফুলে ওঠে সে। ভাবে এত কষ্ট করে ছেলেদের মানুষ করা ব্যর্থ হয়নি। ভেবে খুশি হয়।

বৌরা এখন তার প্রতি আরও অনুরক্ত। অতীতের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা তাদের একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। একা থাকলেই এখন তারা সেই একই বিষয়ের আলোচনা করে। অতীতের ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদের আর কোন অস্তিত্ব নেই, একই ধ্যানধারণা নতুন ভালবাসা সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে। সমগ্র পরিবারের ভেতর এমন একতা ও আন্তরিকতা এর আগে আর কোন দিন দেখা যায়নি। এমন কি তাদের চিন্তাও অভিন্ন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মুল কারণ যে বুড়ী তা কেউ-ই বুঝতে পারল না।

ছেলেরা একটা আশ্চর্য খবর নিয়ে এল। কে যেন বুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এ নিশ্চয়ই বুড়ীর কৃতকর্মের ফল। অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে বুড়ীর হাতটা ধরে রইল সোনা। তাকে আশ্বাস দিয়ে বুড়ী বলল ঃ

'নাতনী, অত ভয় পেও না। জাপানী শয়তানগুলো আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার চেয়েও খারাপ ব্যবহার তো আর কেউ করতে পারবে না। আমাকে যা সহ্য করতে হয়েছে তার চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? এখন নরকে যেতেও আমি ভয় পাই না। ভয় পাবার কি আছে?'

বড়-বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা কি একটু কথা বলতেও পারব না নাকি? আমরা তো চীনাদের বিরুদ্ধে নই, জাপানীদের বিরুদ্ধে। ওরা কি করতে চায় আমাদের নিয়ে?'

কিন্তু ওরা কেন মা-র সঙ্গে দেখা করতে চায়? বড় ছেলে স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারল না। সংঘের একজন কর্মী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বুড়ী তার মা কিনা এবং তার ঠিকানা লিখে নিয়েছে। ব্যাপারটা কি সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু কোন অমঙ্গল যে তাদের হবে না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তবুও খবরটা একটু যেন দুশ্চিন্তাই সৃষ্টি করে। বুড়ীর সারা জীবনে বাইরের কোন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। কিন্তু খবরটা শুনে বুড়ী অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল না, তার চোখের ঘুমও নষ্ট হল না এই জন্যে।

পরদিন দুটি মেয়ে এল। একজনের পরনে ঠাকুমার মতই খাটো পোষাক; অপর জনের ফৌজী সাজ, বব্-করা চুল। দেখে মনে হয়, দুজনেই অত্যন্ত অল্প-বয়সী। বিনা আড়ম্বরে মেয়ে দুটিকে ঘরের ভেতর এনে বসাল বুড়ী। মেয়ে দুটি কথা শুরু করল ঃ

'জানেন বুড়ী-মা, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না, আমি কিন্তু আপনাকে অনেক দিন থেকেই চিনি। দু বার আমি আপনার বক্তৃতা শুনেছি।'

'বক্তৃতা!' শব্দটার অর্থ বুঝতে না পেরে সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

'আপনার বক্তৃতা শুনে আমি না কেঁদে থাকতে পারিনি। বুড়ী-মা, আপনি তো জাপানীদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আপনি যা কিছু বলেন সব নিশ্চয়ই আপনার চোখে দেখা।'

কথাটা শুনে বুড়ীর চোখেমুখে একটা অন্তরঙ্গতার ভাব ফুটে উঠল। 'ও, এই জন্যে,' মনে মনে ভাবল সে, 'খবর শুনতে এসেছে ওরা।'

তারপর স্রোতের মত সে তার নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল।

বহুক্ষণ মন দিয়ে শুনল মেয়ে দুটি, তারপর বাধা দিয়ে বলল, 'শুনুন বুড়ী-মা, আমরা আপনার সঙ্গে একেবারে একমত। শয়তানগুলোকে

আমরা ঘৃণা করি, এছাড়া আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। চীনের ওপর জাপানীদের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমরা দল গড়ছি। কিন্তু আপনার মত ভাল বক্তৃতা আমরা দিতে পারি না। আপনি আসুন আমাদের সংঘে। আমাদের উদ্দেশ্য, সকলের কাছে এই সব অত্যাচারের কাহিনী বলা এবং জাপানী শয়তানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে কাজ করা।'

ওদের কথা শেষ না হতেই বুড়ী সোনাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'সোনা ওরা এসেছে ওদের সংঘে যোগ দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানাতে। তুমি কি বলো?' কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই মেয়ে দুটির দিকে ফিরে তাকাল, 'বিশেষ কিছু জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু যদি তোমরা মনে করো যে আমাকে দরকার তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সংঘে যোগ দেব। তোমাদের যদি অন্য কোন মতলব থাকে তাহলেও আমার কোন ভয় নেই। আমার দুই ছেলে গ্যেরিলা দলে যোগ দিয়েছে। একজন চাষী-ইউনিয়নে কাজ করে। তোমাদের সংঘে যোগ দিলে আমার কি আর অনিষ্ট হতে পারে! হারাবার মত কিছুই আমার নেই। কিন্তু আমার নাতনীকেও নিতে হবে।' সোনাকে সংঘে নিতে সানন্দে রাজী হল মেয়ে দুটি, এবং বাড়ীর বৌদেরও যোগ দিতে বলল।

বুড়ী যোগ দেবার পর মহিল-সংঘ দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল। নতুন সভ্য সংগ্রহ করবার জন্যে চারদিকে ঘোরাঘুরি করল বুড়ী। সংঘের ভেতর সে আছে দেখে অন্যরাও যোগ দিল বিনা দ্বিধায়। অনেক দরকারী কাজ করতে শুরু করল সংঘ।

বুড়ীকে দেখে মনে হল, শরীর এবং মন—দু দিক থেকেই যেন তার বয়স ক্রমশ কমছে।

গত তিন মাসে গেরিলাদের যুদ্ধজয়কে উপলক্ষ করে সংঘের পক্ষ থেকে বিরাট এক সভা ডাকা হল। মহিলা-দিবস বলে ঘোষিত হল দিনটি। আশেপাশে গাঁয়ের মহিলাদের আহ্বান জানানো হল সভায় এসে মিলিত হবার জন্যে। সেদিন বিভিন্ন বয়সের এক দল স্ত্রীলোককে সভায় নিয়ে এল বুড়ী। শিশুরাও সঙ্গে ছিল—কেউ কেউ কোলে, কারও কারও হাত ধরা। পরস্পরের কথাবার্তা আজ আর শিশুদের সম্পর্কে আলোচনায় কেন্দ্রীভূত নয়। অনেকেরই পা এখনো বাঁধা, কিন্তু জনতার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে একটা সংঘ-শক্তি অনুভব করতে পারল সকলে, ক্লান্তিবোধ করল না কেউ।

সভায় ইতিমধ্যেই বহু লোক এসেছে। বুড়ীর ছেলেরাও রয়েছে সেখানে। অনেক পরিচিত লোক দূর থেকে তাকে দেখে মাথা নাড়ল। কেমন একটা নতুন আবেগে অস্থির হয়ে উঠল সে—খানিকটা কুণ্ঠা আর খানিকটা গর্বও ছিল সেই আবেগে। কিন্তু পরে লোকজনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলবার সময় এই আবেগ আর তার রইল না।

জনতা দ্রুত বাড়ছে। ভারী খুশি হল বুড়ীর মন। 'এত লোক আমাদের দলে!' মনে মনে ভাবল সে।

সভা আরম্ভ হল। কে যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। মন দিয়ে শুনল বুড়ী। বক্তৃতাটা আশ্চর্য মনে হল বুড়ীর কাছে—একটিও অপ্রয়োজনীয় শব্দ নেই বক্তৃতায়। এই বক্তৃতা শুনে বিচলিত হবে না এমন লোক কে আছে? দেশের জন্যে কাজ না করে উপায় থাকবে নাকি কারও? তারপর তাকে ডাকা হল বক্তৃতা দেবার জন্যে।

প্রথমে তার একটু ভয় হয়েছিল, কিন্তু সাহস ফিরে আসতে দেরী হয়নি। চারদিকে প্রশংসা আর হাততালির ভেতর সে অল্প খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিস্তৃত

সমুদ্রের মত মনে হল মানুষের মাথাগুলোকে—সকলেই চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দেখে ধাঁধা লেগে গেল—কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর সে শুরু করল নিজের গল্প। 'আমি বুড়ী হয়ে গেছি, কিন্তু তবুও জাপানী রাজকীয় বাহিনীর সৈন্যরা আমার ওপর অত্যাচার করেছে। এই দেখ...' কথাটা বলে সে জামার আস্তিন তুলল। সহানুভূতিসূচক ধ্বনি উঠল শ্রোতাদের ভেতর। 'ব্যাপারটা তোমাদের কাছে বীভৎস মনে হচ্ছে, না? কিন্তু শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়।' তারপর তার নিজের বা অপরের অনুভূতি সম্পর্কে কোন মমতা বা বাছবিচার না করে সে বর্ণনা দিল কী নিষ্ঠুর ব্যবহার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তার কথা শুনে গভীর বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল শ্রোতাদের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে উঠল, 'আমি তোমাদের করুণাপ্রার্থী নই। নিজেদেরই করুণা কর। আত্মরক্ষা করতে শেখ। আজ হয়ত মনে হতে পারে আমি করুণার পাত্রী, কিন্তু তোমরা যদি শয়তান-গুলোর বিরুদ্ধে একসঙ্গে উঠে না দাঁড়াও—হা ভগবান! আমি চাই না যে আমার মত তোমাদেরও অত্যাচার সহ্য করতে হোক। আমি বুড়ী হয়েছি, বেশী কষ্ট সহ্য করতে আর আমি পারব না। আমার মরবার সময় হয়েছে। কিন্তু তোমাদের জীবনের এই তো শুরু, বেঁচে থাকতে হবে তোমাদের। জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ তোমরা এখনো পাওনি। শুধু দুঃখভোগ করবার জন্যে বা ওই শয়তানদের হাতে অপমানিত হবার জন্যেই কি তোমরা জন্মেছ?'
হাজার হাজার যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলায় প্রতিধ্বনি উঠল, 'আমরা বাঁচতে চাই। এত অপমান আমরা সহ্য করব না।'

সেই হাজার হাজার কণ্ঠের সমস্ত ব্যথা ও যন্ত্রণা সে অনুভব করতে পারল যেন। একটিমাত্র ইচ্ছা অভিভূত করল তাকে—

জনসাধারণের সুখের জন্যে আত্মত্যাগ। চিৎকার করে আবার সে বলতে লাগল :

'নিজের ছেলের মত আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমাদের জন্যে আমি মরতেও প্রস্তুত। কিন্তু শয়তানরা তো আর শুধু আমাকে একা চায় না, চায় তোমাদের সবাইকে। অনেক…অনেক রক্তপাত তারা করবে। আমার মত দশ হাজার লোক থাকলেও তোমাদের রক্ষা করা যাবে না। প্রত্যেককে আত্মরক্ষা করতে হবে। যদি বাঁচতে চাও তো পথ খুঁজে নাও। এক সময়ে আমি নিজের ছেলেদের কিছুতেই চোখের আড়াল করতে পারতাম না, কিন্তু এখন তারা সবাই গ্যেরিলা দলে যোগ দিয়েছে। একদিন হয়ত তারা খুন হবে, কিন্তু গ্যেরিলা দলে যোগ না দিলে আরও তাড়াতাড়ি খুন হতে পারত। আজ থেকে ওই শয়তান-গুলোকে দূর করবার প্রতিজ্ঞা যদি তোমরা নাও, তবে আমাদের জীবন আরও সুখী হবে। সেজন্যে আমার ছেলেদের যদি প্রাণও দিতে হয় তো হোক। যদি আমার কোন এক ছেলে মারা যায় তো আমি তাকে চিরকাল মনে রাখব, তোমরাও তাকে ভুলতে পারবে না—সে আমাদের সকলের জন্যে প্রাণ দিয়েছে।'

উপচে-পড়া কুয়োর মত প্রবাহিত হয়ে চলল তার কথা। কি ভাবে থামবে, বুঝতে পারল না সে। আবেগে দুর্বল বোধ হচ্ছে শরীর, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে। গলা ভেঙে গেছে, চিৎকার করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রোতারা প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে পড়েছে, কিছুতেই তারা থামবে না—আরও শুনতে চায় তারা।

সেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মাথাগুলোও নড়ছে—যেন ফুঁসে-ওঠা সমুদ্র। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বুড়ী চিৎকার করে উঠল, 'শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করতেই হবে আমাদের!' কথাগুলোর

উত্তরে শোনা গেল কানে-তালা-লাগানো গর্জন—যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় তটরেখার ওপর আছড়ে পড়ছে।

যে দু-তিনজন লোক এগিয়ে এসেছিল, তাদের কাঁধের ওপর শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিয়ে বুড়ী তাকিয়ে রইল সেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের দিকে। সেই মুহূর্তে জনসাধারণের বিরাটত্ব অনুভব করল সে। তারপর মুখ তুলে সে তাকাল অসীম নীল আকাশের দিকে। যা কিছু পুরনো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, নতুন পৃথিবী দ্যুতিমান। চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি, কিন্তু তবুও নতুন বিশ্বাসের আলো প্রখরতর হয়ে উঠল।

পিয়েন চি-লিন্

মেয়েদের লাল পায়জামা ছেড়ে ফেলতে হল বলে আন্‌চু গাঁয়ে গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছে।

মাত্র দশ 'লি' দূরে তুঙ-পু রেলপথ জাপানী সৈন্যদের অধিকারে। জাপানী সৈন্যরা খবর পাঠিয়েছে যে তারা এই গাঁয়ে আসবে। দু মাস আগে আর একবার তারা এসেছিল। সেবার সেই আসাটা রূপ নিয়েছিল আক্রমণের আর সেই নৃশংস বীভৎসতা দেখে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের লোকরা। ফিরে এসে ভাঙা ঘরদোর আর পোড়া আসবাব সারিয়ে গুছিয়ে বসতে সামান্যই সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যেই আবার খবর এল যে জাপানী সৈন্যরা গাঁয়ে গাঁয়ে 'শান্তিপ্রচারে' বেরিয়েছে। ইতিমধ্যেই পাশের লু গাঁয়ে পৌঁছে গেছে তারা—আর গুজব এই যে, সেখানে একটি আট বছরের মেয়েকে জাপানী শান্তিপ্রচারের নমুনা টের পেতে হয়েছে—একে শুধু দুর্ভাগ্য বলা গাঁয়ের লোকের নীতিবোধ-বহির্ভূত। এই বয়সের মেয়েকে এই অভিজ্ঞতা-লাভের সম্ভাবনা-মুক্ত বলেই মনে করে সবাই। উত্তেজনা চরমে উঠল যখন সেই দিন বিকেলে গাঁয়ের পঞ্চায়েতী সভায় একটা চিঠি এল। নিশ্চয়ই কোন হ্যান্‌চিয়েন১ চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটায় এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে 'রাজকীয় বাহিনী'কে অভ্যর্থনা করার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা যেন

১। বিশ্বাসঘাতক।

লাল পায়জামা

প্রস্তুত থাকে, শান্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'রাজকীয় বাহিনী' আগামীকাল গাঁয়ে পৌঁছবে। যদি দেখা যায় যে কোন লোক গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তাহলে 'রাজকীয় বাহিনী' একটি ঘরও আস্তো রাখবে না। কি যে হবে, সে সম্পর্কে কারও আর কোনও সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা 'আধুনিক কায়দা'র শরণ নিয়েছে—কাঁচি দিয়ে ছেঁটে ফেলেছে মাথার লম্বা লম্বা চুল, এখন তাদের মাথায় ছোট ছেলেদের মত একটু ঝুঁটি ছাড়া আর কিছু নেই, পছন্দ হোক আর না হোক।

মেয়েদের মধ্যে অনেকের মনেই দুঃখ হল যে ওদের পা এখনো বাঁধানো কিন্তু ওদের পোষাকের মধ্যে যে জিনিসটা সব চেয়ে বেশী নজরে পড়ে, তা হচ্ছে ওদের লাল পায়জামা।

তিন মাস হল কুয়ান সিয়াও-শুয়ান-এর বিয়ে হয়েছে। তিন মাসের বৌটির লাল পায়জামা খুলে ফেলবার সময় অন্য একটা বাস্তব অসুবিধা দেখা দিল। ওর পায়জামাটাই নিঃসন্দেহে গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে নতুন, এবং এত জলকাদা লাগবার পরেও পায়জামাটার টকটকে লাল রঙ একটুও ম্লান হয়নি। পায়জামাটা খুলবে কিনা সেটা এখন আর প্রশ্নই নয় এবং তা নিয়ে ওর কোন দুশ্চিন্তাও নেই, ওর সমস্যাটা হচ্ছে এই—পায়জামাটা ছাড়লে পরবার মত আর কোন কিছু ওর নেই। গতবার পাহাড়ের দিকে পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় যে পোঁটলাটা হারিয়ে গেছে, তার মধ্যেই ওর সমস্ত এবং সিয়াও-শুয়ানের কয়েকটা পোষাক ছিল। ফিরে এসে গত দুই মাসে কয়েকটা অন্তর্বাস, এক জোড়া জুতো, দু জোড়া মোজা ও তৈরী করে নিয়েছে। আর একটা পায়জামা যে দরকার হতে পারে তা ও ভাবেনি—চোখে না পড়ে এমনি কোন রঙের পায়জামার কথা তো নয়ই। বাপের বাড়ীতে গিয়ে ও অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু দেবার মত অতিরিক্ত পায়জামা কারও নেই।

যখন ফিরে এল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ; তেলের বাতিটার অস্পষ্ট আলোয় খাটের ওপর বসে শূন্য হতাশায় চুপ করে বসে রইল ও।

বিকেলবেলাটা নানা গোলমালে কাটিয়ে কুয়ান সিয়াও-শুয়ান বাড়ী ফিরল এবং তার ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে লাল পায়জামার সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল।

সন্ধ্যার গোড়ার দিকে পঞ্চায়েতী সভায় গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে কুয়ান সিয়াও-শুয়ানের একটু ঝগড়া মত হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক রকমের বিষণ্ণ ও বিরক্ত অবস্থায় সভা ছেড়ে চলে এসেছে সে। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পেল যে তার বৌ এখনো লাল পায়জামাটা ছাড়েনি। এই পায়জামা দেখে এতদিন সে খুশি হত কিন্তু আজ শিউরে উঠল। তারপর হঠাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে নিজের পরনের কালো সুতীর পায়জামাটা খুলে ফেলল, এবং বৌয়ের দিকে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে নীরস গলায় বলল, 'এটা পরে নাও।'

বৌ তার দিকে তাকাল।

বৌয়ের দৃষ্টির উত্তরে সে আবার জোর গলায় বলল, 'এটা পরে নাও।'

বৌ তার মেজাজটা খুব ভাল করেই জানত, সুতরাং আর কোন প্রশ্ন না করে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল।

গায়ের জামাও বদলাবদলি করল দুজনে—বৌয়ের সবুজ জামাটা পরল সে, তার কালো জামাটা উঠল বৌয়ের গায়ে।

অল্পবয়স্ক বৌটির মনে যদিও নানা কৌতূহল ও সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু মুখে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করবার সাহস হয়নি।

স্বামীকে আবার বেরিয়ে যেতে দেখে ওর চোখে জল এল। দরজার সামনে একবার থমকে দাঁড়াল সে, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'যাও, শুতে যাও। কাল আমি ফিরব।'

পরদিন সূর্যের প্রথম আলোয় গাছের মাথাগুলো সবেমাত্র ঝলসে উঠেছে, এমন সময় 'রাজকীয় বাহিনী' উপস্থিত হল। সবশুদ্ধ এগারোজন, কিন্তু দশটা মাত্র ঘোড়া—হান্‌চিয়েন পায়ে হেঁটে এসেছে। শান্তি প্রচারে বেরুবার আগে হান্‌চিয়েন তাদের গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসাল, এবং মোড়লকে আদেশ দিল যেন এক্ষুনি চা দেওয়া হয়।

'রাজকীয় বাহিনী আপনাদের খাদ্যভাণ্ডার স্পর্শও করবে না,' হান্‌চিয়েন গাঁয়ের মোড়লকে বলল, 'শুধু কয়েকটা চুঙহুয়াপিন[১] ভেজে আনলেই চলবে।'

'যে আজ্ঞে।'

হান্‌চিয়েন বলে চলল, 'রাজকীয় বাহিনী গরীব লোকদের কাছে কিছু দাবী করবে না। তবে গাঁয়ের লোকরা যখন শান্তিবাণী গ্রহণ করতে আসবে, তারা প্রত্যেকে যেন কয়েকটা কপি নিয়ে আসে।'

'যে আজ্ঞে।'

'আর কয়েকটা শালগম।'

'যে আজ্ঞে।'

'আর এক্ষুনি একশোটা তাজা ডিম চাই।'

নিজের অজান্তেই মোড়ল একবার চোখ বোঁচ করল, ইতস্তত করল একটু, তারপর ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, 'যে আজ্ঞে।'

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে উঠোনে ঘোড়া দশটা পাকা কলাই খেতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জাফরি-কাটা জানলার আড়ালে বসে সাতজন জাপানী সৈন্য ও হান্‌চিয়েন চুঙহুয়াপিন গিলতে লাগল গোগ্রাসে। কিন্তু

১ চুঙহুয়াপিন। গোল চেপ্‌টা ফুলুরির মত। ময়দা ও পেঁয়াজ দিয়ে তৈরী, তেলে ভাজা। উত্তরাঞ্চলের প্রিয় খাদ্য।

'রাজকীয় বাহিনী'র আর তিনজন গেল কোথায়? সবাই বলাবলি করল, ওরা গেছে তরকারীর ক্ষেত দেখতে।

খাওয়া শেষ হবার পর মোটা সার্জেণ্টটা কি যেন বলল হান্ চিয়েনকে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মোড়লের কাছে এসে বলল, 'হ্যাঁ, এবার শান্তি-প্রচারের সময় হয়েছে। গাঁয়ের চারদিকে ঢোল পিটিয়ে দাও—শান্তি-বাণী গ্রহণ করবার জন্যে গাঁয়ের সমস্ত লোক যেন এখানে জড়ো হয়।'

গাঁয়ের আশিটা বাড়ী থেকে ঠিক আশিজন লোক এল, একজনও বেশী নয়। তার মধ্যে অর্ধেক শিশু। সংখ্যাটা ঠিক রাখবার জন্যে ওদের বাড়ীর ভেতর থেকে টেনে আনা হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দু ঝাঁক কপি ও শালগম এবং এক ঝুড়ি ডিম সাজানো।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মোটা সার্জেণ্টটা শান্তিবাণী প্রচার করতে শুরু করল। দোভাষীর কাজ করল হান্ চিয়েন। 'রাজকীয় বাহিনীর পরাজয় নেই। কখনো নয়। এই বাহিনী প্রকৃতই অপরাজেয়। আমরা চীনাদের হত্যা করবার জন্যে আসিনি, রক্ষা করতে এসেছি···চীনের সব চেয়ে জংলী আর অসভ্য ডাকাতের দল হচ্ছে অষ্টম রুট বাহিনী এবং সশস্ত্র সেনাদল···এবার থেকে তোমরা রাজকীয় বাহিনীর কাছে এই সমস্ত ডাকাতদলের সমস্ত সংবাদ পৌঁছে দিও···',

তারপরেই পর পর প্রশ্ন আর উত্তরের পালা শুরু হল।

'রাজকীয় বাহিনী কি হত্যা করে?'

'না!'

'লুটপাট করে?'

'না!'

'ঘরদোর পুড়িয়ে দেয়?'

'না!'

'রাজকীয় বাহিনীকে কি তোমরা ভয় করো?'

'না, আমরা ভয় করি না।'

'তাহলে এটা কেন হয় যে ওই ডাকাতের দল যখন আসে তোমরা গাঁ ছেড়ে যাও না, কিন্তু আমরা এলেই পালাও?'

কোন উত্তর এল না।

মোটা সার্জেণ্টটা বুঝতে পারল এই প্রশ্নে তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেছে, সুতরাং বক্তৃতা শেষ করাই উচিত মনে করল সে।

এবার তাদের যাবার সময় হয়েছে। সবজি ও ডিম ঠিক করা হল। কিন্তু সেই লোক তিনজন এখনো আসেনি। মোটা সার্জেণ্টটা হান্ চিয়েনকে গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞেস করতে বলল যে ওই তিনজনকে ওরা দেখেছে কিনা বা কোথায় গেছে জানে কিনা। দেখা গেল, কেউ কিছুই জানে না।

তাদের সন্ধান করবার জন্যে মোড়ল কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ পর লোকজন ফিরে এসে বলল যে 'কোথাও তাদের ছায়াও দেখা যায়নি।'

তখন মোড়ল নিজেই তাদের সন্ধানে বেরুল।

ওই কুয়ান সিয়াও-শুয়ান-এর বৌ-মাগীই বোধ হয় বিয়ের সাজ পোষাকের ঘটা দেখিয়ে জাপানী তিনটেকে আটক করেছে। এই কথা ভেবে মোড়ল কুয়ান সিয়াও-শুয়ান-এর ঘরটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। খাটের এক কোণে কুয়ান সিয়ান-শুয়ান জড়োসড়ো হয়ে জবুথবু অবস্থায় বসে আছে। দেখে যেমন রাগ হল, তেমনি হাসি পেল।

'এই যে! বীরপুরুষ!' একেবারে ফেটে পড়ল মোড়ল, 'আমি কখনো ভাবিনি যে তুমি এখানে মেয়েলোকের মত লুকিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, ওই

শয়তান তিনটেকে প্রলুব্ধ করে তোমার বৌ কোথায় নিয়ে গেছে বলো তো?'

কথাগুলো বলেই কিন্তু মোড়ল বুঝতে পারল যে সে এতক্ষণ যার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছিল সে-ই কুয়ান সিয়াও-শুয়ানের বৌ। বুঝতে পেরে মোড়ল হতভম্ব হয়ে গেল, এত রেগে উঠেছিল যে হাসবার ক্ষমতাও ছিল না এবং তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ী বাড়ী খুঁজে ওই শয়তান তিনটেকে বার করতে।

প্রত্যেকটি বাড়ী খুঁজে মোড়ল যখন চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এল তখন বিরক্তিতে তার মুখে আর কথা সরছে না। সে ভাবতেও পারেনি যে ঈশ্বরের ক্রোধ এত তাড়াতাড়ি তার ওপর বর্ষিত হবে। হতভম্ব ও বিমূঢ় ভাবটা কাটাবার পর সে দেখল, চণ্ডীমণ্ডপের সামনে একটা ঝাউগাছের সঙ্গে তাকে বাঁধা হয়েছে।

গাঁয়ের ভেতর একটা আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল।

হঠাৎ দূরে একদল লোককে দেখা যেতেই উত্তেজনাটা চরমে উঠল। একটি এগারো বছর বয়সের ছেলেকে টেনে আনতে আনতে লোকগুলো চিৎকার করে বলছে, 'ও জানে! ও জানে!'

'তুমি কি জান কোথায় ওরা গেছে?' হান্‌চিয়েন জিজ্ঞেস করল। লোকটি কুঁজো, কিন্তু মুখের ওপর একটা খাঁটি কর্তৃত্বসূচক মনোভাব আছে।

'আমি দেখলাম ওরা পুবদিকের রাস্তাটা ধরে লাল পায়জামা পরা একটি মেয়েলোকের পেছনে পেছনে ছুটেছে। মেয়েলোকটির পেছনে পেছনে ওরা অনেক দূর চলে গেল, তারপর আর তাদের দেখাই গেল না। ওদের আমি আর দেখিনি।'

ছেলেটির কথাগুলো অনুবাদ করে হান্‌চিয়েন মোটা সার্জেণ্টকে শোনাল।

বোমার মত ফেটে পড়ল মোটা সার্জেণ্টটা, তার কথাগুলো হান্‌চিয়েনের মুখে এই রকম শোনাল:

'লাল পায়জামাধারীদের এক্ষুনি এখানে এনে হাজির করো।'

শ্রোতারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ কে যেন একজন পেছন ফিরে তাকিয়ে ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর শব্দ করল কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘুরে দাঁড়াল দক্ষিণদিকে—যেন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় গমের শিস নুয়ে পড়েছে।

'ওই যে লাল পায়জামা আসছে,' এলোমেলোভাবে ওরা চিৎকার করে উঠল।

দেখা গেল, লাল পায়জামা পরা কে একজন লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। (আচ্ছা, কোন মেয়েলোক কি এত বড় বড় পা ফেলতে পারে?—অবাক হয়ে ভাবল ওরা।) ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন দেখা গেল যে লোকটার পেছনে পেছনে ধূসর সামরিক পোষাক-পরা একদল সৈন্য ছুটে আসছে। বনের ভেতর দিয়ে সোজা রাস্তাটা দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছে ওরা।

'ওই যে লাল পায়জামা! ওই যে লাল পায়জামা!'

সঙ্গে সঙ্গে 'রাজকীয় বাহিনী'র সেই সাতজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে উত্তরদিকে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। কপি, শালগম, ডিম—এসবের দিকে ফিরেও তাকাল না একবার। তাছাড়া লাভ হল, তিনটে '৩৮ রাইফেল, তিনটে ঘোড়া। হান্‌চিয়েনও চেষ্টা করছিল ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পর পর দুবার চেষ্টা করেও ঘোড়ার পিঠের ওপর উঠে বসতে পারেনি (ঘোড়াটা ওর তুলনায় অত্যন্ত ছোট)। তখন ও ছুটতে শুরু করল, যেদিকে অশ্বারোহী সৈন্যরা পালিয়েছে সেদিকে।

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত হান্‌চিয়েন পালাতে পারেনি। গাঁয়ের অপর একটি কুয়ান বংশের যুবক ছেলে কুয়ান পেই-সুই ওকে ধরে ফেলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল পায়জামা আর তার অনুগামীরা হাজির হল। কিন্তু হায়! যারা লাল পায়জামার পেছনে পেছনে ছুটেছিল, তারাই এখন বন্দী।

লাল পায়জামা পরা লোকটি অন্য আর কেউ নয়, কুয়ান সিয়াও-শুয়ান নিজে, পোষাক বদলাবার সময়ও তার হয়নি।

এক পা এগিয়ে এসে সবার দিকে ফিরে তাকিয়ে কুয়ান সিয়াও-শুয়ান বলল, 'বেশ, এই তো আমরা চাই, এই সবজি আর ডিম গ্যেরিলাদের দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, আপনারা কি মনে করেন যে এই গাঁয়ে আমরা বসবাস করতে পারব?'

সবাই চুপ করে রইল।

'তাহলে আমরা কি করব? খুব সোজা উপায় আছে, চলুন পাহাড়ে গিয়ে গ্যেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিই। এখানে আর কিছু ফেলে রাখব না।'

'হ্যাঁ ঠিক, তাই যাওয়া যাক।' জনতা একসঙ্গে উত্তর দিল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই জনতার সংখ্যা বেড়ে প্রায় পাঁচশোতে দাঁড়িয়েছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা গেল, বিরাট লম্বা একটা লাইন ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরুষরা হেঁটে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে খচ্চর, গরু, বলদ আর গাধা। জন্তুগুলোর পিঠে স্থানান্তরসাপেক্ষ আসবাব। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সবার হাতে শক্ত শক্ত পোঁটলা; মুরগী আর নবজাত শুয়োরগুলোকে এই সব পোঁটলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কুয়ান সিয়াও-শুয়ান আর তার বৌ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। দূর থেকে স্ত্রী-পুরুষ বলে স্পষ্ট চেনা যায়—কিন্তু কোন্ জন স্ত্রী আর কোন্

জন পুরুষ তা বলা খুব সহজ নয়। পরস্পরের পোষাক বদলে নেবার কথা ওরা একবারও ভাবেনি।

সেই দিন রাত্রে গ্যেরিলা হেডকোয়ারটার্স-এ নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে একটি অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হল। সেই সভায় গ্যেরিলা-অধিনায়ক বিশেষ করে কুয়ান সিয়াও-শুয়ানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার দেশপ্রেম ও সাহসের প্রশংসা করলেন। কুয়ান সিয়াও-শুয়ানকে একটি পুরস্কার দেবার জন্যে তিনি সুপারিশ করবেন বলে কথা দিলেন,—কারণ সে তিনটে জাপানী ও একটা হান্‌চিয়েনকে বন্দী করেছে; তিনটে রাইফেল ও তিনটে ঘোড়া অধিকার করেছে; আর, অধিনায়কের মতে সব চেয়ে প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে, গাঁয়ের সমস্ত লোককে গ্যেরিলা দলে যোগ দেবার জন্যে পরিচালিত করে দলের শক্তিবৃদ্ধি করা। যখন কুয়ান সিয়াও-শুয়ান শুনল যে তাকে পুরস্কৃত করা হবে, তখন সে সাহসে ভর করে আমতা আমতা করে কোন রকমে বলে ফেলল, 'আজ্ঞে, আর কিছু না—শুধু একটা পোষাক চাই আমি।'

অধিনায়ক হাসলেন, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর নজরে পড়েছে যে কুয়ান সিয়াও-শুয়ান এখনো সেই লাল পায়জামাটা পরে আছে।

তৎক্ষণাৎ তাকে একটা ধূসর সামরিক পোষাক দেওয়া হল। সভা শেষ হলে নতুন পোষাকটা পরল সে, সবুজ জামা ও লাল পায়জামাটা থেকে ধুলো ঝাড়ল ভাল করে, তারপর সযত্নে ভাঁজ করে পোঁটলা বাঁধল।

গর্বিত পদক্ষেপে তারপর ও এগিয়ে গেল কাদার দেওয়াল ঘেরা উঠোনটার দিকে, সেখানে অস্থায়ীভাবে মেয়েদের স্থান করা হয়েছে। বৌকে খুঁজে বার করে হাতের পোঁটলাটা ওর কোলের ওপর আস্তে ফেলে দিল সে, তারপর বৌয়ের কাঁধে বাঁ কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে এক গাল হেসে বলল, 'রেখে দাও, সুদিন এলে পরবে।'

ইয়াও সে ইন্

'ওই যে! আর একজন আধখেঁচড়া!'

কিছুকাল হল আমাদের গ্যেরিলা বাহিনীতে পরস্পরকে আধখেঁচড়া বলে ডাকা একটা অদ্ভুত রোগের মত দাঁড়িয়ে গেছে। হয়ত কোন সময়ে ক্যাপ্টেনের কাছে একটা সিগারেট চেয়েছি, কিন্তু ক্যাপ্টেনের তা দেবার ইচ্ছা নেই, অথচ আমরা জানি যে তার পাশের পকেটে অনেকগুলো সিগারেট লুকোনো আছে—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার মুখের ওপর চিৎকার করে উঠি, 'হায় হায় ক্যাপ্টেন তুমিও আধখেঁচড়া হয়ে উঠছ!' কিংবা হয়ত, আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ার মত প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে কেউ হেঁচেছে আর তারপর নাক দিয়ে গড়ানো হলদে শিকনিটা মুছে নিয়েছে নোংরা জামার আস্তিনে বা দু আঙুলের ফাঁকে তুলে নিয়ে আঙুল ঘষেছে ছেঁড়া জুতোর তলায়—সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ঠাট্টার সুরে বলে উঠবে, 'দেখ, দেখ, বেটা আধখেঁচড়ার কাণ্ড দেখ!'

আমাদের এখানে উকুনের বড় উৎপাত। তবুও এই জীবগুলোর উপস্থিতিতে আমরা আতঙ্কিত হই না। পরনের ছেঁড়া পোষাক হাতড়ে হাতড়ে উকুনগুলোকে আমরা মেরে ফেলি, কিংবা যদি খুব বেশী তালি থাকে তবে পোষাকের তলায় হাত গলিয়ে দিই। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে না পড়লে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াইয়ের কথা আমরা কখনো ভুলে যাই না। দুই শত্রুর একজন 'কোয়েইজ্', অপরটি 'শিইজ্'—বিদেশী শয়তান আর উকুন। সময়ে সময়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করি

আধখেঁচড়া

শত্রুদের ওপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উকুনদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রায়ই আমরা বড় বড় আগুন জ্বালি, তারপর জামাকাপড় খুলে ভীষণভাবে ঝাড়তে থাকি আগুনের ওপর। শত্রুর দল টপ্ টপ্ করে আগুনের ওপর ঝরে পড়ে—তাদের ফোলা ফোলা পেটগুলোকে মনে হয় যেন চমৎকারভাবে ভাজা তিল। মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ার মত একটা অবিশ্রান্ত ফট্ ফট্ আওয়াজ হতে থাকে আগুনের ভেতরে, একটা অবর্ণনীয় ও অসহ্য গন্ধ ঢোকে আমাদের নাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই জয়লাভে আমরা প্রচণ্ডভাবে উল্লসিত হয়ে উঠি। লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে, আমরা শুধু বলতে থাকি, 'এস! কুট্ কুট্ করে কামড়াতে এস! বেটা আধখেঁচড়া!'

হ্যাঁ, এই 'আধখেঁচড়া' কথাটা আমাদের এখানে সব সময়ে এত বেশী ব্যবহার হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন সময়ে এই নামে সম্বোধিত হবার সম্মানলাভ ঘটেছে। ঘটনার সঙ্গে কথাটার কোন মিল আছে কিনা তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, কিংবা কাউকে এই সম্বোধনে সম্মানিত করবার সময় তার প্রতি যে আমাদের একটা বিরূপ মনোভাব থাকে তাও নয়। কথাটা শুনেই আমরা খুশি হই, এবং এই কথাটা না থাকলে আমাদের সৈন্য-জীবন শীতের বিবর্ণ পাহাড়ের মতই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠত।

এইভাবে যদিও এই 'আধখেঁচড়া' নামটা আমরা যখন তখন ব্যবহার করে চলেছি, কিন্তু আসল আধখেঁচড়া বহু আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আসল আধখেঁচড়া ছিল চাষীর ছেলে, হাসিখুশি আমুদে প্রকৃতি। আমাদের সঙ্গে শেষ দেখা, যখন ওকে একটা স্ট্রেচারে করে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজও ওকে আমরা ভুলিনি। আধখেঁচড়ার পাইপটা ক্যাপ্টেন সযত্নে নিজের কাছে রেখেছে, যেন ওটা তার

প্রণয়িনীর প্রেমপত্র। ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সবাই আধখেঁচড়ার পাইপে তামাক টানার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। আহত হবার আগে পর্যন্ত আধখেঁচড়ার একটা স্বভাব ছিল পাইপটা মুখে ধরে থাকা, তামাক থাকুক আর না থাকুক। গাঁয়ের চারপাশে যখন ও বেড়াতে বেরুত বা ভুরু টান করে বসত কোন ছোট গাছের নীচে বা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দূরবিস্তৃত মাঠের দিকে, ওর পাইপটা কখনো মুখছাড়া হত না। মাঝে মাঝে ও অন্যমনস্কভাবে তাকাত পাইপটার দিকে, ঠোঁট চাটত, আর ওর নাকের গর্ত দিয়ে ধূসর ধোঁয়া সরু সরু রেখায় বেরিয়ে এসে পাক খেয়ে খেয়ে উঠত আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে হয়ত অন্য কোন গ্যেরিলা-সৈন্য ওকে এইভাবে আপন মনে চুপ করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করত, 'কি হে আধ-খেঁচড়া, তোমার সেই সোনামুখী বৌয়ের খবর কি ?'

একটু সলজ্জ হেসে ও বলত, 'ওকে ছাড়া আমার আর দিন কাটছে না। ক্যাপ্টেন আমাকে এখনো বলেনি ও কোথায় আছে। ছেলেটাই বা কোথায় আছে কে জানে।' আধখেঁচড়া মনে করত, ক্যাপ্টেন সর্বজ্ঞ। ওর বৌ আর ছেলের খবর যে ক্যাপ্টেন ওর কাছ থেকে গোপন রেখেছে তার কারণ হয়ত এই যে খবরটা পেলেই ও বৌ আর ছেলের পেছনে ছুটবে। অবশ্য পারিবারিক চিন্তা ছাড়াও অন্য সব চিন্তাও যে ছিল না তা নয়।

'দেখ, দেখ, আগাছায় মাঠটা একেবারে ভরে গেছে,' খুঁতখুঁতে গলায় ও বলত, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লম্বা টান দিত তামাকের পাইপে। নাক আর মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোত ভস্ ভস্ করে আর ও বলত, 'শান্তির সময়ে লোকে চাষবাস করত নির্বিবাদে। তখন ক্ষেতে এইভাবে আগাছা গজাতে পারত না।'

কথাটা বলে চোখের পিচুটি পরিষ্কার করত জামার আস্তিন দিয়ে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে খানিকটা মাটি তুলে নিত আঙুলে, এবং আঙুলের চাপে মাটিটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিয়ে তুলে ধরত নাকের সামনে, সামান্য একটু ঠেকাত জিভে, তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করত, 'চমৎকার মাটি—কী রসালো !'

সৈন্য-জীবনে আধখেঁচড়া একটিও জাতীয় সংগীত শিখতে পারেনি। অবশ্য একবার কোরাসে গান গাইবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা শুনে হাসতে হাসতে চোখের জল এসে গিয়েছিল অন্য সবার। তারপর আর সে চেষ্টা করেনি। যখন আমরা গান গাইতাম, ও চুপ করে বসে বসে পাইপ টানত আর রক্তবর্ণ চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। একটি, শুধু একটি গান ও জানত এবং সেটা গাইবার সময় অসময় ছিল না। খুব আনন্দ বা খুব দুঃখ, যাই হোক না কেন—কল্পনাতীত রকমের গম্ভীর গলায় সেই একটিমাত্র গান গাইত ও। গানটা মাত্র দু লাইনের এবং নিশ্চয়ই ওর ছেলেবেলায় শেখা।

পিছে বহুদূরে রাজধানী এই কী বিশ্রী পরিবেশ ;
উদ্দাম কাল বৈশাখী ঝড় বৃষ্টির নেই শেষ।

ব্যাপারটা এই রকম। শীতকালের এক সন্ধ্যায় একজন বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়াতে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল শিবিরের সৈন্যদের মধ্যে। লোকটিকে সকলের সামনে দাঁড় করানো হল, দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, পা দুটো কাঁপছে ঠক ঠক করে, মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ। ওর মাথায় ছেঁড়া পশমের টুপি, একটা কাস্তে ঝুলছে পিঠের ওপর, কোমরের বেল্টে গুঁজে-রাখা পাইপের মুখটা বেরিয়ে রয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নয়, আমাদের আধখেঁচড়া।

ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সূর্য-পতাকাটা সম্পূর্ণ শান্তভাবে হাতে

নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলল ক্যাপ্টেন। কিন্তু সৈন্যরা সমানে চিৎকার করতে লাগল, 'বেটা আবার চাষীর মত সাজপোষাক করেছে, শুয়োরের বাচ্চা!' কেউ কেউ বলল, 'গুলি করে মারা হোক বেটাকে, ওই ওর উচিত শাস্তি!'

হঠাৎ কে যেন আচমকা লাথি মারল ওকে। ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে এমনভাবে গড়াগড়ি দিতে লাগল ও যেন ওর শরীরটা একেবারে পঙ্গু। বন্দীর এই আপাত-অসহায়তা দেখে অত্যন্ত হতাশ হল গ্যেরিলারা। কে যেন বলল, 'দূর, একেবারে অপদার্থ!'

ক্যাপ্টেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, যেন বন্দীর অন্তস্থলে কিছু একটা রহস্য খুঁজে বার করবে।

বিশ্বাসঘাতক বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। আমার নাম বোবা ওয়াঙ—সবাই তা জানে!'

'তোমার নাম কি শুধু ঐ একটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা। আমার বাবা ছিলেন মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। বাবাই আমাকে এই নামটা দেন। বাবা বলতেন, ভাল নাম রাখলে বিপদ হয়, দুষ্ট গ্রহের কোপ পড়ে।'

'তোমার আসল নামটা কি? উঠে দাঁড়াও!'

'আজ্ঞে কর্তা, আসল নাম তো আমার নেই।' দু পায়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে গভীর একটা নিশ্বাস নিয়ে বোবা ওয়াঙ বলল। 'বাবা বলতেন, চাষীর ছেলেকে স্কুলেও যেতে হবে না, আপিসও করতে হবে না—কাজেই চাষীর আবার আসল নামের কী দরকার?'

'আচ্ছা, ডাকনামটা কি শুনি?'

'আজ্ঞে কর্তা, আধ-খেঁচড়া।'

ক্যাপ্টেনের কালো গোঁফের প্রান্তভাগটা নেচে উঠল।

'কি বললে ?'

'আধখেঁচড়া', উত্তর দিল বোবা ওয়াঙ, 'ওই নামেই সবাই আমাকে ডাকে।'

আমাদের সৈন্যেরা আর চেপে থাকতে পারল না, ফেটে পড়ল হাসিতে।

ক্যাপ্টেন কিন্তু মোটেই কৌতুক বোধ করল না, বেচারা বন্দীর ওপর সমানে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করে চলল। কোথায় ওর ঘর, কোন্ গাঁয়ে ওর দেশ, কেন সে বিশ্বাসঘাতক হল—ইত্যাদি প্রশ্ন।

বোবা ওয়াঙ বলল, 'আমার দেশ ওয়াঙ চুয়াঙ। আসলে হল কি, উত্তরদেশের সৈন্যরা এসে আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের ধর্ষণ করল আর পুরুষগুলোকে মারতে লাগল ধরে ধরে, তখন ক্ষুদে কুকুরের মা—অর্থাৎ আমার বৌয়ের কথা বলছি—বলল, 'শোন, ক্ষুদে কুকুরের বাবা'—অর্থাৎ আমাকেই বলা হচ্ছিল—'ঘরে তো আর কিছুই নেই। দু-একজন যারা বেঁচে ছিল তারাও পালিয়েছে গাঁ ছেড়ে। এই বেলা চলে যাওয়াই ভাল। সৈন্যগুলো তো আমাদের ওপর মোটেই সদয় নয়, এর চেয়ে অন্য যে কোন জায়গা ভাল, খাবার না জোটে জল খেয়ে থাকব।' ও সত্যি কথাই বলেছিল। ক্ষুদে কুকুর আর তার মাকে নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু দুদিন জল বা ভাত কিছুই জুটল না। ক্ষুদে কুকুরের মার পেটটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কিন্তু ক্ষুদে কুকুরকে কিছু খাওয়াতেই হবে—সে শুধু অনবরত মায়ের শুকনো মাই চোষে কিন্তু কিছুই পায় না আর খালি কাঁদে…'

ওর মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল আর দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ওর রুক্ষ গালের ওপর দিয়ে। গলাটা একটু নামিয়ে ক্যাপ্টেন বলল :

'আচ্ছা এবার চট্ করে বলো তো এই নিশানটা কেন তুমি সঙ্গে এনেছিলে?'

'বলছি, কর্তা। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ক্ষুদে কুকুরের মা বলল, 'এটা হচ্ছে হাঁ-করা সৈন্য আর ধুনো ঘোড়ার যুগ। কাজেই আমাদের সাবধান হতে হবে। আমরা মরি তো ক্ষতি নেই, কিন্তু ছেলেটিকে না খেয়ে মরতে দিতে পারি না।' ঠিক কথাই বলেছিল, না কর্তা? ছেলেটা তো আর কোন দোষ করেনি। ও কেন না খেয়ে মরবে? ক্ষুদে কুকুরের মা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কয়েকটা শালগম নিয়ে এস। তাহলে আমরাও আর কিছুদিন বাঁচব আর ছেলেটাও বাঁচবে।' তাই আমি ভোরে উঠে রওনা হলাম। দুই লি দূরেই গাঁ। কিন্তু সেখানে পেতলের হেলমেট মাথায় কতকগুলো উত্তর দেশের সৈন্য ছিল। তারা আমাকে দেখেই গুলি করল। সামনের দিকে আর না এগিয়ে আমি ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি ক্ষুদে কুকুর মায়ের কোলে শুয়ে কাঁদছে ...'

কান্নায় ওর কথা আটকে গেল।

ক্যাপ্টেন বলল, 'কেঁদো না। এই জন্যেই কি তুমি বিশ্বাসঘাতক হয়েছ?'

'বিশ্বাসঘাতক হয় বোকারা, তারা মরুকগে যাক। আমি যদি বিশ্বাস-ঘাতক হই তাহলে সূর্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাতালে ঢুকব।' একবার কাঁধ-ঝাকুনি দিয়ে আধখেঁচড়া উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, 'আমি শুনেছিলাম যে যদি সূর্য-আঁকা নিশান হাতে নিয়ে উত্তরদেশের সৈন্যদের সামনে যাওয়া যায় তো কাজ হতে পারে। তাই ক্ষুদে কুকুরের মা ওই ছোট নিশানটা তৈরী করে আমার হাতে দিয়ে বলে, 'এটা নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।' আমি বলি, 'চুলোয় যাক নিশান। এটাকে দেখতে ঠিক লেইয়ের মত। যদি দক্ষিণ দেশের সৈন্যরা দেখে তো কি

হবে ?' ও বলে, 'ভয় পেও না। দক্ষিণদেশের সৈন্যরা তো আমাদের আপনার লোক—ওদের ভয় কি!' আচ্ছা কর্ত্তা, আমি নিজে চীনা হয়ে চীনাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক হব কেন? ক্ষুদে কুকুরের মা-ই তো এই বিশ্রী নিশানটা তৈরী করে আমার হাতে দিল।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ও কাঁদতে লাগল আর আতঙ্কভরা দৃষ্টিতে বারবার তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে।

ক্যাপ্টেন আরও দু-একটা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করল। তার রুক্ষ মুখচোখ নরম হয়ে এসেছে। এখন আর তাকে দেখে মনে হয় না যে সে লোহা দিয়ে তৈরী। আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, 'লোকটাকে ভাল বলেই মনে হচ্ছে। কমরেডরা এখন আর ওকে সন্দেহ করছে না। এখনো যদি আমরা প্রশ্ন করতে থাকি তবে তা ঠিক হবে না, কমরেডরা অধৈর্য হয়ে উঠবে।'

অবশেষে ক্যাপ্টেন ওর বাঁধন খুলে দিতে বলল। আধখেঁচড়ার নাক দিয়ে ঘন হলদে শিকনি গড়াচ্ছিল, বাঁধনমুক্ত হয়েই ও শিকনিটা আঙুলে তুলে নিয়ে জুতোয় মুছতে লাগল। শুকনো শিকনির দাগে ওর জুতোটা ইতিমধ্যেই ভরে গেছে।

ক্যাপ্টেন বলে চলল, 'এবার শোন, উত্তরদেশের সৈন্যদের জাপানীদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না। এখন আর এটা আগের মত গৃহযুদ্ধ নয়। এখন যুদ্ধটা হচ্ছে চীনা বাহিনীর সঙ্গে জাপানী শয়তানগুলোর যুদ্ধ। বুঝতে পেরেছ, আধখেঁচড়া ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা, ঠিক বুঝেছি। অত বোকা আমি নই।'

'আচ্ছা বেশ। আজ সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে হালুয়া আর ঝোল খাবার নেমন্তন্ন রইল। তারপর তুমি যেখানে খুশি গিয়ে শালগম তুলো। পরশুদিন রাত্রে এই গাঁ থেকে আমরা জাপানীদের হটিয়ে দিয়েছি। এই নিশানটা তুমি রেখে দিতে পার। যদি আবার তোমার সঙ্গে ওই

বিদেশী শয়তানগুলোর সাক্ষাৎ হয় তবে এই নিশানটা তাদের দেখাতে পার, কিন্তু আমরা কোথায় আছি সে কথাটি বোলো না।'

খেতে বসে আমরা সবাই আধখেঁচড়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করলাম। ভীড়ের চাপে ওর তুলোভরা পায়জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল প্রায়। প্রথম প্রথম ও ছিল বিনম্রী ও সংযত কিন্তু পরে ওর সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে তত ওর সাহসও বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড খিদে ওর, এমন কি পাত্রের ভেতরটাও জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেয়ে ফেলে। খাবার সময়ে কেমন একটা সন্তোষের ভাব ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে, নাকের শিকনি ঝাড়ে মাঝে মাঝে, ঢেকুর তোলে, আঙুলের নখ দিয়ে দাঁতে আঁচড় কাটে, আর মাঝে মাঝে পেঁয়াজের খোসা বা ঐ জাতীয় জিনিস ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ফেলে যে পাশের কমরেডের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যায়।

পরদিন লাঞ্চের পর আবার আধখেঁচড়াকে দেখতে পেলাম। ক্যাপ্টেন বলল যে আধখেঁচড়া গ্যেরিলা দলে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেছে এবং আমাদের বাহিনীতে ওকে নেওয়া হয়েছে। আমরা এত খুশি হলাম যে ওকে ঘিরে নাচতে থাকি এবং গ্যেরিলা-গান গাইতে শুরু করে দিই। আধখেঁচড়া কিন্তু অবিচলিত রইল; উৎফুল্ল বা বিষণ্ন, কোনটাই হল না। পাইপটা দাঁতে চেপে বোকার মত হাসতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

রাত্রিবেলা দেখলাম, আমার পাশেই ওর বিছানা। জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, কেন তুমি গ্যেরিলা দলে যোগ দিলে?'

'কেন দেব না? তোমরা সবাই বেশ ভাল লোক।' একটু থেমে ও তামাকের পাইপে প্রচণ্ড একটা টান দিল, 'আর শয়তানগুলোকে না তাড়ালে জমি চাষ করাও সম্ভব নয়।'

জাপানী নিশানটার কথা আমার মনে পড়ল। ঠাট্টা করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই নিশানটা নিয়ে কি করলে?'

'ও ওটা খেলা করবার জন্যে ক্ষুদে কুকুরকে দিয়ে দিয়েছি।' এমনভাবে ও কথা বলল যেন ব্যাপারটার আর কোন গুরুত্বই নেই তার কাছে।

নানা বিষয়ে আমরা কথা বললাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেশী শয়তানগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চায় ও। তখন আবার ও চাষবাস করতে পারবে। ওর ইচ্ছা, ওর বৌ আর ছেলেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। প্রায়ই সে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে, দু-একটা শামুক হয়ত ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দেখেও না দেখবার ভান করি এবং ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে ও পাইপটা দাঁতে চেপে বিছানার ওপর উঠে বসে, চোরের মত তাকায় আমার দিকে আর বাতিটার দিকে, একবার হয়ত বাইরে উঠোনে যায় প্রস্রাব করবার জন্যে, কাশে খুক খুক করে, ঠুকে ঠুকে পাইপের তামাক ফেলে তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

'দুষ্টুমি বুদ্ধিটা ঠিক আছে,' আমি ভাবলাম।

এই সমস্ত অস্থায়ী শিবিরে আমরা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখি। কিন্তু আধখেঁচড়া আসবার পরেই পর পর দু রাত্রি বাতিটা নিভে যাওয়ার ফলে নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। একদিন রাত্রে প্রস্রাব করবার জন্যে বাইরে যাবার সময় একজনের নাক মাড়িয়ে দিয়েছে আর একজন। এর চেয়েও ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটেছে পরের দিন রাত্রে। প্রহরীর রাইফেল থেকে হঠাৎ কি করে যেন একটা গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে জেগে উঠে আমরা প্রতি মুহূর্তে একটা আক্রমণের আশা করেছি। অন্ধকারে বন্দুক খুঁজবার সময় ঠেলাঠেলি ধাকাধাক্কি শুরু হয়েছে এবং টর্চের আলো থাকা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের বন্দুক নিয়ে টানাটানি করেছি। কিন্তু কেউ বেয়নেট খুঁজে পায়নি। বাঘের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম আমরা প্রত্যেকে।

এই ঘটনার পর আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, বাতি নেবানোর জন্যে কে দায়ী খুঁজে বার করতে। ক্যাপ্টেন একে একে সমস্ত কমরেডদের প্রশ্ন করল, কিন্তু কেউ দোষ স্বীকার করল না। আধখেঁচড়াকে সন্দেহ হতে লাগল আমার। ওর মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে, হাঁটু দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ক্যাপ্টেন যখন ওর কাছে গেল, চারদিকের সমস্ত দৃষ্টি আধখেঁচড়ার ওপরেই নিবদ্ধ। 'ভীষণ শাস্তি পেতে হবে ওকে!' মনে মনে আমি বললাম। ওর পা দুটো আরও ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল, প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার মত অবস্থা। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ হাসল ক্যাপ্টেন, তারপর নরম গলায় জিজ্ঞেস করল :

'এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছ তো?'

আধখেঁচড়া উত্তর দিল, 'ঠিক আছে! আস্তে আস্তে অভ্যেস হবে। পাইপে একটা টান দেবে নাকি, ক্যাপ্টেন?'

হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা সকলে। কেউ কেউ এত হাসল যে পেট চেপে বসে পড়তে হল মাটিতে। ক্যাপ্টেনও হাসল; হাঁচল দু-একবার। আধখেঁচড়া কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারল না ওর কথায় হাসবার এত কি আছে। মুখের একটি মাংসপেশীও নড়ল না ওর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোল কিছুক্ষণ, তারপর জামার কলারের তলায় হাত ঢুকিয়ে উকুন ধরল একটা। এবং উকুনটাকে দু আঙুলে চেপে ধরে মুখে পুরে দিল গপ্ করে এবং কড়মড় করে চিবিয়ে দু টুকরো করে ফেলল একেবারে।

পরদিন আধখেঁচড়াকে একপাশে ডেকে এনে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কেন সে পর পর দু রাত্রি বাতি নিবিয়েছে। সলজ্জ হাসি হেসে আমতা আমতা করে সে বলল :

'আজকাল তেল কি আক্রা জানো তো!...'একবার ঘাড় চুলকিয়ে আবার

বলল, 'তাছাড়া আলো জ্বললে আমার ভাল ঘুম হয় না। পাইপে একটা টান দেবে নাকি ?'

ক্রমে ও আমাদের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ওর চিন্তায় এল বলিষ্ঠতা। এখন ও গেরিলাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে, নিজের মতামতও প্রকাশ করে মাঝে মাঝে। আমাদের সাংকেতিক ভাষাগুলো পর্যন্ত ও শিখে ফেলেছে। রাস্তাকে বলে 'ফালি', নদীকে বলে 'ফিতে', চাঁদকে বলে 'উনুন' এবং এমনি ধরনের আরও অনেক কথা। এ সম্পর্কে ওর নিজের মন্তব্য হচ্ছে এই :

'অনেক সাধারণ কথা আছে যা অমঙ্গলসূচক। সেগুলো মুখে না আনাই ভাল। কিন্তু ক্ষেতে কাজ করবার সময় অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। অবশ্য এখনকার কথা আলাদা, এখন আমাদের বন্দুক হাতে নিতে হয়েছে… '

উত্তরে আমরা ওকে বললাম যে আমরা হচ্ছি গেরিলা-যোদ্ধা, একটা বিপ্লবী আদর্শ আছে আমাদের। কুসংস্কার আমরা মানি না। আধখেঁচড়া কোন দিনও আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়নি, আমাদের কথা শুনে একটু বিদ্রূপাত্মক সুরে শুধু বলেছে, 'আমি চাষাভুষো লোক। এসব কথা আমার মাথায় ঢোকে না।'

একদিন আমি ওকে বললাম যে গেরিলাদের সঠিক সম্বোধন-রীতি 'কমরেড' বলে ডাকা, আসল নাম না বললেও চলে।

মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল ও, তারপর চাপা স্বরে বলল :

'আচ্ছা দাদা, আমাদের গাঁয়ে তো সবাই নাম ধরেই ডাকে। ওই ভাবে ডাকাই তো রীতি।'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'আমরা বিপ্লবী। আমাদের চালচলন আলাদা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলাদা…' অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল ও, 'তোমাদের এই আলাদা চালচলনগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আচ্ছা শোন, তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। সবাইকে আমরা কমরেড বলে ডাকি, তার মানে আমরা সবাই মনেপ্রাণে এক। ভাল করে ভেবে দেখ। একভাবে দিন কাটাচ্ছি, একসঙ্গে মরছি, একই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, একই রকম ভাগ্য আমাদের। আমরা কমরেড নই ?'

ও বলল, 'ঠিক কথা দাদা। আমরা যদি মনেপ্রাণে এক হই তবে আর ভয় কিসের ?'

আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় আধখেঁচড়া হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'কমরেড।' তারপরেই লজ্জা পেয়ে হেসে উঠল ছেলেমানুষের মত। কয়েক মিনিট পরে আমাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে আবার বলল, 'কমরেড।'

'ভয় হচ্ছে বুঝি ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও বলল, 'না। একবার আমি ডাকাতদলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি…'

আমরা একসঙ্গে মার্চ করে যাচ্ছিলাম। মনে হল, ওর বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দটা যেন শুনতে পাচ্ছি। না হেসে থাকতে পারলাম না।

'মিথ্যে কথা বলছ !' ফিসফিস করে বললাম, 'তোমার বুক যে ধুকপুক করছে তা আমি প্রায় শুনতে পাচ্ছি।'

ওর বিব্রত ভাবটা একটুও চাপা রইল না। আঙুলের চারপাশে তামাকের পাইপটা ঘোরাতে ঘোরাতে বিড়বিড় করে বলল :

'না, আমি ভয় পাইনি, আমি ভীরু নই। একবার আমরা ডাকাতদলকে আক্রমণ করেছিলাম। সেবারেও প্রথম দিকে আমার বুক ধুকপুক করেছিল আর পা কেঁপেছিল। কিন্তু পরে আমি শান্ত হই। দাদা, আমরা চাষী, সরকারী আমলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না আমরা।'

শত্রু-অধিকৃত গাঁ থেকে আমরা তখন প্রায় তিন চার 'লি' দূরে। সামনেই একটা কবরখানা। ক্যাপ্টেন দুজন লোক চাইল যারা অবস্থা দেখবার জন্যে সামনের গাঁয়ে ঢুকতে স্বেচ্ছায় রাজী আছে। ওদের পেছনে পেছনে একটু পরে বাহিনীর অর্ধেক লোক গাঁয়ে ঢুকবে। বাকী অর্ধেক আত্মগোপন করে থাকবে চারপাশের ঝোপ জঙ্গলে। অপ্রত্যাশিতভাবে আধখেঁচড়া স্বেচ্ছায় রাজী বলে জানাল।

'ক্যাপ্টেন, এ অঞ্চলের সমস্ত 'ফালি' আমার জানা। আমাকে যদি প্রথমে গাঁয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় তো খুশি হব।'

আশ্চর্য হল সবাই! কি করবে বুঝতে পারল না ক্যাপ্টেন, তার গোঁফের প্রান্তভাগ খাড়া হয়ে উঠেছে। সন্দেহের সুরে সে জিজ্ঞেস করল :

'তুমি জান যে তোমাকে গুপ্তচরের কাজ করতে হবে?'

'জানি। ডাকাতদলের বিরুদ্ধে এ কাজ আমি আগেও করেছি।'

ক্যাপ্টেনের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এটা কোন কাজের কথা নয়। ওকে পাঠিও না—সমস্ত কিছু পণ্ড হবে।'

কিন্তু ক্যাপ্টেন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা বেশ। ওর সঙ্গে তুমি যাও। সাবধানে যেও!' তারপর সে আধখেঁচড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ, ভাল। কিন্তু খুব সাবধান!'

কবরখানার ভেতর থেকে শেকল-ছেঁড়া বানরের মত আমরা বেরিয়ে এলাম। পেছনের গুঞ্জন শুনে বোঝা গেল, আধখেঁচড়ার মনোনয়ন কেউ সমর্থন করছে না। ক্যাপ্টেন বলছে, 'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। ওর মনটা সরল, কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ।'

শত্রু-অধিকৃত গাঁয়ের কাছাকাছি এসে আমরা মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারার আলোয় চারদিকে তাকাতে তাকাতে কান পেতে

রইলাম কোন দিক থেকে কোন রকম শব্দ আসছে কিনা শুনবার জন্যে। কবরের মত নিঃশব্দ গাঁ। আধখেঁচড়া ফিসফিস করে বলল, 'মনে হচ্ছে কেউ জেগে নেই। তুমি এখানে অপেক্ষা কর..'

পা থেকে জুতো খুলে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ও, তারপর মাথা নীচু করে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল গাঁয়ের দিকে। কুড়ি মিনিট পার হল, কিন্তু আধখেঁচড়ার কোন চিহ্নই নেই। হঠাৎ দেখলাম কুয়োর পাশে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে আর কানে এল কিছু একটা মাটিতে পড়ে যাবার শব্দ। বন্দুকের ঘোড়ায় হাত রেখে কালো চঞ্চল মূর্তিটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলাম।

'কে?' জিজ্ঞেস করলাম চাপা স্বরে।

'আমি কমরেড, আমি', পরিচিত গলায় উত্তর এল, 'বিদেশী-শয়তানগুলো পালিয়ে গেছে। তাদের ছায়াও নেই কোথাও...'

ওর দিকে ছুটে গেলাম।

'সমস্ত গাঁটা তুমি ঘুরে দেখেছ তো?' জিজ্ঞেস করলাম উদ্বিগ্নভাবে।

'প্রত্যেকটি বাড়ী, প্রত্যেকটি উঠোন দেখেছি...শয়তানগুলোর ছায়াও নেই কোথাও।' আবার বলল ও।

'তাহলে তুমি সংকেত দাওনি কেন?'

'আমি—আমি—আমি', কনুই দিয়ে আমাকে একটা গুঁতো দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'আ-আমাদের গ-গরুর একটা দ-দ-দ-দড়ি দরকার। এই দড়িগাছটা যদি নিই আপত্তি আছে নাকি? জানই তো, আগেকার কালে এরকম দু-একটা জিনিস নিলে কোন দোষ হত না।'

'যদি তুমি কোন জিনিসে হাত দাও,' আমি শাসিয়ে উঠলাম, 'তাহলে ক্যাপ্টেন তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।'

হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আধখেঁচড়া, তারপর কোমরে

জড়ানো দড়িটা খুলতে লাগল আস্তে আস্তে। আমি তিনবার কাশলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের চারপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আলো জ্বলে উঠল ; আমাদের কমরেডরা সোজা গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে।

'দাদা', আতঙ্কিত গলায় বিড়বিড় করে আধখেঁচড়া বলল, 'এই দেখ, আমি দড়িটা ফেলে দিয়েছি।'

সারা পথটা ও আমার পেছন পেছন এল, একটিও কথা বলল না, আর এমন মুখচোরা ভাব যেন পেয়ালা ভেঙে ফেলবার পর শিশু মা-র বকুনির জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর উদ্বিগ্ন ভাবটা বুঝতে পেরে বললাম যে এ সম্পর্কে কোন কথা আমি ক্যাপ্টেনের কাছে বলব না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাতের পাইপটা আমার হাতে গুঁজে দিল ও। পাইপ টানতে টানতে বললাম :

'জান, কেন আমরা অন্য লোকের জিনিস নিই না ?'

'হ্যাঁ, কারণ আমরা বিপ্লবী।' বলল ও।

তারপর অল্প কিছুক্ষণ ও চুপ করে রইল। নাকের শিকনিটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে ও আবার বলল :

'আচ্ছা, তার মানে কি এই যে নিজের অবস্থাকে ভাল করবার অধিকার বিপ্লবীর নেই ?'

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'যে বিপ্লবী, সে প্রত্যেকের অবস্থাই ভাল করতে চেষ্টা করে, শুধু তার নিজের নয়। জনসাধারণের জন্যে দুঃখভোগকে মাথা পেতে গ্রহণ করে সে। কিন্তু শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকেই উপকৃত হবে, লক্ষ লক্ষ লোক জুলুম বা অত্যাচারের ভয় না করে শান্তিতে কাজকর্ম করবে, আমরা নিজেরাও সুখী হব। আমাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্ররা বুক টান করে অবাধে চলাফেরা…'

এই আলোচনার পর ও আরও প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কাজেকর্মে

ওর উৎসাহ ও পারদর্শিতা বেড়ে গেল যেন, ছেলে আর বৌয়ের জন্যেও আর বিশেষ দুশ্চিন্তা করেনি। আমার কাছে ও চীনা অক্ষর শিখতে আরম্ভ করল, দিনে একটি করে অক্ষর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ত্রিশটি অক্ষর শিখবার পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে ও আহত হয়।

সে রাত্রে ম্লান চাঁদ উঠেছে আকাশে। আমাদের ত্রিশজনের একটি দলকে পাঠানো হয়েছে রেলওয়ে লাইন উড়িয়ে দেবার জন্যে, রেলওয়ে লাইনটা শত্রু-অধিকৃত গাঁ থেকে তিন 'লি' দূরে। আমাদের কাছে ডিনামাইট নেই। আমরা স্থির করলাম, খালি হাতেই কয়েকটা রেলের লাইন উপড়ে ফেলে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহী ট্রেন আক্রমণ করব। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমরা কাজ আরম্ভ করলাম, কিন্তু রেলের সঙ্গে রেলের ঠোকাঠুকিতে যে শব্দ হচ্ছিল সেটা চাপা দেবার কোন উপায় ছিল না। সেই স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ শব্দ অনেক দূর থেকেও শোনা যেতে পারত। কিছুক্ষণের মধ্যেই কানের পাশ দিয়ে শত্রুপক্ষের গুলি ছুটতে শুরু করল। কেমন আতঙ্কিত ও ম্লান মনে হল আকাশের চাঁদকে।

'শুয়ে পড় !'

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ভীষণভাবে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু হল। কতগুলি বুলেট পড়ল পেছন দিকে, আর কতগুলি বৃত্তাংশ রচনা করল সামনের দিকে। এইভাবে মিনিট দশেক সমানে গুলিবর্ষণ করবার পরে হঠাৎ একসঙ্গে থেমে গেল মেশিনগানগুলো। ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপছিল রেলের লাইন, বোঝা গেল শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহী ট্রেন এগিয়ে আসছে···

আমাদের দলের অধিনায়ক ছিল সিঙতাও-সিনান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার। কাজকর্মের দিক থেকে মেজাজটা খুব কড়া, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ লোক। কতগুলি বিস্ফোরক বুলেটকে একসঙ্গে বেঁধে রেলের তলায় রাখল সে, তারপর আমাদের আদেশ দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে।

একটা কবরখানার ভেতরে আমরা গা-ঢাকা দিলাম। আধখেঁচড়া ওর পাইপটা বার করে এমনভাবে আগুন ধরাল যেন কিছুই ঘটেনি। অধিনায়ক বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওর পাছায় একটা খোঁচা দিতেই পাইপটা লুকিয়ে ফেলল ও। স্বভাবতই ও অসন্তুষ্ট হয়েছিল, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'আমি কেন ছাই ভয় পেতে যাব—বুলেট-গুলো তো আর আমার গায়ে লাগবে না!' তারপর প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরক বুলেটগুলো ফেটে গেল; লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সৈন্যবাহী ট্রেনটা; ধোঁয়া, ধুলো আর স্প্লিনটারে ভরে গেল চারদিক।

'চমৎকার!' বিস্তৃত প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল সবাই।

তারপরেই থমথমে স্তব্ধতা, কারও মুখে কথা নেই। শুধু একটা গলা গুন্ গুন্ করে গেয়ে চলেছে:

পিছে রাজধানী বহুদূরে এই কী বিশ্রী পরিবেশ;
উদ্দাম কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টির নেই শেষ।

যা হবার হয়ে গেছে ভেবে কবরখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমরা রেললাইনের দিকে ছুটলাম। আধখেঁচড়া ছুটছিল আমার আগে আগে, হঠাৎ ও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ওকে বলতে শুনলাম, 'আমার গায়ে গুলি লেগেছে!' ছুটে চললাম ওর দিকে নজর না দিয়ে। রেললাইনের কাছে পৌঁছবার আগেই কানে এল শত্রুপক্ষের পদাতিক বাহিনী গাঁয়ের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিছু হটে এলাম।

ফিরে যাবার সময় চোখে পড়ল আধখেঁচড়া তেমনিভাবেই মাটির ওপর পড়ে আছে আর মরিয়া হয়ে গুলি চালাচ্ছে শত্রুকে লক্ষ্য করে। বললাম, 'লেগেছে নাকি? উঠে চলতে পারবে?' 'এই পা দুটোর যা অবস্থা...' ও ককিয়ে উঠল, 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। ধরা পড়বার আগে

ওদের কয়েকটাকে আমি শেষ করব।' ওকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলাম আবার। কতবার যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছি তার ঠিকঠিকানা নেই। একবার তো একটা খানার ভেতরেই গড়াগড়ি দিয়েছি দুজনে। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে—ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের অবিশ্রান্ত আওয়াজ, গোলাগুলি, পিঠের এই বোঝা—তবুও আমি এতটুকুও বিচলিত হয়নি। অনবরত ছুটেছি আর ছুটেছি, যেন কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার।

হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছে দেখলাম, আধখেঁচড়ার পিঠে আর একটা গুলি লেগেছে। ও অজ্ঞান হয়ে গেয়েছিল, প্রাথমিক চিকিৎসায় আমরা ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। দেখা গেল, ওর ক্ষতগুলো রীতিমত ভয়ানক, যদিও ভয়ের কোন কারণ নেই। ঠিক করলাম, ওকে পেছনের কোন এমারজেন্সি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। আমার এখনো মনে আছে, ওকে যখন স্ট্রেচারে তোলা হল, ওর ভীষণ জ্বর, তবুও জ্বরের ঘোরেই দুর্বল গলায় বিড়বিড় করে বলছিল, 'হেট্, হেট্···আরে মলো যা, এতো ভারী বেয়াড়া গরু দেখছি···হেট্ হেট্!'

তিঙ লিঙ

ভেড়ার পাল তাড়িয়ে এনে উঠোনে ঢোকাবার পরেও চাও পরিবারের অনূঢ়া মেয়েটি দোরগোড়ায় বসে আছে। জুতো সেলাই করছে বসে বসে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, সঙ্গে সঙ্গে কানের লম্বা রূপোর দুল দুটো দুলে উঠছে ভীষণভাবে, বারবার ধাক্কা খাচ্ছে কাঁধের সঙ্গে। খোঁয়াড়ে ঢুকবার মুখে ভীষণভাবে গুঁতোগুঁতি করছে ভেড়াগুলো, দূরের দল ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সামনের দলকে, যেগুলো সরে আসছে তারা চিৎকার করে চলেছে সমানে।

সভা শেষ হবার পর নির্বাচনী কমিটির১ সভ্যরা একে একে বাইরে এল। এইমাত্র সভা শেষ হয়েছে, কিন্তু সভ্যদের আলোচনা এখনো থামেনি। জুতো সেলাই করতে করতে চিঙ একবার তাকিয়ে দেখল, তার মুখে মিষ্টি কৌতুকের হাসি।

১। নির্বাচনী কমিটি। পুনর্মুক্ত চীনে গেরিলাবাহিনী এক নতুন গণতান্ত্রিক জীবনের সূত্রপাত করেছে। পুরনো শাসনব্যবস্থা সব জায়গাতেই ভেঙে পড়েছিল, অফিসাররা পালিয়েছে কিংবা জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—নবজাগ্রত কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তাদের নেই। এই সব জায়গায় প্রত্যেকটি জরুরী সমস্যার ওপর নির্বাচন হয়, প্রত্যেকের ভোট থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহসের পরিচয় দিয়ে যারা কৃষকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে, তাদের নিয়ে নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচনী কমিটির সর্বপ্রধান কাজ হয় এই সমস্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কৃষকদের উৎসাহিত করে তোলা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণকে সচেতন করা।

রাত্রি

নানা সমস্যার ওপর আলোচনা করতে হয়েছে সভ্যদের। সবাই বেশ ক্লান্ত। আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল, রান্নাঘরের নীল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত কম হয়নি। সুতরাং তারা ঠিক করল, গাঁয়ের ওদিকে গিয়েই রাত্রের খাওয়া শেষ করবে। পরের দিনই আর একটা নির্বাচনী সভা আছে, তার জন্যে তোড়জোড় দরকার। পরামর্শদাতাকে১ আজ আবার হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে, তিন চার দিন সে বাড়ী যায়নি। কমিটি জনসাধারণের কাছে পশুচারণভূমির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছে। পরামর্শদাতাকে চলে যেতে হচ্ছে কারণ তার বাড়ীতে গরুটা দু-একদিনের মধ্যে বাচ্চা বিয়োবে। বাড়ীতে বৌ আছে, বয়স চল্লিশের ওপর, কিন্তু রান্নার কাজকর্ম ছাড়া আর কিছু সে করতে পারে না।

যে বুড়ীটা বসে বসে যাঁতা ঘোরাচ্ছিল, তাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর কর্তা চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল, 'রান্না তো তৈরী। চলে যাচ্ছ কেন বাপু? বাড়ীর রান্না বুঝি বেশী মিষ্টি?' কথাটা বলে সে মোড়লের হাতটা চেপে ধরল। মোড়লের নতুন বিয়ে হয়েছে। সুন্দরী বৌ, বছর পনের বয়স। সুতরাং এই ধরনের ঠাট্টাতামাসা মোড়লকে প্রায়ই সহ্য করতে হয়।

ঠিক সেই সময় চিঙ এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। ওপাশে পাহাড়ের ওপর গাছগুলো মুকুলে ভরে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

১। পরামর্শদাতা। জাপানী কবলমুক্ত স্থানসমূহে যখন পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় তখন গেরিলাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে চাষের ওপর। বর্ধিত হারে ফসল উৎপাদন করবার চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা নিপুণ ও দক্ষ চাষীরা পরামর্শদাতা নির্বাচিত হন, তাঁদের কাজ হয় উন্নত প্রণালীতে চাষের প্রবর্তন করা ও ফসলের উৎপাদন বাড়ানো।

লম্বা কালো বেণীটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, পরনে লম্বা হাতাওলা ছিটের পোষাকের ওপর কালো জ্যাকেট। হাত দুটো ওপরে তোলা, দরজার কপাটের ওপর ভর। যদিও ষোল বছর বয়স, কিন্তু রীতিমত পাকা দেখায়—যেন পূর্ণ-প্রস্ফুটিত ফুল। সত্যিই, মেয়েটির এবার বিয়ে দেওয়া উচিত।

ব্রিজের কাছে এসে কমিটির সভ্যরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর সবাই গেল দক্ষিণ দিকে, শুধু হো হুবা-মিঙ উত্তরদিকের যাত্রী কারণ সেই দিকেই তার বাড়ী। এখনো সে দেখতে পাচ্ছে, দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিঙ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি এল তার মনে, সভায় এবং তার পরে যে সব সমস্যা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, সেগুলোর আর কোন অস্তিত্ব রইল না। কেমন হালকা বোধ হল নিজেকে, শিস দিতে আরম্ভ করল হঠাৎ। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে আপন মনেই বলে উঠল, 'মেয়েটা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। শীতকালের স্কুলেও ও যেতে চায় না। ভাবে, ও তো জমিদারের মেয়ে, ওর আর ভাবনা কি? চুলোয় যাক! চাও-এর অনেক টাকা আছে, তাই সে মনে করে যে নিজের সোমত্ত মেয়ের বিয়ে না দিলেও তাকে কিছু বলবার নেই।'

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিল সে, তারপর হাত দিয়ে দিয়ে সমান করল মাথার পেছনটা। ভঙ্গীটা দেখে মনে হল যেন সে নিজের অদৃশ্য দুঃখকষ্টকে ঝেড়ে ফেলছে। তারপর একবার তাকাল চারদিকে। অন্ধকার হয়ে আসছে। অনেক দূরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ঝুলে আছে এক টুকরো ঘন নীল মেঘ। সোনালী আলোয় ঝলসে উঠছে, কেঁপে উঠছে পাহাড়ের চূড়া দুটো। মনে হচ্ছে যেন দুই পাহাড়ের প্রান্তরেখা মিশে গেছে এক আশ্চর্য বর্ণসমারোহে। মনটা

ভারী হয়ে উঠল, অনেক কথা মনে পড়ল তার। পশ্চিম দিকের যে পাহাড়টা সূর্যের আলোয় এখনো উজ্জ্বল, ওখানে চাষ চলছে। গরুবলদ তাড়িয়ে নিয়ে লাঙল কাঁধে বাড়ী ফিরে চলেছে কেউ কেউ। পরামর্শদাতা হবার পর হো হ্বা-মিঙ নিজের জমি চাষ করবার সময়ই পায়নি। জেলার নির্বাচনের জন্যে গত কুড়ি দিন ক্ষেতে যাওয়া তো দূরের কথা নিজের বাড়ীতেই যাবার সময় পায়নি সে। কাজেই বাড়ীতে ফিরলেই নানা অনুযোগ, অভিযোগ ও ভৎর্সনা শুনতে হবে নিশ্চয়ই।

সত্যি কথা বলতে কি, অন্যকে জমি চাষ করতে দেখলেই নিজের জমির কথা মনে পড়ে তার—সেই জমিতে এখনো লাঙল পড়েনি। অবশ্য একথাও সে বোঝে যে অন্তত আরও কিছুকাল এই কাজ ছাড়তে পারবে না সুতরাং নিজের জমিতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা যতবার ভাবে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হয় তার। তাকে উদ্বিগ্ন দেখে কেউ যদি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তো সে এড়িয়ে যায়। যতক্ষণ অন্য লোক সঙ্গে থাকে, সে ঠাট্টাতামাসায় যোগ দেয়, আলাপ আলোচনা করে, রিপোর্ট পাঠায়। একবার এক গ্রাম্য নির্বাচনী সভায় তাকে বলা হয়েছিল ফসল-নাচ নাচতে আর যাত্রাগান গাইতে—তার মত এত ভাল গলা এই জেলায় আর কারও নেই। কিন্তু নিজের অকর্ষিত জমি সম্পর্কে অপরের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা সে সহ্য করতে পারে না। তার ইচ্ছা, নির্বাচন শেষ হলেই আবার পাহাড়ে ফিরে যাবে—ক্ষেতজমি, মাটির গন্ধ, সূর্যের আলো, বলদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ, এসব তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

উপত্যকার অন্য পাশে পৌঁছতেই অন্ধকার হয়ে গেল। তবুও দ্রুত হাঁটতে লাগল সে—অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় অন্ধকারে পথ খুঁজে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। মাথার ভেতর নানা দ্রুত চিন্তার আবির্ভাব হচ্ছে,

শান্ত ও নিস্তব্ধ উপত্যকা নানা স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে তার মনে। ছেলেবেলায় একবার এই জায়গা থেকেই একটা হরিণের পেছনে পেছনে সে ছুটেছিল, ছুটতে ছুটতে একটা বনের ভেতরে যায়, সেখানে একটা বাঘের সঙ্গে সেই লোমহর্ষক সংঘর্ষের কথা সে আজও ভোলেনি। তার কয়েক বছর পরে এই পথ দিয়েই পোঁটলা বগলে নিয়ে বৌয়ের বাড়ীতে বিয়ে করতে গিয়েছিল সে। তখন তার বয়স ত্রিশ। যদিও বৌয়ের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ কিন্তু বৌকে দেখে তার মনের কি ভাব হয়েছিল তা আর মনে নেই।

তার কিছুদিন পরে গাধার পিঠে চড়ে বৌকে নিয়ে ফিরেছিল এই পথ দিয়েই। রাত্রি যত অন্ধকারই হোক না কেন, সে স্পষ্ট দেখতে পায় কোথায় তার এক বছরের ছেলেকে কবর দেওয়া হয়েছে, কোথায় তার চার বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছে শান্তিতে। এক বছর আগেও এই সব পথে রাত্রিবেলা যাতায়াত করতে পারেনি তারা। ওই বড় গাছটার কাছেই তো ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে মেরে পাশের ঝোপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে সে নিজেও ছিল সেই ব্যাটালিয়নে! পরামর্শদাতা হবার পর থেকে প্রায়ই তার ফিরতে রাত হয়ে যায়। জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ও গুরুদায়িত্বের ভারে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত মনের কাছে অতীতের এই সব তিক্ত-মধুর ও তীব্র স্মৃতি মনে হয় বড় সান্ত্বনাদায়ক। সুতরাং অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তায় চলতে তার ভয়ও হয় না, দুর্ভাবনাও হয় না। দু পাশে উঁচু পাহাড়। কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে গাছের সংখ্যা বাড়তে লাগল। একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী তির তির করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে আকাশটা দেখাচ্ছে ফিতের মত, দু-একটা নিঃসঙ্গ তারা তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু দক্ষিণা বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে পেছন থেকে, একটা পরিচিত ও অবোধ্য সুগন্ধ সেই বাতাসে। দূরে

কুকুর ডাকছে গাঁয়ের দিক থেকে, দুটো হলদে আলো জলজল করছে অন্ধকারে। গাঁটা গরীব, বোধ হয় এই জেলার মধ্যে সব চেয়ে গরীব। তবুও নিজের গাঁকে ভালবাসে সে। গাঁয়ের বাইরের দিকে শুকনো কাঠ জড়ো করা, দেখে একটা সস্নেহ ও সগর্ব অনুভূতি এল তার মনে। তার পক্ষে সব চেয়ে বড় গর্বের কথা এই যে, গাঁয়ের কুড়িটা পরিবারের অন্তত কুড়িজন লোক তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

চওড়া অসমতল জায়গাটা পার হয়ে আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। এই ভেবে সে আশ্চর্য হল যে নিজের গরুর কথা এতক্ষণ তার মনেই পড়েনি। কেমন একটা উদ্বেগ এল মনে—বাচ্চাটা নিরাপদে হয়েছে না খারাপ খবর আছে কিছু ?

এই নতুন বাচ্চার কথা এতবার সে ভেবেছে—ঠিক বাচ্চাটার মায়ের মতই, কিন্তু আরও জীবন্ত। কিন্তু আজ সেই রূপপরিকল্পনার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট নেই। নিজের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে ঢুকল গোয়ালঘরে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে দেখল বৌ চুপ করে বসে আছে উনুনের ধারে। খাটের ওপর বিছানা তৈরী, কিন্তু শুতে যাবার ইচ্ছা বৌয়ের আছে কিনা সন্দেহ। ঘরে ঢুকতেই বৌয়ের স্থির দৃষ্টি এসে পড়ল তার ওপর। অনেক চেষ্টায় বৌ নিজেকে সংযত রেখেছে, কিন্তু মুখের ওপর আসন্ন ঝড়ের রেখাপাত তার কাছে গোপন নয়। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে এই ঝড়কে এড়াবার একমাত্র উপায়, জামা কাপড় গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে এদিকে, গরুটা···বৌয়ের টাক-পড়া মাথাটা দেখতে দেখতে কেমন একটা বিরক্তি এল, মনে হল ঝগড়া এড়াবার সব চেয়ে সহজ উপায় বৌয়ের দিকে কোন নজর না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়া। 'কী গরম।' কথাটা সে বলল ঝগড়া করবার অনিচ্ছা জানাবার

জন্যে আর মনে মনে আশা করল তার ক্লান্ত শরীরের কথা মনে করে অন্তত এখনকার মত ও তাকে রেহাই দেবে।

মাটির ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল। বৌ কাঁদছে। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে মুখের ওপর। বাতির অস্পষ্ট আলো পড়েছে নোংরা লালচে চুলে, চিবুকের ভর-রাখা রোগা হাতটা দেখাচ্ছে মড়ার মত ফ্যাকাশে। নিঃশব্দে নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্যে নিজেই বিলাপ করে চলেছে :

'মরণ হয় না কেন তোমার। কী কপাল নিয়েই এসেছিলে! তোমার স্বামী যে তোমাকে ঠিকমত খাওয়ায় পরায় না, তাতে তোমার উচিত শাস্তিই হয়েছে। এই তোমার ভাগ্য...'

একটি কথাও বলল না সে। এখন গরুটাই তার একমাত্র চিন্তা। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে মনে মনে সে ভাবল :

'বুড়ী ডাইনীটার কোন 'বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি' নেই। গরুগুলোও বাচ্চা বিয়োয়। কিন্তু ওই বুড়ী কী? বাঁজা মুরগী।' আচ্ছা, এই 'বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি' কথাটার অর্থ কি? সে ঠিক বোঝে না। কিন্তু ওই বুড়ীর আর ছেলেপিলে হবার আশা নেই, বুড়ীর ক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা চলে। কথাটা সে আগে জানত না, সহকারী সম্পাদকের কাছে নতুন শেখা।

দুজনেরই একান্ত আশা, আবার তাদের ছেলেপিলে হয়। তাকে সাহায্য করতে পারে, এমন একজনকে তার দরকার। আর বৌ যখন ভাবে যে ভবিষ্যতে নির্ভর করবার মত কেউ নেই, তখন কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা আসে মনে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। বৌ অনুযোগ করে, পয়সা আয় করবার ক্ষমতা তার নেই, ঘরদোরের দিকে সে তাকায় না। আর সে ভাবে, বৌটার আর উন্নতি হবে না, লেজের মত পিছিয়েই

থাকবে সব সময়ে। বিশেষ করে সে জেলা-পরামর্শদাতা হবার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা ক্রমশ শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আগে আগে দুজনে ঝগড়া করত। কিন্তু এখন সে প্রায়ই চুপ করে থাকে, মনে হয়, তার মেজাজটা ক্রমশ ভাল হচ্ছে আর বৌ হয়ে উঠছে খিটখিটে। বৌ নিজেও বুঝতে পারে, একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে সে, তাকে আর নাগাল পাওয়া যায় না। সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-পরে থাকতে পারলেই বৌ খুশি। কিন্তু কী চায় সে? সে বুঝতে পারে না। আই-ইয়া, অসহ্য! বৌয়ের আরও বিশ্রী মনে হয় যখন দেখে সে নিজে বুড়ী হয়ে গেছে কিন্তু তার স্বামী এখনো যুবক। স্বামীকে সে আর খুশি করতে পারে না আর স্বামীও তার প্রতি কোন মনোযোগ দেয় না।

বৌয়ের কান্নার শব্দ উচ্চতর হয়ে উঠল। কেঁদেকেটে অভিশাপ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে তাকে। কিন্তু চুপ করে শুয়ে আছে সে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত রাখতে। হঠাৎ একটা খারাপ চিন্তা নিজের অজান্তেই মনের ভেতর জেগে উঠল:

'এই জমিজমা ওকে দিয়ে দিলেই হয়। অন্য কেউ রেঁধে না দিলেও আমার চলবে। অবিবাহিত লোকের মত আমি থাকব। এই ঘরদোর, বাসনপত্র সব দিয়ে দেব ওকে। নিজের জন্যে শুধু নেব একটা বিছানা আর কয়েকটা জামাকাপড়। ছেলেপিলের ভাবনা তো আর নেই। এই সব জমিজমা আসবাবপত্র সব ওর হবে। ইচ্ছা হলে কাউকে পোষ্যপুত্রও নিতে পারে ও। তখন আমি...' এই চিন্তায় সমস্ত শরীরটা কেমন

হালকা মনে হল, পাশ ফিরে শুল সে। বেড়ালটা শুয়ে ছিল একপাশে, চমকে লাফিয়ে উঠেই আবার শুয়ে পড়ল। তিন বছর এই বেড়ালটাকে তারা খাইয়েছে। বেড়াল তার পছন্দ নয়, কিন্তু এই ছাই-রঙা বেড়ালটাকে ভীষণ ভালবাসে সে। কাজ থেকে ফিরে যখন সে খাটের ওপর বসে আর বৌ খাবার নিয়ে আসে তার জন্যে, বেড়ালটাও চুপ করে বসে থাকে তার পাশটিতে।

বৌয়ের রাগ এখনো পড়েনি। বৌয়ের অসাবধানতায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বৌয়ের পায়ের ধাক্কায় এক্ষুনি হয়ত শিমের বোয়েমটা উলটে পড়বে। শিম তার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এখন সে কথা বলতে চায় না, সুতরাং পাশ ফিরে শুল। খাটের প্রান্তে একটা চুবড়িতে মুরগীর ছানাগুলোকে রাখা হয়েছিল, তার পা-টা গিয়ে ঠেকল চুবড়িতে। ভয় পেয়ে মুরগীর ছানাগুলো চিৎকার করতে লাগল ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে।

'তুমি ভাল করেই জান যে এই রোগা শরীর নিয়ে আমি আর বেশী দিন বাঁচব না, তবুও আমাকে তুমি কোন রকম সাহায্য কর না। ঘাস পর্যন্ত কাটতে হয় আমাকে। গরুটার বাচ্চা হবে, কিন্তু তোমার তাতে কি আসে যায়...' কথা বলতে বলতে বৌ উঠে দাঁড়াল। এবার হয়ত ও কাছে এগিয়ে আসবে, এই ভয়ে সে খাট থেকে নেমে বাইরে উঠোনে চলে এল। কেমন দমে গেছে সে। মনে মনে বলল, 'গরু বাছুর, সবই তোমার...'

পাহাড়ের ওপাশে অর্ধ-বৃত্তাকার চাঁদটা ঝুলছে। উঠোনের একাংশে চাঁদের আলো। উঠোনের মাঝখানে একটা কুকুর শুয়ে ছিল, তাকে দেখে এক পাশে সরে গেল। নিজের অজান্তেই সে গিয়ে ঢুকল গোয়ালঘরে। ভেতরে প্রচুর ঘাস জড়ো করা। অন্ধকারে গরুটা কাশছে, আর নিশ্বাস

নিচ্ছে টেনে টেনে। 'খানকীর বাচ্চা!১ এতক্ষণেও বিয়োতে পারেনি।' আগামীকালের সভার কথাটা মনে পড়ল উদ্বেগের সঙ্গে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চা হয়ে গেছে?' পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে মূর্তিটা, এক হাতে একটা বেতের ঝুড়ি, অপর হাত দরজায় ঠেস দেওয়া। 'হাউ কোয়েঈঙ, তুমি!' চাপা স্বরে বলল সে, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে।

হাউ কোয়েঈঙ তার প্রতিবেশীর স্ত্রী। স্বামী জনরক্ষা সমিতির সভাপতি, আঠারো বছর বয়স। ওর বয়স তেইশ, সুতরাং বিয়েটা সুখের হয়নি। বিবাহবিচ্ছেদ করবার পরামর্শ দিয়েছে হাউ কোয়েঈঙ। ও মহিলা সমিতির কমিটি-সভ্যা, জেলা জনরক্ষা পরিষদের মনোনীত সদস্যা।

এই নিয়ে তিন-চার বার হল ও তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পেছনে পেছনে গোয়ালঘরে ঢুকেছে। এমন কি প্রকাশ্য দিনের আলোতেও যতবার ওদের দেখা হয়েছে, ওর টানা টানা চোখ স্মিত হয়ে উঠেছে তার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটিকে তার ভাল লাগে না, বলতে গেলে প্রায় ঘৃণা করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, ওকে সবলে ছিনিয়ে এনে ভীষণভাবে চেপে ধরে।

১। খানকীর বাচ্চা। চীনা ভাষায় পুরো কথাটা হচ্ছে, 'সাও তা মা-তি পি।' সংক্ষেপে 'তা মা-তি।' প্রথম, মধ্যম, উত্তম—যে কোন পুরুষে কথাটা ব্যবহৃত হয়। সর্বত্র এর প্রয়োগ, চীনা চলিত ভাষায় কথাটা একটা মাত্রার মত দাঁড়িয়ে গেছে। কথাটার অর্থ, যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার মা দুশ্চরিত্রা। বাপ ছেলেকে, ভাই বোনকে এই বলে সম্বোধন করে—কোথাও এতটুকু বাধে না। বিশেষ করে লু স্যুনের অধিকাংশ চরিত্রের কথাবার্তায় এই শপথবাক্যের বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। লু স্যুনের পরবর্তী যুগের লেখকরাও এই কথাটাকে তাঁদের চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন। ভাষাগত বিচারে কথাটার একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে।

ওর বব্‌-করা চুলে আর খোলা কলারের ফাঁকে অনাবৃত গ্রীবায় চাঁদের আলো পড়েছে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে আলতোভাবে। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

'তুমি...'

তার মনে হল যেন শরীরের ভেতর ভয়ংকর একটা শক্তি মাথা তুলছে। বীভৎস, বেপরোয়া, দুঃসাহসিক একটা কিছু করে ফেলতে চায় সে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে অন্য একটা অনুভূতি এসে তাকে বাধা দিল।

'না, না, হাউ কোয়েঈঙ, কিছুদিনের মধ্যেই তুমি পরিষদের সদস্যা হবে। আমাদের দুজনের সামনেই অনেক জরুরী কর্তব্য রয়েছে। এখন এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে আমাদের 'সমালোচনা' হতে পারে।' ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল, একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখল না। বৌ বিছানার ওপর শুয়েছে, এখনো কাঁদছে মনে হয়।

'হুঁঃ...' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চুপ করে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা মনে পড়ল—যেন সে নয়, অন্য কেউ এই ঘটনায় জড়িত। ঝড়ের পর যেমন প্রশান্তি আসে, তেমনিভাবে সে ভাবল ঘটনাটা। সে যা করেছে ঠিকই করেছে। বৌকে ডেকে সে বলল, 'এবার ঘুমোও। গরুটার এখনো বাচ্চা হয়নি। হয়ত কাল হবে।'

বৌ যখন দেখল যে তার মুখে কথা ফুটেছে তখন কান্না থামিয়ে আলো নিবিয়ে দিল।

'বুড়ীটা কোন কাজের নয় সত্যি, কিন্তু তবু এখানেই থাকুক না, রান্না-বান্নাও তো করতে পারবে। এই অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ খুবই খারাপ দেখায়।'

উঠোনে মুরগীগুলো ডাকছে। পোষাক খুলে বৌ শুয়ে রয়েছে তার পাশে,

আর বারবার জিজ্ঞেস করছে 'তুমি কি কালও আবার বেরোবে নাকি? শুধু মিটিং আর মিটিং ··গরুটার ওপর একটু নজর দেওয়া দরকার।'

কিন্তু গরুটার কথা ভাববার সময় এখন আর নেই, একটু ঘুম দরকার তার। চোখ বুজে থাকবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও বারবার ভেসে উঠতে লাগল সভাস্থানের দৃশ্য, অনেক মানুষের জনতা। মাথার ভেতর শ্লোগানগুলো মুখর হয়ে উঠছে: 'প্রচারকার্য দুর্বল রয়ে গেছে।' 'গ্রামোন্নতি শুরু হয়নি।' 'মেয়েদের ভেতর কাজ শুরু হয়নি।'

কথাগুলো ভেবে অধৈর্য হয়ে উঠল সে। কি ভাবে গাঁয়ের উন্নতি সম্ভব? কর্মীর সংখ্যা এত কম! কিন্তু সে নিজেই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর তার নিজেরও জানা নেই। কোন দিন সে স্কুলে পড়েনি, লিখতে পড়তে জানে না। ছেলেপিলে তার নেই, কিন্তু আজ সে জেলা-পরামর্শদাতা, আগামীকাল সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে বক্তৃতা দেবে।

জানলার কাগজটা ক্রমশ শাদা হয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘরে ঘুম ভেঙেছে কার যেন, একটু তন্দ্রা এসেছে হো হ্বা-মিঙের। রোগা বৌটা গভীর ঘুমে অচেতন, গর্তে-ঢোকানো চোখের কোণে জল জমে রয়েছে এক ফোঁটা। এক পাশে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে বেড়ালটা। ভোরবেলার আলোয় উষ্ণতা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ঘরের ভেতর।

সকাল হচ্ছে একটু একটু করে।

সাহিত্যিক পরিচিতি

লু স্যুন (১৮৮১—১৯৩৫) রুশ সাহিত্যে গোর্কী বা শেকভের যে স্থান, চীনা সাহিত্যে লু স্যুনেরও তাই। চীনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি স্বীকৃত। ১৯১৭ সালে চীনা সাহিত্যে যে বিপ্লব শুরু হয় লু স্যুন ছিলেন সেই বিপ্লবের অগ্রদূত। তিনিই সর্বপ্রথম 'পাই-হুয়া' ভাষায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম যুগের লেখা 'পাগলের রোজনামচা', 'ওষুধ', 'যুদ্ধের হুংকার' ইত্যাদি গল্প এত জনপ্রিয় যে সংস্করণের পর সংস্করণ বিক্রী হয়েছে। ১৯২৭ সালে কমিউনিস্ট উচ্ছেদকার্য শুরু হবার পর তাঁকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

চ্যাঙ তিয়েন-ঈ (১৯০৭—) হুনানের অধিবাসী। প্রচুর উপন্যাস, ছোট গল্প ও রূপকথা লিখেছেন। আধুনিক চীনের অন্যতম শক্তিশালী লেখক। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সাড়ে তিন দিনের স্বপ্ন' (১৯২৮)। উপন্যাস : 'একটি বৎসর', 'ইয়াঙচিনপেঙ-এর যোদ্ধা' ইত্যাদি। ছোট গল্প : 'পরিক্রমা', 'প্রতি-আক্রমণ' ইত্যাদি।

লাও চাও (১৮৯৮—) আসল নাম শু শে-উ। পিপিং-এর অধিবাসী। প্রচুর উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন। ব্যঙ্গ-রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'রিক্সাওয়ালা' নামে তাঁর একটি উপন্যাস সম্প্রতি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

তুয়ান-মু হুঙ-লিয়াঙ — অধিকাংশ লেখা মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সিয়াও হুঙ ছিলেন প্রতিভাশীল লেখিকা, হঙকঙে জাপানীদের হাতে খুন হয়েছেন।

শেন স্যুঙ ওয়েন (১৯০২—) সামরিক পরিবারে জন্ম। বারো বছর বয়স থেকে সৈন্যদলভুক্ত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এত প্রচুর পরিমাণে লিখতে পারেন যে ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই চল্লিশটি বই লিখে ফেলেছেন। তাঁর সব চেয়ে প্রসিদ্ধ বই 'চীনদেশে অ্যালিস', ব্যঙ্গ-রচনা। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণভাবে লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

তিঙ লিঙ (১৯০৫—) আধুনিক চীনের শ্রেষ্ঠ লেখিকা। স্কুল-জীবনেই তিনি বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর স্বামী হু ইয়ে-পিঙ ছিলেন সাহিত্যিক ও বিপ্লবী। কমিউনিস্ট উচ্ছেদকার্য শুরু হবার পর হু ইয়ে-পিঙ কুয়োমিঙটাঙের হাতে নিহত হন। কয়েক বৎসর গুপ্ত জীবন কাটাবার পর ১৯৩৩ সালে তিঙ লিঙ ধরা পড়েন এবং বহু বৎসর তাঁকে নানকিঙে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়। তাঁর সাতখানি বই কুয়োমিঙটাঙ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। অশেষ দুঃখ, কষ্ট ও সংগ্রামের ভেতর তিঙ লিঙের জীবন কেটেছে। বর্তমানে তিনি ইয়েনানে আছেন এবং নতুন চীনের জনসাধারণের জীবন নিয়ে লিখছেন।

পিয়েন চি-লিন (১৯১০—) দুখানি কবিতার বই লিখেছেন। কবি হিসেবে খ্যাতি আছে। ১৯৩৮ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গ্যেরিলাদের সঙ্গে জীবন কাটান। বর্তমানে শিক্ষকতা করেন।

ইয়াও সে ইন (১৯০৯—) হোনানের অধিবাসী। স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাননি। ১৯৩৫ সালে লিখতে শুরু করেন।
